সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

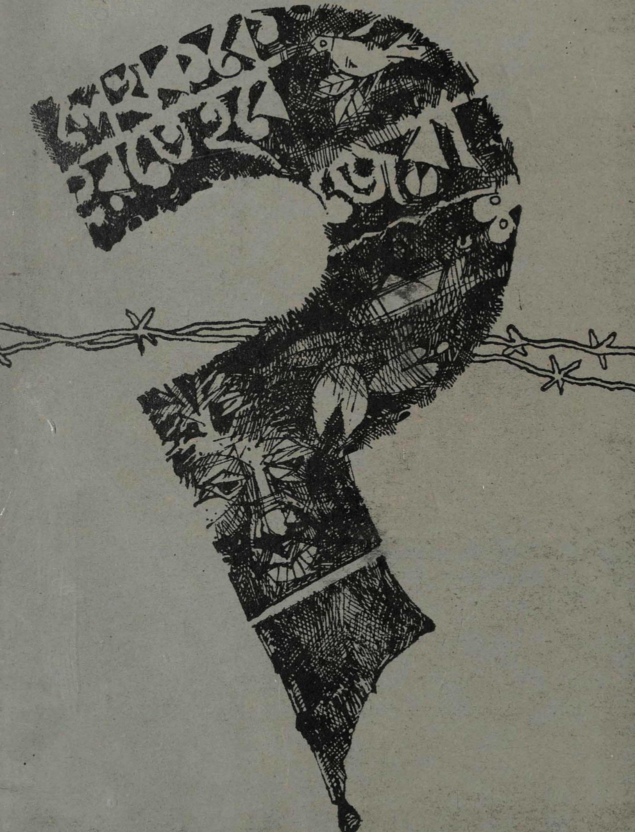

যোগসূত্রের একনিষ্ঠ কর্মী
ইরা সেনের অকালমৃত্যুতে
আমরা শোকস্তব্ধ।

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৯২

সম্পাদক : বিনয় ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক : সঞ্জয় চক্রবর্তী
শিল্প নির্দেশক : দেবাশিস দত্ত
প্রচার : গোপাল বসু, মানস বসু
বিজ্ঞাপন : পারমিতা সিন্‌হা
ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সেন
প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল
যোগাযোগ : টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন : ৫৯ ৪০৪৮
৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

চিঠি ১ □ শৈলজারঞ্জন মজুমদার / রবীন্দ্রসঙ্গীতে চিরসুন্দরের নিত্য আনাগোনা ৯ □ রাজ্যেশ্বর মিত্র / রামনিধি : একটি বিস্মৃত প্রতিভা ১৪ □ অজিত চৌধুরী / পোস্ট মডার্নিজম এবং আমি ১৭ □ অরূপরতন বসু / কারুবাসনা ও জীবনানন্দর গদ্য ২৯ □ ভাস্কর রায় / আমাদের অন্তর্গত নির্বাসন এবং কারুবাসনা ৪৬ □ কল্যাণ সেনগুপ্ত / প্রসঙ্গ : দেরিদা ৭৩ □ গুরু বন্দ্যোপাধ্যায় / 'শব্দের বিবেক' : কানেস্তির সাহিত্য দর্শন ৮০ □ প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় / জেলখানা আর জেলখানার অন্যেরা ৮৬ □ সুবিমল মিশ্র / প্রেমের গল্প ৯৯ □ উদয়ন ঘোষ / শান্তনুর গ্রহরত্ন ১—৪৪

লেখা ছাপা হওয়ামাত্র প্রচার অনিবার্যত এসে পড়ে অথচ প্রচারের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্ক বৈরিতার। আচ্ছা স্ববিরোধ! আরও আছে, পত্রিকাটির প্রচার সীমিত লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে। পাঠকও লেখকই। এই অর্থে যে তিনি আগে না লিখে থাকলেও লেখার যোগ্যতা, প্রস্তুতি তাঁর আছে। সম্ভাব্য লেখক তিনি। যোগসূত্রের প্রথম ও প্রধান বন্ধু লেখকরাই। সেই তাঁদের নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। মৌলিক চিন্তা ও রচনার সেই ক্ষমতাধরদের জড়তা আক্রমণ করেছে। একটি লেখায় হাত দিতেই তাঁরা কাটিয়ে দিচ্ছেন মাসের পর মাস। নিয়মিত প্রকাশ, সময়সূচির প্রতি অনুগত থাকা এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

ভিন্ন ধারার গদ্যের অন্যতম অগ্রজ লেখক উদয়ন ঘোষের কাছ থেকে একটি নতুন লেখা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। এখনকার নবীন পাঠকদের অনেকেই উদয়নের গদ্যের সঙ্গে পরিচিত নন। সেই দূরত্ব ঘোচাতে এই সংখ্যায় ওঁর একটি লেখা পুনর্মুদ্রণ করা হল। বছর দশেক আগে 'সূত্রপাত' পত্রিকায় এটি ছাপা হয়েছিল।

২৫. ৫. ৯২

With best compliments of :

THE PEERLESS GENERAL FINANCE
& INVESTMENT CO. LTD.

Regd. Office :
'PEERLESS BHAVAN'
3 ESPLANADE EAST
CALCUTTA 700 069

INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY

□

With Best Compliments From :

CHAKRABORTY CONSTRUCTION CO.

GOVT. CONTRACTOR

3/9A BIJAYGARH, JADAVPUR
CALCUTTA 700 032

□

SPACE DONATED BY :

A WELL WISHER

□

With Best Compliments From :

MICROSERVICES

(A Microventure in Computer Services)

1 PARK SIDE ROAD
CALCUTTA 700 026

□

With Best Compliments From :

MINATI ENGINEERING WORKS

ICHAPUR ROAD
HOWRAH-711 104
Phone : 69 2684

□

Space Donated by :

PLANTERS AIRWAYS LTD.

Road and Air Service all over India

Adm. Office :

10 POLOCK STREET, CALCUTTA 700 001
Phone : 26-9028, 27-6895/6

Booking Office :

38 KALI KRISHNA TAGORE STREET
CALCUTTA 700 070
Phone : 39-0784/5

Delivery Office :

67/28 STRAND ROAD, CALCUTTA 700 006
Phone : 38-1161, 38-4681

□

নির্বাসনের বিকল্প নেই

বাতিক জিনিসটা ব্যক্তির এক নিরুপদ্রব মেজাজ সৃষ্টি করে থাকে, এই রকম আমার মনে হয়। কিন্তু তা যে মাঝেমধ্যে দুর্লভ উপহার পেতেও সাহায্য করে সম্প্রতি সে কথা জানলাম। লেখকরা নিজেরা ছাড়া মনস্ক পাঠক যখন তাঁদের সাহিত্য পাঠ প্রায় বর্জন করেছেন সেই সময় (গবেট গল্পপ্রিয় বৌ-ফৌদের ধরছি না) যোগসূত্রের তিনটি সংখ্যা সাহিত্যের দিকে আমাদের ফের নজর ফেরাতে প্ররোচিত করল। আহা বাতিকের কথাটা বলা হয়নি, লিটল ম্যাগাজিন তথা সাহিত্যের আঁতুড়ঘর সম্পর্কে আমি এখনো কিঞ্চিৎ আশাবাদী। নতুন পত্রিকা দেখলেই কিনি। ব্যাচেলার মানুষ, মাল টানা আর ম্যাগাজিন খাতে খরচ করি। বাধা দেবারও কেউ নেই।

তো আপনাদের প্রথম সংখ্যায় যে কটি টুকরো গদ্য ছাপা হয়েছে সেগুলিতে নতুন পথ খোঁজার চেষ্টাটা উপেক্ষা করার মতো নয়। এবং এই খাতে যেসব চেষ্টাফেষ্টা হয় সেগুলি সহনশীলভাবে দেখা কর্তব্য বলে মনে করি।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গল্প-উপন্যাস রচনা সে তো চলছেই। বস্তাপচা কতগুলো ধারণা সেক্ষেত্রে উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণের নির্ধারক। এই লেখাগুলি সেরকম নয়।

সাহিত্য ও জীবন-জীবন করে গলা ফাটানো এইসব লেখকের লক্ষ্য নয়। বলা আর দেখানোর মধ্যে এঁরা কিছু একটা খুঁজছেন, সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে সাহিত্যকে বোঝার চেষ্টা করছেন নিজ-নিজ ধরনে। জীবন আর সাহিত্য এঁদের রচনায় যেমন পৃথক নয় তেমনি রক্তাক্ষরে রচনার কথাটা চলে আসছে বিনা উচ্চারণে। কথা আর ব্যক্তির স্বর মিলে মিশে যাচ্ছে। অনুপস্থিতির দূরত্ব যেমন কমছে তেমনি ভান, তথাকথিত নিরপেক্ষতা ইত্যাদি খসে পড়ছে পালকের মতো।

কোনো একটা স্লোগান আপনাদের দরকার। পত্রিকার লেখকদের মতোই যদি সম্পাদকও নীরবে কাজ করতে চান তাহলে এই শোরগোলের মধ্যে কে আর তা লক্ষ করবে। সাহিত্যে হুজুগের আন্দোলনের কথা বলছি না, সঞ্জীবনের বার্তাটুকু অন্তত বলে দিতে হবে।

গদ্যচর্চার যে খাতে পত্রিকাকে আপনারা বইয়ে দিতে চান তার জন্য হয়ত 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' এই কথাটাও দরকার। অপরিণত পাঠক ও গোলা সাহিত্যকর্মীরা সেক্ষেত্রে পত্রিকাটি ভুল করেও হাতে তুলে নেবেন না। অন্যদিকে পরিণত পাঠকের চিন্তার সুবিধা হবে।

সাহিত্যের উৎসের দিকে ফিরে তাকানো, সাহিত্য নিংড়ে সাহিত্য রচনার যে ধারা— পত্রিকাটিতে তাই প্রশ্রয় পাবে বলে আশা করছি। সাহিত্যের ভূগোল বিজয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে নেমে পড়বে না। বিবরণমূলক রচনার পরিবর্তে, দরিদ্র মানুষের যৌন জীবন চিত্রিত করার পরিবর্তে বাহ্য বাস্তবের আবর্জনা সরিয়ে তাকাবে গভীর এক বিপন্নতার দিকে। রচিত হবে লেখকের আত্মহননের আলেখ্য। তথ্য বহনকারী কুলিগিরির অসম্মানজনক কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাবে ভাষা। ভাষার অন্দরমহল উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তার বার্তার দিকটি শুধু চিত্তাকর্ষক হবে না, বাণী সেখানে বহু অর্থজ্ঞাপক। তার পটভূমি সুদূর বিস্তৃত। ঢেউ-এর পিছনে সমুদ্রের উপস্থিতি যেমন নিশ্চিত, বাস্তব, খণ্ড গদ্যগুলির পিছনে তেমনি অনুচ্চারিত থেকে যাবে এক ব্যাপ্তি। ক্যানভাস বড় করে, লক্ষ-কোটি চরিত্র এনে প্লটের ষড়যন্ত্রে বন্দী অসহায় মানুষের সাহিত্যের চরিত্র হয়ে ওঠার যে কৃত্রিমতার চর্চা এবার তা শেষ হোক।

গল্প কি গল্প নয়, উপন্যাস কি উপন্যাস নয়—এই প্রশ্নে তেমন আলোড়ন কোথায়। অর্থাৎ যাঁরা বলেন গল্পহীনতাই আধুনিকতা বা যাঁরা ফর্ম ভাঙার ব্রত নিয়েছেন বলেই ফর্ম ভাঙছেন। সমস্যাটা নিছক সংজ্ঞা বদলে দেওয়ার নয়, আসলে সীমা কেন ? এটাই প্রশ্ন। শিল্প প্রসঙ্গে কত রকম স্বাধীনতার কথাই না আমরা শুনি। শেষ পর্যন্ত তা কোনো না কোনো রাজনীতির জোব্বার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

শিল্পীর স্বাধীনতাকে আমরা একটু বদলে নিতে পারি—শিল্পের স্বাধীনতায়। সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টায় আমরা যার পায়ে শেকল আটকে দিই।

লেখকদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—আপনাদের পত্রিকায় মাত্র তিনটি সংখ্যার মধ্যে এই লক্ষণাক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আশার কথা। সীমা ভাঙার কথা ঘোষণা না করেও সাহিত্য এই সব রচনায় প্রকৃতই ডানা মেলেছে। পরিকল্পনা বন্দী করেনি লেখার প্রাণ ও তার সম্ভাবনাকে। সংজ্ঞা বদলেছে, বদলাতে থাকবে। লেখকদের পিছু-পিছু এসে সমালোচকদের অগ্রণী অংশ তা জেনেও নেবেন। আবারও অঙ্কুরিত হবে নতুন রচনা, সংজ্ঞা তখন খোল নলচে বদলাবার কথা ভাববে আবারও। এবং কিছু লোক থাকবেনই যাঁরা এই অন্ধচক্রে ভ্রমণের পথ ত্যাগ করবেন। গল্প কি গল্প না, উপন্যাস কি উপন্যাস না—এই কথাটির কোনো আবেদন নেই তাঁদের কাছে। লেখকরা আপাতত সেই মুষ্টিমেয় পাঠকদের উপর নির্ভর করুন।

শিলালিপি ও গুহাচিত্র উঠে আসতে পারে একটি রচনায় তার নিহিত অর্থ-সহ। এখানে নিহিত অর্থ বলতে আমি বোঝাচ্ছি : ঠিক কারো উদ্দেশে রচিত নয়, ঠিক কোনো রচয়িতাও যেন নেই এই লিপি বা চিত্রের পিছনে। যেভাবে একটি পাতা খসে পড়ে, পালক উড়ে যায়—যদি সেভাবে একটি রচনা গড়ে ওঠে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

যখন বলা হয় অমুক 'ক' নিয়ে একটি গল্প বা উপন্যাস রচনা করছেন বা যখন জিজ্ঞেস

করা হয় 'আপনি কী নিয়ে লিখছেন ?' তখন যে খুব নিম্নস্তরের সাহিত্য সম্পর্কে কথা হচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'ক' সেই সাহিত্যের অবলম্বন। মানে সাহিত্য এখানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। এবং ইচ্ছে করলেই এই সাহিত্যের ভিতর থেকে 'ক'-কে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব। আর তা করাও হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার সেইসব আলোচনা সাহিত্যের আলোচনা বলেই গৃহীত হচ্ছে দেখি।

বিষয় ও আঙ্গিকে দু টুকরো করে নিয়ে সাহিত্য আলোচনার যে রীতি চলে আসছে সেই রীতি সম্পর্কেও আঙুল তুলতে হবে। যখন এই রীতির সমর্থকরা আবার নিজেরাই বলে থাকেন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে এ জাতীয় কোনো বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়। তাহলে তাঁরা তা ঘটান কী করে ? এ একটা স্ব-বিরোধ। পত্র-পত্রিকায় এরকম গর্ভস্রাব-জাতীয় সাহিত্য সমালোচনা ভূরি ভূরি হচ্ছে এবং তা করছেন স্বীকৃত পণ্ডিতরা।

পণ্ডিতরাই সব থেকে বড় মূর্খ। তাঁদের আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। এ কথাটা কে বলে দেবে ?

একটিও দুর্বল বাক্য লিখব না, দুনিয়ার সবাই যা জেনে বসে আছে সেই সব কথার চর্বিতচর্বণ করব না—ধরা যাক এ দুটি শর্ত প্রহরীর মতো বসে আছে। সেক্ষেত্রে কি লেখার আগে অনেকেরই হাত কেঁপে উঠবে না। একালের বাংলা গদ্য লেখকদের একজনের লেখা থেকে আর এক জনের লেখাকে পৃথক করা, চিহ্নিত করা এক কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব। বাস্তবের বাইরের চেহারাটা প্রবঞ্চক সে কথা স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে তথাপি তথাকথিত বাস্তববাদী লেখকদের রচনায় এই বাহ্যরূপের সাত কাহন ছাড়া আর কীই-বা আছে এবং হয়ত সেজন্যই লেখকের স্বাক্ষর থাকে না কোনো রচনাতেই। ছাপাখানার যন্ত্রই এখানে লেখক। বা নিম্নমানের কোনো সাংবাদিকই এইসব সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। যিনি সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে বেছে নিলে দায়িত্ব পালনে অপারগ হতেন। অসফল, ব্যর্থ সাংবাদিকরাই সাহিত্যের হাল ধরেছেন। কী করুণ অবস্থা !

দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, রাজনীতির চক্রে আবর্তন ও সাংবাদিকসুলভ সমাজ চিত্রণ—এই তিন লক্ষণাক্রান্ত না হলে সেটি আর এখন বাংলা ভাষায় রচিত গদ্য বলে হয়ত গৃহীতই হবে না। লেখকের ঘাড়ের উপর একজন ভীতু সমাজ সংস্কারককে আমরা জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছি। আর লেখক মহাশয় কাগজ ঘেঁটে, দলিল দস্তাবেজ, মহাফেজখানা ঘেঁটে এক সুখপাঠ্য সমাজ ইতিহাস রচনার কাজে লেগে থেকে দিব্যি চোয়াল ভারী করে বসে আছেন। এবং এসবের মধ্যে পাণ্ডিত্যিয়ানাও কম নেই ; এখান থেকে সেখান থেকে পাণ্ডিত্যের ডাকটিকিট জুটিয়ে লেখার গায়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। তরুণ লেখকরাও এই ফর্মুলা পেয়ে বর্তে গেছেন। বিশেষ ভাবতে হচ্ছে না। সংবাদপত্রই এখন সাহিত্যের 'সোর্স মেটিরিয়াল।'

রাজনীতির সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের একটা গাঁটছড়া গড়ে উঠেছে। বিগত কয়েক দশকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মিশ্রণের এই প্রবণতা দিনে দিনে বেড়েছে। লেখক যদি প্রাণ খুলে কথা বলেন তাহলে তিনি আক্রান্ত হবেন। আর মুখে কুলুপ এঁটে থাকলে, বিনয়ের অবতার হলে তাঁকে ভণ্ড, কাপুরুষ বলা হবে। বাইরের এই চাপের মধ্যে পড়ে তাঁর পক্ষে নিরিবিলি বেছে নেওয়া, নিজেকে এই 'সমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভবের নামান্তর। যা ছিল স্বেচ্ছাশ্রম, সৃষ্টির কাজ এখন তা হয়ে উঠছে বাধ্যতামূলক কাজ। দাস শিবির থেকে উঠে আসছে ছন্দ, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং একঘেঁয়ে ন্যারেটিভ। প্যানপ্যানে সেন্টিমেন্টাল কাহিনী আর সস্তার গোয়েন্দা গল্পই এখন আমাদের সাহিত্য। সেকুলারইজম, মণ্ডল কমিশন, ক্ষেত মজুরের কাজের অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের ব্যানারে স্থান পেয়েছে। সেখান থেকে সরাসরি চলে এসেছে সাহিত্যের পৃষ্ঠায়।

বেচারা লেখক! এই ফরমায়েশ তাঁকে মানতেই হবে। নতুবা বেছে নিতে হবে নির্বাসন। ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখলে ছোট কাগজ থেকে বড় কাগজ সবাই তাঁর লেখা চাইবেন। পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নামজাদা প্রকাশককে বলে দেবেন 'অমুকের লেখা ছাপুন!' 'পুরস্কার কমিটি' তাঁর নাম সুপারিশ করবে।

নির্বাসন। একমাত্র পথ। এটা অভিমানের কথা নয়। পালানোর নয়। একে আমি বলব শিল্পীর প্রতিবাদ। তাঁর আত্মরক্ষা। নিজস্ব ভূমি, স্বাধীনতা রক্ষার একক লড়াই।

'যোগসূত্র' সেই দ্বীপ হয়ে উঠুক। নির্বাসনে পুরস্কৃত লেখকরা নিজের-নিজের নামাঙ্কিত ঝাণ্ডা পুঁতে দিক এই দ্বীপে। এক মহান শিল্পোৎসবের সূচনা ঘটুক।

ফিরে যাই রাজনীতির কথায়, ক্ষমতার কথায়। ফাঁদগুলি চিনে নিতে হবে। ন্যালাক্ষ্যাপা লেখকের দিন শেষ হয়েছে। বিমূর্ত মুদ্রা শাসিত সমাজ তাঁকে গিলে ফেলবেই। শাসক-শ্রেণী কিছু টাকা গোনে না বসে-বসে, শুধু সংখ্যায় চোখ বোলায়। দরিদ্র মানুষের 'হা-অন্ন', তার খিদে, রাজনীতির বক্তৃতা ও নির্বাচনী ইসতেহারে, ক্ষমতার গোলক ধাঁধায় হয়ে ওঠে এক চিহ্ন বিশেষ! ভালবাসা সেও এক চিহ্ন। এতখানি অপ্রত্যক্ষতা, দূরত্ব বাস্তবের এক নিষ্করুণ অপমান। ক্ষমতার এই শীর্ষ থেকেই দাস শিবিরের গদ্যকারের কাছে সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্দেশ পাঠানো হয় : ব্যক্তি নয়, তার স্বপ্ন নয়, রাজনীতির জোব্বার মধ্যে অনড়, অসহায়, জনগণ নামক এক বিপুল মাংসপিণ্ডের খিদে, যৌনতা ও বিকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবচিত্রণই কাম্য। বিবরণ, বিবৃতিতে ঠাসা পুনরুক্তির পুনরুক্তি করে যাও শুধু।

কালের বিচারে কোন লেখা টিকে থাকবে, কোনটাই-বা ধুয়ে মুছে যাবে নিশ্চিত করে কেউ সে কথা বলতে পারবে না। এখনকার লেখক কালকে কলা দেখান। বেশ করেন ধ্রুপদী সাহিত্য কাটা-ছেঁড়া করে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ তুলে আনেন লেখক সমালোচক। তারপর এক, দুই, তিন, চার এই ক্রমে এখনকার লেখার বিচারে বসেন। জ্ঞানপীঠ-সহ নামজাদা বহু পুরস্কারের ক্ষেত্রে 'এপিক'—গোত্রের রচনার প্রতি পক্ষপাতও

বোধহয় এই কারণেই। একটি গল্পকে টেনে বড় করা, সমাজ ইতিহাসের কোনো-না-কোনো পর্বকে আশ্রয় করে লেখা, বহু চরিত্র আমদানি, ঐতিহাসিক নথি ঘাঁটা, ডিটেলের মহামারী ঘোষণা ইত্যাদির ছক কাটা পথে প্রায় প্রতি বছর ঢাউস উপন্যাস উৎপাদিত হচ্ছে এ কারণেই। লেখা নয়, সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা নয়, পুরস্কার-দৌড়, জন-চিত্ত, সমালোচক-চিত্ত জয়ই লক্ষ্য। আমাদের সমাজে আড়াল ও পরোক্ষতাই সত্য বলে, অর্থ-যশ লিপ্সা চরিতার্থ করতে কলম বা তুলি ধরতে হচ্ছে এবং এ ধরনের থিয়েটারে যা হয়, তাই হচ্ছে, লেখককে মঞ্চে উঠতে হচ্ছে, তার মুখের উপর ঝলসে উঠছে আলো। মঞ্চ থেকে জলদগম্ভীর কণ্ঠে ওই লেখক ভাঁড়টি বলে চলেছেন 'জীবনের জন্যই শিল্প' গোছের গোদা-গোদা কথা।

যখন কিশোর পাঠকও জেনে ফেলেছে লেখকের 'তিন নম্বর চোখ' আছে, মাথায় রহস্যের গুদোম আছে—এর থেকে গুল আর কিছু হয় না, তখন শুধু ব্যবসার খাতিরে এই ধাপ্পাটিকে, প্রতিভার এক পুরাণ কাহিনীকে দেয়ালে আঁকতে ব্যস্ত রঙ কোম্পানির শিরোমণি মোটা এম. ডি.। আর তারই পাশে ছুকছুক করা কিছু ঠিকেদার লেখক ও কবি। এই যদি হয় শিল্পের জমি তো সেখানে কোনো সারমেয় অবধি পেচ্ছাপ করার জন্য তুলে দেবে না নিজের ঠ্যাং-টি। সে ন্যাজ তুলে পালাবে। আমার বিশ্বাস আর যাই হন লেখক নিশ্চয়ই কুকুরেতর নন। তিনি তো ভাবতে পারেন!

লেখা ছাপা, নিন্দে প্রশংসা, পিঠ চাপড়ানি সাফল্যের ক্ষেত্র দুর্ভাগ্যবশত প্রস্রাবপিপাসু ওই দেয়ালটিই, ওইটিই সাহিত্যের মঞ্চ।

নির্বাসন প্রয়োজন এই মঞ্চ থেকে, ওই অ্যাসিড আলোর বৃত্ত থেকে।

এও বাহ্য। নির্বাসনের মূল রহস্য রয়েছে শিল্পতত্ত্বের প্রশ্নে। সাহিত্য বিষয়ক প্রচলিত, জীর্ণ ধারণাগুলি আমাদের বিস্মৃত হতে হবে। নির্বাসন-তত্ত্বের এইটেই সব থেকে কঠিন পর্যায়। কী করে ভুলি সেই সব তোতাপাঠ। বিস্মরণের নতুন পাঠের জন্য প্রায় এক নতুন জন্ম প্রয়োজন।

শিথিলভাবে, বদভ্যাসে সাহিত্যে ভাষার যে ব্যবহার করে চলি, যেরকম তথাকথিত সাহিত্য-সাহিত্য ভাব আমদানি করি ভাষার সেই গর্ভে নতুনের সম্ভাবনা নিহতই হতে পারে কেবল।

কথা বলে দেখেছি আমি একা নয়, অনেকেই এভাবে ভাবেন, কষ্ট পান, খেদ প্রকাশ করেন দাস শিবিরের স্ফীত সাহিত্য কলেবর দেখে। আমি শুধু সব কটা কথা এক দমে বলে গেলাম এই আশায় যে এখানেই শেষ নয়, মরুতেই শেষ নয় সব।

শঙ্কর ভট্টাচার্য
৩/ডি, ড. জগবন্ধু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১২

আন্দোলন আন্দোলন খেলা নয়

এরকম একটা কাগজের দরকার ছিল সত্যিই, সত্যিই দরকার ছিল এমন একটা পত্রিকার, যেখানে দশকের কথা নিয়ে ঢাক বাজানো হবে না বা ফাঁকা আন্দোলন-আন্দোলন খেলা চালানো হবে না। এসবের বদলে এখন বোধহয় দরকার সামনে-পেছনে তাকিয়ে পরিস্থিতিটাকে একটু বুঝে নেওয়ার, 'যোগসূত্র' সেটুকুই করতে পারে। যেমন তা সে করেওছে দ্বিতীয় সংখ্যায় চিত্তপ্রসাদের উপর ক্রোড়পত্রটিতে বিশেষ করে, এটাই সে করুক। করুক, কারণ সত্যিই এটার দরকার আছে। আমরা চিত্তপ্রসাদ বা এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে ভুলে যেতে বসেছি, ভুলে যেতে বসেছি বারীন সাহার মতো মানুষকেও যিনি প্রখর বিশ্লেষণে সরব হতে পারেন, 'চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব', ১ এবং ২-এর মতো রচনায়। সঠিকভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, 'হিউম্যান কনটেক্সটে ধরলে আমি বলব 'পথের পাঁচালি' ইজ এ ভেরি গুড ফিল্ম। কিন্তু ইনডিয়ান কনটেক্সটে ধরলে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ পেলে মনে হয় এ প্রাইজ ফিল্ম-এর জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য। আর ভারতবর্ষ তো ওই দেখানো হয়েছে!' (টুকরো কথা, যোগসূত্র ৩, পৃ ৮৭) আসলে সম্পাদকমশাই, আমাদের জাতটাই যেখানে একটা তাঁবেদারের জাত হয়ে গেছে, ভিখিরির জাত হয়ে গেছে, যেখানে ঠিক হোক ভুল হোক একটা প্রশ্ন তোলার মতো মানুষ পর্যন্ত নেই সেখানে ঐ ধরনের ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব ব্ল্যাক আউট করাটাই জরুরি জানি, তবু রাজা যে ন্যাংটো এটা বলার মতো একটাও লোক থাকবে না মানতে, একটু কেন, বেশ অনেকটাই গায়ে লাগে। 'যোগসূত্র' প্রমাণ করল আরো কারো-কারো লাগে। এটাই বা কম কী? দেশময় আগাছার মতো হয় কাল্পনিক-গ্রামের তৈরি-করা ভাষায় লেখা গল্প-উপন্যাস নয়তো শহুরে মানুষের কোনো সমস্যারই মূলে না পৌঁছতে পারার অসহায়তা থেকে লেখা গল্প-গাঁজার বিপরীতে এ কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যায় বেরুনো অরুপরতন বসুর 'প্রতারক' এবং তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্মোহন'-এর উজ্জ্বলতাটুকু? অরুপরতন বসুর গল্পের ভূমি, মনে পড়ছে, এক রাত্রে যখন আমি গল্পটি একটানা পড়েছিলাম কোনো চায়ের দোকানে হট্টগোলের মাঝখানে বসে আমাকে কতটা আক্রান্ত করেছিল তার সাক্ষী রয়েছেন আমার এক পূর্বজ, যাঁকে প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম এ গল্প আমাকে এতটাই আহত করেছে যতটা হলে বলা যায় 'অমানবিক'। মনে আছে আমার বন্ধু দস্তয়েভস্কির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন এবং আমিও খুঁজে পাই নি আপত্তির কারণ। পাশাপাশি রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি এ সংখ্যায়! 'সম্মোহনের' প্রতিটি বাঁক, তাঁর

ভাষার প্রত্যেকটি অভিঘাত, মোচড়, অনুভূতি, উত্তাপ আমাকে লেখাটির কাছে বারবার ফিরিয়ে এনেছে। 'অংশগ্রহণ' নামে ওঁর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থটির পর এ লেখা প্রমাণ করে উনি আরো-আরো-আরো পরিণত হয়েছেন এবং আক্রমণোদ্যত, যার প্রকোপ থেকে বাঁচা কঠিন। অনেকদিন বাদে ওই দুটি গল্প পাওয়া গেল যা, বলতে কী 'যোগসূত্র' আগামী সংখ্যার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েই দিয়েছে। আমি আশা করতে চাই চতুর্থ সংখ্যা 'যোগসূত্রে' আরো একটি অন্তত এ ধরনের গল্প থাকবে, এবং কোন ক্রোড়পত্র বা প্রবন্ধ, যা পাঠককে ভাবাবে, বিরক্ত করবে, রাগিয়ে দেবে কেবল নিস্তেজ করে ফেলবে না। না প্রিয় সম্পাদক, আমরা চাইছি না 'এমন গপ্পো, এমন লেখা বেশ ফিরে ফিরে পড়া যাবে, চেটে চেটে পড়া যাবে, হইহই করে পড়া যাবে, যে কোনও পৃষ্ঠা যে কোন লাইন থেকে পড়া যাবে (সম্মোহন, যোগসূত্র / ৩, পৃ ১২৭)। চাইছি না, বরং চাইছি আরো এ ধরনেরই লেখা, এরকম, যা হই-হই করে পড়া যায় না। অবশ্য তাতে আপনাদের কাগজের খরচ চালানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে কেননা আমরা এখন আর চিন্তা করতে ভালবাসি না। যে লেখা ভাবায় এসময় তার চাহিদা না থাকাই স্বাভাবিক। তবু আপনাদের যুদ্ধ তো ওই রুচিবোধেরই সঙ্গে, ভয় কী?

'যোগসূত্রের' জন্যে শুভেচ্ছা। কাগজ আরো সমৃদ্ধ হোক। ছড়িয়ে পড়ুক। শ্রদ্ধা।

পার্থ মুখোপাধ্যায়
৬৪, শ্যামবাজার স্ট্রিট কলকাতা-৪

মতামতের দায়িত্ব নিচ্ছি : বারীন সাহা

'যোগসূত্র'-এর তৃতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯২) আমার নামে কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে। লেখাগুলি যথাক্রমে : (১) চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব— ১, (২) চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—২, (৩) টুকরো কথা।

'চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—১' লেখাটি আমার নয়। এর ভাষাও আমার নয়। এই লেখাটি কয়েক দিনের যৌথ আলোচনার ফল। ওই লেখাটির ভাষা শ্রদ্ধেয় ৺বিনয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের। সেই সময় 'দর্শক' পত্রিকায় কোনও লেখাই কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে ছাপা হত না। 'চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব— ১' নিবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণত আমি গ্রহণ করতে পারি। যাই হোক, আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের জানা দরকার যে, এটি আমার লেখা নয়।

কার ভুলে লেখাটি ছাপা হয়েছে সে আলোচনা বর্তমানে অবান্তর।

বারীন সাহা
গড়পার, কলকাতা

মুদ্রণেরও বিষয়গত ভূমিকা থাকে

আপনাদের পত্রিকাটি আগ্রহভরেই সংগ্রহ করেছিলাম। অনেকগুলো ভাল রচনার সংকলন 'যোগসূত্র'-কে সাধুবাদ জানাতে হয়। মনে হয়েছে আপনাদের লক্ষ্য যেন গোড়ার দিকে —ভাল লাগার কারণটা মোটের ওপর এই-ই। হিতেশ সান্যালের রচনাটির সম্পাদিত রূপ প্রকাশের মধ্যে সে দায়িত্ববোধেরই ইঙ্গিত পাই। যে অজস্র রচনা জরুরি হলেও আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে তার কিছু কিছু সম্পাদিত হয়ে 'যোগসূত্রে' প্রকাশ পাবে— আশা করছি। প্রতিমা বড়ুয়ার লোককথা সরল অথচ মূল্যবান লেখা। আপনারা ছাপা নিয়ে ভাবতে চেয়েছেন— প্রুফ পড়েছেন যত্ন করে হরফ নির্বাচন এবং অঙ্গসজ্জায় রুচির পরিচয় আছে ; ছোট মেজারে লোককথার চেয়ে ব্রিটিশপূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা কম্পোজ করালে বেশি ভাল হত। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের ক্ষোভ যথার্থ — তিনি তাকে ক্রমে পটুয়ার সময় থেকে পুরাণকথার কালের আলোচনায় পৌঁছে দিয়েছেন। পটুয়াদের নিয়ে, কারুশিল্পীদের নিয়ে, আদিবাসী সমাজকে নিয়ে ধোপদুরস্ত আনুষ্ঠানিকতার ধাষ্টামো পৃথিবী জুড়েই চলছে— এ হেন বিলাসিতার নৈতিক অধিকার কারোই থাকতে পারে না। বাস্তারের দিনলিপি আমাদের উন্মূল জীবনে সত্যলগ্নতার স্বাদ আনে। বারীন সাহা 'শনিবার' বলে একটি ছোট ছবিও করেছিলেন। তাঁর 'নন্দনতত্ত্ব – ২'-এর মাথায় আপনি লিখেছেন, '১৯৬৩ সালে 'দর্শক' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে…', 'ওই লেখাটি…' হওয়া দরকার ছিল। দেবীপ্রসাদের রচনাটি বিশেষ কাজের।

একটু অন্য কথা বলি। প্যারাগ্রাফিং কারো কারো মতো [বারোমাস] আপনারাও ইনডেন্ট করে করেননি – আবার দু-অনুচ্ছেদের মধ্যে লেডিংও এক রেখেছেন। মুদ্রণেরও বিষয়গত কিছু ভূমিকা থাকে…এসব না করলে সেটুকু ব্যাহত হয়। অপরাহ্ণ (পৃ ১৭), আভ্যন্তরিক (পৃ ১৯), উনিশ (পৃ ২৪—কিন্তু ঊনবিংশ), সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি (পৃ ৩১), ধাঁধা (পৃ ৫৫), সচ্ছল (পৃ ১০৬)—বানানগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা দরকার। 'ঐ' না লিখে 'ওই' লেখাই ভাল—এই কে কী লিখি ! আপনাদের ছাপাখানায় যে হরফ আছে তাতে 'স্থ'-কে 'স্থ' করা যাবে—সেটাই স্বচ্ছ। অন্তঃবিসর্গ পরিহার করা ভাল—প্রসঙ্গত (পৃ ৪৯)। আদ্রে নয় আঁদ্রে বাজাঁ (পৃ ৮৪)। ৩৭ পৃষ্ঠায় হয়েছে কিংবদন্তি, ১০৩-এ কিংবদন্তী - বানানের একরূপতা বিঘ্নিত হয়েছে।

শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
রহড়া

স্মরণ :

রাধারমণ মিত্র

উজ্জ্বলা রক্ষিত রায় (মজুমদার)

সত্যজিৎ রায়

□

With a lot of good wishes from :

M/s. DAS PRINTERS

123/1 ACHARYA P. C. ROAD
CALCUTTA 700 006
Phone : 35 4312 / 36 1543

LEADING HOUSE OF QUALITY LETTERPRESS
& OFF-SET PRINTING

□

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

রবীন্দ্রসঙ্গীতে চিরসুন্দরের নিত্য আনাগোনা

পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি—মূলত এই ত্রিধারায় রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে আমরা পাই। এই নির্বাচন কবি স্বয়ং করে গেছেন এবং সেইভাবেই গানগুলিকে নানা প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে।

কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গানগুলি এইভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত হলেও একটা যেন মেশামিশি ঘটেছে। বাণী অনুসারে প্রকৃতির কোনো কোনো গান মনে হয় পূজা পর্যায়ে স্থান পেলে ভালো হত। তেমনই পূজার অনেক গান প্রকৃতির ভাবে রসে মুখর। প্রেম অংশের অনেক গানে নিবিড় অধ্যাত্মানুভূতির প্রকাশ। সে প্রেম যেন মানুষী ভাবের মধ্যে তাঁকেই খুঁজছে যাঁকে ধরা যায় না দৃষ্টিতে বা শ্রবণে। সেই স্পর্শাতীত এবং লোকাতীত কোনো সত্তার প্রতি গানগুলি গভীর আকুতি জানায়।

অবশ্য বেশির ভাগ গানই যে বিভাগানুযায়ী সঙ্গত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে যে গানগুলির ভাব ও বাণী এই শ্রেণী বিভাগের রীতি না মেনে পরস্পরের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সেখানে মনে হওয়া সম্ভব যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সেরকম উদাহরণ হয়ত দেখানো যায়।

কিন্তু যে অসঙ্গতি আমাদের চোখে ধরা দেয় এবং যা মনে হয় অন্যভাবে করা গেলে ভালো হত তা হয়ত আমাদের গানের কথাগুলিকে তাদের ভাষাগত বা আক্ষরিক অর্থে বোঝাবার চেষ্টার দরুণ। রবীন্দ্রনাথের সকল গানের পিছনেই যে জেগে রয়েছে একটা অন্য কোনো তত্ত্বের আভাস, যা শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়মনের বা বিচারবুদ্ধির এলাকায় গণ্ডিবন্ধ নয়, তা একটু গভীরভাবে গানগুলিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের অনুভবে তার বাইরের রূপটিই মাত্র নয়। তার মধ্যে সর্বব্যাপী এক বিশ্বাত্মাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। সেই বিশ্বাত্মা এবং তাঁর মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ রয়েছে। এই যিনি সর্বরূপের মধ্যে থেকেও আড়ালে রয়েছেন তাঁকে কবি দেখছেন চিরসুন্দর রূপে। কিন্তু বাইরে তিনি নেই, আছেন তাঁরই মধ্যে, তাঁর অন্তরে। তাঁর সঞ্চরণ প্রকৃতিতে ফুল ফোটায়, সুগন্ধ বহায়, ঋতুর ডালা ভরে অর্ঘ্য সাজায়। প্রকৃতি তাঁরই বন্দনা।

বসন্তের আগমন তাঁরই উৎসবের আনন্দ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়—তাই কবি গান বাঁধেন—

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে।
জগৎজনহৃদয়ধন চাহি তব পানে ॥

এই গানটি প্রকৃতির মধ্যে স্থান পেলেও ভাবের দিক দিয়ে এটি একটি ভক্তিগীতি; অধ্যাত্ম আবেদনে ভরা। তবু এটিকে প্রকৃতিরই গান ধরা হয়েছে, তারই মাধুর্যকে প্রকাশ করেছে।

পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি সব গানেতেই আমরা পাই একটা কোনো বিশেষ উপলব্ধির পরিচয়। পরম অব্যক্তের মহিমা জগতের সকল অভিব্যক্তির অন্তরালে বিরাজ করছে। পূজার গানগুলি স্তবগীতি, সেই পরমের প্রতি নিবেদিত। জগতের সকল শোভা, সকল রূপ তাঁরই আভাস বহন করছে। প্রকৃতির মাধুর্যে তাঁরই আনন্দ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠছে। সেই বিশ্বভাবন পুরুষের সঙ্গে মরমী অন্তরের নিবিড় সাযুজ্য। বিশ্বজীবন তাঁরই অভিসারে চলেছে তাঁকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু সে চলায় আনন্দ এবং দুঃখ দুই-ই আছে। মানুষের হৃদয়ের তারে বেজে উঠছে পাওয়া না পাওয়ার আশা-নিরাশার সুর। যে অধরাকে সে ধরতে চাইছে তা যেন কেবলই তাকে এড়িয়ে যায়। জগতের সব কিছুতেই তিনি আছেন, তাঁর ইচ্ছায় সবকিছু স্পন্দিত হচ্ছে, সবকিছু স্বরূপ এই যে তিনি, তাঁকে না জানলে কোনোকিছুকেই সত্যরূপে জানা যায় না। এই আধ্যাত্মিক অনুভবটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল আশ্রয়।

কয়েকটি গানের উল্লেখ করলে এই সত্যটি বোঝা যাবে এবং পূজা প্রেম ও প্রকৃতির ভিতরে যে একটি একাত্মতা রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি গান—'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে'— এই গানটি প্রকৃতি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠানের জন্য কবি কয়েকটি গান শেষ জীবনে রচনা করেছিলেন। এ গানটি সেগুলির মধ্যে একটি। গানটি যাঁরা শুনেছেন অথবা গেয়েছেন তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন। এর বাণী এবং সুরে এমন একটি তন্ময়তা প্রকাশ পায় যা আমাদের চিত্তের সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। মানুষের অন্তরের গহনে একটি বিরহী হৃদয় রয়েছে। চিরকালই সে তার বেদনা জানিয়ে চলেছে তার মর্মগভীরের আপনাকেই। প্রকৃতি সেই বর্ষণঘন রাত্রির বিরহকেই যেন স্মৃতিতে উদ্বেল করে তোলে। কিন্তু গানটির বাণী ও সুরের সঙ্গমে এমন এক লোকাতীতের অনুভূতি পাওয়া যায় যা ব্যাখ্যাতীত।

এই গানটি অনায়াসে প্রেমের গানগুলির মধ্যে স্থান পেতে পারত। কারণ যে 'পুঞ্জিত বেদনা' কবির প্রাণে সুরের সংকেতে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তা প্রেমেরই বেদনা, প্রেমেরই এক বিমূর্ত অনুভূতি। কিন্তু কার প্রতি? কার কানে কানে কবি শোনাতে চান তাঁর অন্তরের এই আনন্দ-বিরহের বাণী? তার সত্যটি তো আসলে

ঈশ্বর বিরহেরই, তারই রসনিবিড় আকুতি। সে হিসাবে এ গানটি অন্য অনেক পূজার গানের মতো পূজা খণ্ডেরই অন্তর্গত হতে পারত। কিন্তু গানটি কবি রচনা করেছিলেন বর্ষা বন্দনার গান হিসাবেই।

এর সঙ্গে ওই উপলক্ষে রচিত আর একটি গানের উল্লেখ করা যায়। সেটি হল— 'আমার প্রিয়ার ছায়া।' ভাবের দিক দিয়ে এটিকেও প্রেমের গান বলা চলে। একই বিরহের আকুলতা এর বাণীতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এটি প্রকৃতির ভাব সম্পৃক্ত। বিশ্ব প্রকৃতির দিকে অন্তর পুরুষ যেন চেয়ে আছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, বিধুর হৃদয়ে। আগের গানটিতে যে বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল হৃদয়ের অস্ফুটবাণী এখানে তা কোনো এক পলাতকা স্মৃতিকে খুঁজে পায় প্রকৃতির বর্ষার ছবিতে। এই গানটিকে প্রকৃতির একটি সূক্ষ্ম মর্মর কাব্যগীতিরূপেও দেখা চলে।

বর্ষার এই গানটির সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি কবির পূর্বে রচিত অন্য একটি গানকে—'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি'। বাণীর দিক দিয়ে এটিকেও বর্ষাগীতি মনে করলে কোনো আপত্তি ওঠা উচিত নয়। এর কথাগুলিতে এক অন্তরবাসিনী প্রিয়ার স্মৃতি বর্ষার সজললীলায় যেন জেগে উঠেছে। তবু কোনো ভাবেই এ গানটি সাধারণ অর্থে একটি প্রেমের গানরূপে গণ্য করা যায় কিনা সন্দেহ।

প্রেম খণ্ডের আর একটি গান আমরা আমাদের এই আলোচনায় উল্লেখ করতে পারি। এটি 'বনে যদি ফুটল কুসুম'। এই গানটির ভাষায় ও সুরে বিরহের করুণ ভাব প্রকাশ পায়। কবি এখানে একটি পাখিকে প্রতীকরূপে গানটির মধ্যে রেখেছেন। এই পাখি সেই পাখি যার ডাক প্রকৃতির প্রাণে আনন্দধারা বইয়ে দেয়; যার অভাবে হৃদয় নিরানন্দময় মরুভূমির মতো শুষ্ক হয়ে থাকে। এই পাখিকে মনে করতে পারি আমাদেরই অন্তরের চৈতন্য স্বরূপ, যাঁর পরশে নিখিলভুবন আনন্দিত হয়ে ওঠে, বসন্তের গান জেগে ওঠে। কিন্তু হৃদয়ের সেই পাখিটিকে যদি না পাওয়া যায়, যদি না সে যোগ দেয় বাইরের সকল সমারোহে প্রাণের সকল উৎসব ব্যর্থ হয়। এ গানটিতে এক লোকোত্তরের এষণা আমরা দেখি— 'কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি'। এ গানটিতে পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিক ভাব প্রকট। যাকে সাধারণত প্রেমের গান বলে ধরা হয় এ গানটি যেন তা থেকে অনেকদূরে সরে গেছে। তবু গানটিকে প্রেমের খণ্ডেই কবি স্থান দিয়েছেন, যদিও আমাদের মনে হতে পারে এ গানটি পূজা খণ্ডে স্থান পেলেই যেন সঙ্গত হত।

পূজার কোনো কোনো গানে প্রকৃতির এমন রূপময়ী মাধুর্যের ছবি কবি এঁকেছেন যাকে আধ্যাত্মিক গানের পঙক্তিতে দাঁড় করানো আমাদের কাছে একটা ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। একটি গানের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'। কোন এক দিনান্তের রঙ লাগা আকাশের দিকে চেয়ে দেখছেন

কবি। গানটি সেই বিশেষ ক্ষণের একটি নিখুঁত বর্ণনা, যা অনুভূতির পর্দায় সৌন্দর্যের মূর্ছনা জাগিয়ে তোলে। এই গানটিকে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির একটি অনুপম বন্দনা বললে অসঙ্গত হবে না। ইন্দ্রিয় মনের রসাবেশে তা বিভোর। কিন্তু কবির চেতনার এই রসাবেশের আড়ালে রয়েছেন বিশ্ববিমোহন সেই পরমসুন্দর। বৈদিক ঋষিরাও এইভাবেই প্রকৃতিকে দেখেছিলেন। মধু বায়ু বইছে, নদী মধু-ধারাকে ক্ষরিত করছে। তবু মনে হয় গানটির সৌন্দর্য আমাদের চিত্তবৃত্তির কাছেই বিশেষ আবেদন জানায়। প্রকৃতির মাধুর্য আমরা দৃষ্টিতে শ্রবণে ঘ্রাণে স্পর্শে অনুভব করতে পারি। আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু চিত্তের প্রসার ঘটে। মনেতে একটি রঙিন সন্ধ্যার দৃশ্যপট ফুটে ওঠে। গানটিকে প্রকৃতির গান বলা সঙ্গত। তবু তার মধ্যে আমরা শুনি যেন অসীমের সুর, অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে যা টেনে নিয়ে যায় কোন্ সুদূরের পারে, সকল দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে।

এইবার আমরা এমন একটি গান নিয়ে আলোচনা করছি যেটি প্রকৃতির গান হিসেবে ধরা হয়। গানটি 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'। এ গানটিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। পুরোপুরি এটিকে বলা যায় আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। এক অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রিতে তাঁর পরাণসখা অভিসারে চলেছেন। অভিসারের শেষে মিলন, কিন্তু দুর্যোগময়ী রাত্রি পেরিয়ে যেতে হবে। মরমিয়া সাধকের প্রাণে বাইরের অন্ধকার তাঁর ঈশ্বর বিরহের বেদনাকেই তীব্র করে তোলে। ঈশ্বর এবং জীবের হৃদয়ে এক নিত্যলীলা চলেছে। সাধক সর্বত্রই তাঁকে দেখেন; সকল রূপ সেই কৃষ্ণের রূপকেই মনে করিয়ে দেয় বৈষ্ণব কবি যেমন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই এই মরমী উপলব্ধির পরিচয় মেলে। গানটিতে প্রকৃতির দুর্যোগরাত্রির বর্ণনার সঙ্গে ওতপ্রোত হৃদয়ের একটি ছবি। মরমী ঈশ্বরকে দেখেন তাঁর সখারূপে কখনও দয়িত রূপে। বাইরে ঝড়, অন্ধকার, মন শংকায় ভরে উঠেছে! কোনো গৃহবধূর মন যেমন শংকায়িত হয়ে ওঠে স্বামীর কথা ভেবে, এই মানুষী প্রাণের ভাবটিকেই কবি ভরিয়ে তুলেছেন তাঁর ঈশ্বর বিরহের বেদনায়। সেই যিনি তাঁর একান্ত অন্তরতম প্রিয়, বহুদূরে যেন তিনি অন্ধকারের ভিতর তাঁর পথ হয়ত কোনো গহন বন, উত্তাল নদী পার হয়ে তিনি চলেছেন। এই আত্মরত অনুভূতির ভিতর অধ্যাত্মভাবকে আমরা অতি সহজে পাই। এই সহজে পাওয়া, সহজে ছোঁওয়া অনির্বচনীয়কে—মরমিয়া সাধনার এইটিই বিশেষ সত্য।

এ গানটিতে প্রকৃতি ও পূজার মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে, যদিও আধ্যাত্মিক ভাবটিই এর মধ্যে প্রধান। যে ঈশ্বর প্রেম, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে সর্বব্যাপী, সেটি এই গানে সুস্পষ্ট। এই একই ভাবনা আরও একটি বর্ষাগীতিতে আমরা দেখি—

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই গানটিতে। সেই একই বিরহের সুর, প্রকৃতির ঘনঘটা তাকে যেন আরও বিধুর করে তুলছে। 'তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা।' এই উক্তি কেবলমাত্র এক বিরহবিষণ্ণ নারীহৃদয়ের অন্তরঙ্গ বেদনাকেই জাগিয়ে তোলে। আমরা স্মরণ করতে পারি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে রাধার বিরহ ব্যথার পদটি—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'। এ দুটি গানই যে আধ্যাত্মিক পর্যায়ের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের এই আলোচনায় যে বিশেষ কথাটি বলতে চেয়েছি তা হল, রবীন্দ্রসঙ্গীতের আঙ্গিক যাই হোক এবং যে ভাবেই তার বিভাগ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতির গানের পশ্চাৎপটে রয়েছে এক অখণ্ড অনুভূতি। এক অদ্বৈতকেই কবি তাঁর সমস্ত গানের প্রেরণা, গানের উৎসরূপে দেখেছেন। সেই অদ্বৈতকে তিনি দেখেছেন পরমসুন্দর রূপে। পরম, তাই তিনি অরূপ, কারণ কোনো রূপই তাঁর অসীমতাকে অনির্বচনীয় রূপকে ব্যক্ত করতে পারে না। সেই পরমসুন্দরই তাঁর হৃদয়ের গোপনে বাস করেন। তিনি অন্তর্যামী, বিশ্বভুবন তাঁরই প্রকাশ। তাঁকেই তিনি খুঁজেছেন তাঁর গানের অর্ঘ্য সাজিয়ে কখনো প্রকৃতিতে, কখনো আপন হৃদয়ে, কখনো বা বিশ্বাতীত পরম সত্তায়। প্রকৃতির রূপে, রসে তাঁরই রূপ তিনি ধ্যান করেছেন। ভক্তি প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভব-চেতনার একটি উৎসমূল হতেই নেমে বিভিন্ন ধারায় বয়ে গিয়েছে। সেই হিসাবে দেখলে সঙ্গীতের বিভাজনে যে একটি মেশামিশির ভাব কখনো আমরা দেখি তাকে হয়ত অসঙ্গত বলা চলে না। □

রাজ্যেশ্বর মিত্র

রামনিধি : একটি বিস্মৃত প্রতিভা

১৩৯৮ বঙ্গাব্দের ২১ চৈত্র কিছুদিন পূর্বে গত হয়েছে। এই তারিখে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে স্বনামধন্য গীতিকার রামনিধি গুপ্ত ৯৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১১৪৮ বঙ্গাব্দে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে তিনি পরলোকগত হয়েছেন। আমি যেখান থেকে বসে লিখছি তারই একশো গজ দূরে ২০ নম্বর নন্দরাম সেন স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর দেহান্ত হয়। এ অঞ্চল তখন কলকাতা নামে পরিচিত হয়নি, এই পল্লীর নাম ছিল সুতানুটি। অদূরে সুপ্রশস্ত গঙ্গা ; নিধুবাবুর জন্মের মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে সুতানুটির চাঁপাতলা ঘাটের কিছু দক্ষিণে জোব চারনক তাঁর জাহাজ নঙ্গর করেছিলেন। তখন এ অঞ্চল অরণ্যাবৃত না হলেও বহু বৃক্ষে এবং বাগানে পরিবৃত ছিল। রাস্তা-ঘাট সবই গ্রামের মতন ; পালকি তখন একমাত্র যান। এছাড়া লোকে ঘোড়ায় চড়ে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করতেন। রাত্তিরে পথঘাট নিরাপদ ছিল না ; অন্ধকারে মশাল জেবলে লোকজন নিয়ে যাতায়াত করতে হত। রাত একটু বেশি হলে যাঁরা যেখানে থাকতেন সেখানেই থেকে যেতেন। অবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় ; সন্ধ্যা হলে বেশ্যাদের ব্যবসা জমে উঠত, সুতানুটির বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলে লোকের অর্থাভাব ছিল না। সময়টা মন্দ কাটছিল না, কিন্তু বর্গীদের উপদ্রবে কলকাতা বিপদাপন্ন হয়ে পড়ল। গঙ্গায় খাল কেটে বাগবাজার আর সুতানুটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। বালক রামনিধি কয়েক বৎসরের জন্যে হুগলির চাপতাগ্রামে বাস করে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলেন তখন নবাব আলিবর্দীর রাজত্বকাল ; তিনি বর্গীদের সম্পূর্ণভাবে শাসন করতে সমর্থ হলেন। সুতানুটির শান্তি আবার ফিরে এল নিধুবাবু কৈশোরেই ফিরে এলেন তাঁর নন্দরাম সেন স্ট্রিটের বাসভবনে।

নিধুবাবুরা বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। সেই সময়েই তিনি ইংরেজ পাদ্রির কাছে ইংরেজি শেখেন এবং পরে ইংরেজিতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ ছাড়া, সংস্কৃত, ফার্সি তো সকলকারই শিক্ষণীয় ছিল এবং তিনিও এ দুটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব ছিল বাঙলাভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন। তখন বাঙলার প্রতি লোকের বিশেষঃমনোযোগ ছিল না ; কাজকর্ম চলত ফার্সিতে, ইংরেজরা তাঁদের ভাষা-জানা লোক খুঁজতেন এবং মাইনেও ভাল দিতেন। কিন্তু এই যুগে বাস করেও নিধুবাবু বাঙলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সারাজীবন বাঙলা গান রচনা করে এবং গেয়ে কাটিয়ে গেলেন।

গান তিনি কলকাতায় বসেই শিখেছিলেন, কিন্তু কার কাছে কীভাবে শিখেছিলেন জানা যায় না। তখন কবিগানের যুগ, কিন্তু নিধুবাবু তাতে আকৃষ্ট হননি। প্রথমত যাঁরা কবি গাইতেন তাঁদের রুচি এবং সমাজকে তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। শ্রেণী হিসেবেও তাঁরা অনেক নিচে ছিলেন। কবির দলে যাবার মতন শ্রেণী থেকে তিনি উদ্ভূত হননি ; যথেষ্ট উচ্চ সম্প্রদায়ের বৈদ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পলাশির যুদ্ধের আরও কয়েক বৎসর পরে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ; তারও পরে তিনি কোম্পানির একটি ভাল পদ পেয়ে ছাপরার কালেকটারিতে যোগ দেন। এই ছাপরাতেই তিনি টপ্পা গানের সঙ্গে পরিচিত হন। এখানেই তিনি বাঙলা গানে টপ্পা এবং খেয়ালের রীতি প্রয়োগ করে এক নতুন রাগধর্মী সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হন।

বহু বৎসর ছাপরায় কাটিয়ে অনেক টাকা নিয়ে তিনি যখন কলকাতায় ফিরলেন তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে অগ্রসর হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই বয়সেই নতুন করে সংসার পাতলেন। তাঁর শেষ তৃতীয় বিবাহে সন্তানাদি হয় এবং তিনি তাঁদের ভাল করেই মানুষ করেছিলেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে নানা রটনা আছে। একসময় তিনি মদ্যপান করতেন এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও তাঁর কিছু দুর্নাম ছিল। শ্রীমতী নামে একটি গণিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনাও অনেকে পড়েছেন। কিন্তু ক্রমে তিনি সব সংসর্গই পরিত্যাগ করেন। শেষ বয়সে সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন এবং তারও পরে যতদিন বেঁচেছিলেন, কেবলমাত্র লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন। তিনি মিশুক স্বভাবের লোক ছিলেন না এবং ক্রমে একান্তভাবে আত্মগত হয়ে পড়েন। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে স্বয়ং রামমোহন রায় আচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে দেবার জন্যে। নিধুবাবু সানন্দে এই মহাপ্রাণ বয়োকনিষ্ঠকে একটি উত্তম ব্রহ্মসঙ্গীত উপহার দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় নানা কারণে রামমোহন গানটি সমাজে গাওয়াতে পারেননি এবং তিনিও কিছুকালের মধ্যেই গত হলেন।

ছাপরা থেকেই নিধুবাবুর নাম কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শুধু যে গীতিকার ছিলেন তাই নয়, উত্তম গায়ক ছিলেন। তাঁর গান শুনতে সেকালের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তাঁর আয়োজিত আসরে আসতেন, তিনি কারুর দ্বারস্থ হননি। লিরিক গানের সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রবাহ তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন, যাকে অবলম্বন করে, পরবর্তীকালে গীতিসাহিত্য ও গীতকলা গড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি বাঙলার গীতসমাজের শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও সেই শূন্যস্থানে আর কাউকে বসানো সম্ভব হয়নি। তাঁর সমসাময়িক দুজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম আমরা জানি,

তাঁরা হলেন কাঁসারিপাড়ার রাধামোহন সেন এবং কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালি মীর্জা। রাধামোহন পণ্ডিত মানুষ ছিলেন; তিনি সঙ্গীততরঙ্গ নামে একটি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন দীর্ঘকাল। কালি মীর্জা কলকাতায় থাকতেন না এবং কলকাতার গায়ক সমাজেও তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। যদিও তিনি রামমোহনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন, তথাপি রামমোহন নিধুবাবুকেই অধিকতর স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। এই তিনজনের রচনারীতিই কিন্তু অনেকটা এক ধরনেরই ছিল।

এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটি প্রভূত খ্যাতিলাভ করলেও তদনুরূপ প্রতিষ্ঠা পাননি। তার কারণ সে যুগে সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সঙ্গীতকে লোকে পছন্দ করলেও গায়ককে মর্যাদা প্রদান করতেন না, গায়কেরা তখনও ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন! এর ফলে নিধুবাবুর একটি ছবি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এক ধরনের লোক ছিলেন যাঁরা চিরকাল তাঁর চরিত্রগত দুর্নাম রটিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে যেখানে সেখানে নিধুবাবুর রচনার প্রতি অশোভন কটাক্ষ প্রদর্শন করেছেন, অথচ গীতরচনার ক্ষেত্রে প্রতিভার দিক দিয়ে তিনি নিধুবাবুর কাছেও যেতে পারেন নি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক রটনা হচ্ছে নিধুবাবুর গানের অশ্লীলত্ব; অথচ এত সুমার্জিত সুরুচিপূর্ণ রচনা সেকালে আর কারুর রচনায় দেখা যায় না। যাঁরা গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান উপভোগ করেছেন, তাঁরা নিধুবাবুর গান সম্পর্কে অশালীনত্ব আরোপ করলেন কোন বিবেচনায় তা বোঝা দুঃসাধ্য।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত শিক্ষিত সমাজ রামনিধি গুপ্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেছেন। যাঁর স্বীকৃতি হওয়া উচিত ছিল কাব্যসঙ্গীতের আদি কবি হিসাবে তিনি বিদ্বজ্জনের কাছে অবহেলা এবং নিন্দা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তাঁর নামে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি, কোনও রাস্তা পরিকল্পিত হয়নি, তাঁর কোনো স্মারক বলতে কিছু এই কলকাতার লোকেরা রেখে যাননি। গত শতাব্দীর নট-নটী নিয়ে অনেক প্রচার হয়েছে থিয়েটারের বাজে গান আজ ঘটা করে গাওয়া হয়; বহু বিশেষত্বহীন পুরোনো গান 'পুরাতনী' লেবেলে প্রচারিত হচ্ছে; কিন্তু নিধুবাবু এবং তাঁর অনুবর্তিগণের গান প্রচার করবার মতন শিক্ষা এবং নিষ্ঠা আজকালকার গায়কদের মধ্যে বিরল।

১৩৯৮ সনের ২১ চৈত্র এই সুতানুটির একটি গৃহে বসে এই কথাই মনে হচ্ছে যে একদা এই পল্লীর একটি বিরাট প্রতিভা কীভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন! দুর্ভাগ্যটা কাদের— সমগ্র বঙ্গবাসীর।□

অজিত চৌধুরী

পোস্ট মডার্নিজম এবং আমি

এক

পোস্ট মডার্নিজম বিষয়ক একটি সাদামাটা প্রবন্ধ লিখতে চাইছি। সহজ ভাষায়, যেন রামকৃষ্ণ কথামৃত।

অথচ পোস্ট মডার্নিজম বিষয়ে আমার পড়াশুনো খুব কম, নেই বললেই চলে, কয়েকটি বই উল্টেপাল্টে দেখেছি। পোস্ট মডার্নিজম : আমার হাসি পেল। প্রতিপাদ্যগুলো আমার কতদিনের চেনা-জানা, লিপিবদ্ধ করা, ওরা এখন আমার কথাগুলোই বলছে, একটু বিকৃতভাবে, মডার্নিজমের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আমার কথাগুলো ফিরে আসছে আমারই কাছে। পোস্ট মডার্নিজম বিষয়ক গ্রন্থগুলো পড়ার কোনো তাগিদ আমি অনুভব করি না, কেননা ওই সকল গ্রন্থগুলি আমারই লেখা। আমি এখন আমার কয়েকটি প্রতিপাদ্য আর একবার রাখব, পোস্ট মডার্নিজমের মোড়কে, তোমার কাছে। যুবক, শোন। এখনই তো শোনার সময়, যখন আমাদের মাথার উপর ভেঙে পড়ছে আকাশ এবং ঈশ্বরের হাড়গোড়।

অতএব এটি প্রিয় গায়ত্রী দি বা ডেরিডার পোস্ট মডার্নিজম নয়। এর প্রবক্তা আমি।

দুই

পোস্ট মডার্নিজম বলে (যে) কোনো কথারই ধ্রুব অর্থ নেই। সময়, কাল এবং অনুষঙ্গ ভেদে অর্থের ভেদ ঘটে। কাঠুরিয়া গাছটির দিকে তাকিয়ে দেখল কাঠ। পাখিরা গাছকে বৃক্ষ বলে জানল। পাখি এবং কাঠুরিয়ার কাছে গাছ সমান অর্থ বহন করে না। যে ডোমটি রবীন্দ্রনাথকে পুড়িয়েছিলেন, তিনি তো রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই 'লাশ' বলে গেলেন তাঁর ইন্টারভিউতে।

আবার কোনো শব্দই নিরালম্ব নয়। শব্দরা কথা বলে পরস্পর, বাক্যটি তৈরি হয়। তারপর বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ থেকে অধ্যায়, গ্রন্থ। বাক্যটিকে বদলে দাও, শব্দের মানে বদলে যাবে। অথবা একটি শব্দকে একটু অন্যভাবে বোঝ, বাক্যটি বিপরীত অর্থ নিয়ে আসতে পারে।

যেমন নিম্নবর্গের মানুষ চন্দ্রগ্রহণে দেখল : তাদের দেবতা রাহু চাঁদকে ঋণশোধ করতে বলছে।

একজন ঈশ্বরপ্রেমিক এই বাক্যটিকে বুঝতে গিয়ে কয়েকটি সমীকরণ তৈরি করেন :
দেবতা = মঙ্গলময় দেবতা, শুভ
⇒নিম্নবর্গ = রাহু
⇒উচ্চবর্গ = চাঁদ
⇒নিম্নবর্গ উচ্চবর্গকে ঋণশোধ করতে বলছে
⇒ইনভার্সান, বিদ্রোহব্যঞ্জক
নাস্তিকের দেবতা নেই। তাই তাঁর কাছে
দেবতা = দানব, অশুভ
সমীকরণ একের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাকি সমীকরণগুলো উল্টে গেল। দুই নম্বর সমীকরণ দাঁড়াল
নিম্নবর্গ ≠ রাহু
অর্থাৎ নিম্নবর্গ = চাঁদ
অতএব, উচ্চবর্গ = রাহু
⇒উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে ঋণ শোধ করতে বলছে
⇒নিম্নবর্গের ভয়।

নাস্তিক শুধুমাত্র একটি শব্দ (দেবতা) কে ভিন্ন অর্থে বুঝল এবং বাক্যটি উল্টে গেল। এইভাবে একটি শব্দের মানে বদলে দিয়ে যেমন বাক্যটির মানে উল্টে দেওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি গ্রন্থও বদলে যেতে পারে যদি তার কয়েকটি সংবেদনশীল শব্দ এবং বাক্য ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। যেহেতু বাকি শব্দ এবং বাক্যগুলি ওই সংবেদনশীল বাক্য এবং শব্দগুলোকে অবলম্বন করেছিল, তারাও বদলে যায়, গ্রন্থটির প্রতিটি লাইন পুনর্লিখিত হতে থাকে যতক্ষণ না একটি গ্রন্থ থেকে আর একটি গ্রন্থ বেরিয়ে আসে। এইভাবে গ্রন্থ থেকে গ্রন্থের জন্ম হয়। একে বলে ডিকনস্ট্রাকশন। গ্রন্থই গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থকার একটি মায়ামাত্র। দি অথর ইজ ডেড।

আমি ডিকনস্ট্রাকশনের কোনো তত্ত্ব রাখব না। ডিকনস্ট্রাকশন কোনো তত্ত্ব নয়, একটি প্রাকটিস। আমি একমুষ্টি ধুলি থেকে তৈরি করতে পারি শহর, মরুভূমি বা পদ্মফুল। আমি রবীন্দ্রনাথকে সন্দীপনি করতে পারি, সন্দীপনকে রাবীন্দ্রিক। আমার চারপাশের সমবেত লেখকেরা এবং গ্রন্থগুলি মায়ামাত্র। লেখক নেই গ্রন্থ নেই জ্ঞানী নেই অজ্ঞ নেই ঈশ্বর নেই।

আসল কথা হল অনুষঙ্গ। অনুষঙ্গ বদল কর, অর্থও বদলে যাবে, গ্রন্থটির অর্থ। গ্রন্থটির কয়েকটি সংবেদনশীল শব্দ যে বিশেষ অর্থ বহন করে, তাও তো অনুষঙ্গেরই জন্য। তারাই সুখী যারা তাদের পরিজনদের নিয়ে একটি বিশেষ অনুষঙ্গে বাঁচে। তাদের কাছে সবকিছু একটিই অর্থ বহন করে। এরা হল সুখী ব্যাঙ। কুয়োর ভিতরই দেখেছে বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড : ঈশ্বর।

আমাদের ব্যক্তিগত কূপ নেই, আকাশের নিচে আমাদের ঘর। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, মাস্তানের দাপটে আমাদের ঘর ভেঙে যায়। ভাঙা টুকরোগুলো জড়ো করি, আবার তৈরি হয় ঘর। ঘর থেকে ঘর। যাযাবর আমরা।

তিন

ফলত কোনো শব্দই নির্দিষ্ট এক অর্থ বহন করে না আমাদের জন্য। এমনকি ডিকনস্ট্রাকশন শব্দটিও। ইংরেজি সাহিত্যের দিদিমণি গায়ত্রীদি যেভাবে ডিকনস্ট্রাকশন বুঝবেন সেইভাবে আমি কি বুঝতে পারি, অর্থনীতির একজন ছাত্র? আমি অর্থনীতির তাত্ত্বিক প্রাকটিসের অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে ডিকনস্ট্রাকশন বুঝি। অর্থনীতিতে আমরা তাত্ত্বিক মডেল তৈরি করি। তারপর মডেল থেকে আর একটি মডেল, একটি প্রবন্ধ থেকে আরও প্রবন্ধ। কোনও প্রবন্ধেরই নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই আমাদের জন্য।
প্রাথমিক শর্তগুলো বদলে দাও। প্রবন্ধটিও বদলে যাবে। যাঁরা এই কাজ ভাল করতে পারেন, তাদের বলা হয় বড় অর্থনীতিবিদ।
আসলে সব শাস্ত্রেই এটি একটি চালু রীতি, এমনকি সাহিত্যেও। সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, 'নাউন আর ভার্বগুলোকে ধর। 'স্মৃতি তুমি বেদনা' এই কথাটির কোনো মানে হয় না। (কিসের স্মৃতি? তুমিই বা কে? আর বেদনাই বা কি?)।' অর্থাৎ সন্দীপন চাটুয্যে গদ্যরচনার একটি মডেল দিলেন। প্রশ্ন: এই মডেল থেকে কি আমরা আর একটি মডেল তৈরি করতে পারি? অথবা: মডেলটির ভিতরেই কি আরও অনেক মডেল লুকিয়ে (নিহিত) আছে? আমি কথাটিকে এইভাবে বুঝলাম যে তুমি স্মৃতি / বেদনা শব্দগুলি ব্যবহার করতে পার, তবে তার অ্যাসোসিয়েশনও রাখবে যাতে এই শব্দগুলিকে শনাক্ত করা যায়। অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং কংক্রীটের সমন্বয়ে আর একটি গদ্যশৈলী তৈরি করা যায়। মহৎ গদ্যকারেরা (সন্দীপন, রাঘব) গদ্যরচনার একটি মডেল অনুসরণ করেন, যার ভিতরেই থাকে অসংখ্য মডেল। কেউ-কেউ এই মডেলগুলি দেখতে পান। তাঁরা সাহিত্যিক। সাহিত্যিক ভাবেন, আমি গদ্যরচনার একটি ঘরানা সৃষ্টি করলাম। মৃদু হেসে বলার: ভুল। সবকিছুই ছিল। কেউ কেউ লক্ষ করে, বাকিরা করে না।
সচেতনভাবে মডেল থেকে মডেল তৈরি করার কাজকে বলে ডিকনস্ট্রাকশন।

চার

অর্থাৎ ডিকনস্ট্রাকশন হল না-এর মাধ্যমে একটি গ্রন্থ বা মডেল বোঝা। আমার সামনের এই টেবিলটি— এর কি কোনও মানে আছে? টেবিলটিকে আমি একাধিক না-এর মাধ্যমে বুঝি: যেমন, টেবিলটি চেয়ার নয়, পেন নয়, কালি নয়, মানুষ নয়

ইত্যাদি। এইভাবে প্রতিটি শব্দই অসংখ্য না-কে বহন করে, যারা শব্দটিকে শনাক্ত করে। হেগেল বলবেন যে এইভাবে টেবিলটিকে আমরা কোনোদিনই বুঝব না। হঠাৎ একদিন কেমনভাবে যেন (অ্যানালিসিস এবং সিনথিসিস সহযোগে) টেবিলটিকে আমরা টেবিল হিসেবে বুঝি। হেগেল রিভিলেশনে বিশ্বাসী। আমরা নই।
অতএব, আমরা না-এর ভিতর দিয়েই টেব্‌ল বুঝব : টেবিল চেয়ার নয়, পেন নয়, মানুষ নয়। এইভাবে টেবিল, চেয়ার, পেন এবং পেনহাতে মানুষটি এবং তাদের সকলকে ঘিরে যে শূন্যতা (স্পেস), এক সামগ্রিকতা তৈরি করে। এই সামগ্রিকতার অংশ হিসেবেই টেবিল, চেয়ার এবং কলম তাদের অর্থ বহন করে।
এসব কিছুই নতুন নয়। হেগেল বলেছিলেন, মার্কসও। শুধু সামগ্রিকতা যে সবসময়েই ভঙ্গুর তাঁরা মানেন নি।
আমাদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সামগ্রিকতা নেই। (আকাশের নিচে আমাদের ঘর)। তাই টেবিল, চেয়ার, কলম সবকিছুই আমাদের জন্য অনুষঙ্গ ভেদে ভিন্ন অর্থ নিয়ে আসে। (লেখকের হাতে কলম এবং একজিকিউটিভ বা বানরের হাতের কলম কি এক ?) আবার টেবিল উল্টে যায় ; অনিবার্যভাবে সামগ্রিকতার পরিবর্তন ঘটে। ডিকনস্ট্রাকশনের প্রথম ধাপ হল এই টেবিল ওলটানো। অতএব,
এক : টেবিল ওলটাও (ইনভার্সান)। প্রতিটি গ্রন্থেই কয়েকটি সংবেদনশীল শব্দ / বাক্য থাকে। তাদের অর্থ উল্টে দাও। যেমন আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতেই দেবতাকে উল্টে দানব করেছিলাম। আর সবকিছুই তখন কেমন পাল্টে গেল (ডিসপ্লেসড হল।)
দুই : সবসময়ে এইরকম টেবিল ওলটানোর দরকার নেই। একটি গ্রন্থকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাও এবং তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন (ইন্টারোগেট) করতে থাক, তারই অনুষঙ্গের ভেতর থেকে, প্রাথমিক শর্তগুলো মেনে নিয়ে। তখন দেখা যাবে গ্রন্থকার একজন খুনী ; অনেক সম্ভাবনাকে খুন করেই গ্রন্থকার তাঁর ভাবনাগুলোকে একটি বই-এর আকার দিতে পেরেছেন। খুনী যেমন চিহ্ন রেখে যায়, গ্রন্থটির লেখকও তাঁর হত্যাকাণ্ডের সংকেত রাখেন। ইন্টারোগেশনের সামনে পড়ে লেখক পিছু হঠতে থাকেন, তখন তিনি এক খাদের কিনারে, তারপর তিনি একসময় টুপ করে খাদের ভিতর পড়ে যান, শুধু বাতাসে বইটির পাতাগুলো উড়তে থাকে, জড়ো হয়, আবছা হয়ে আসে, অন্য শব্দের জন্ম হয়, অন্য গ্রন্থ। এমনিভাবেই মার্কস হেগেলকে নিয়ে গিয়েছিলেন খাদের কিনারে, তাঁর ক্যাপিটালের প্রথম অধ্যায়ে। ভালমানুষ আলথুসার বোঝেন নি।

পাঁচ

আমার নাম অজিত চৌধুরী, কম কথায় এ সি। আমি তোমাদের হিস্ট্রি অফ ইকনমিক

থট পড়াব।

বিষয়টি পড়তে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে : হিস্ট্রি অফ ইকনমিক থট হল সোনার পাথরবাটি। ইতিহাস নেই, অর্থনীতিও নেই। অতএব, আমি তোমাদের হোৎকা টেক্সট বুক লেখক শুম্পিটারের মতো প্লেটো থেকে বর্তমানে আসব না। আমরা বর্তমান থেকে মার্কস→ রিকার্ডো, স্মিথ→ ফিজিওক্র্যাট কেনে এবং ইংল্যান্ডের পেটি→ মার্কেন্টাইলিজম এই চেইন অনুসরণ করব। অথবা আমরা যে কোনো জায়গা থেকেই শুরু করতে পারি। সবকিছুই আছে। বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রাক স্মিথ অর্থনীতিবিদ পেটি থেকে শুরু করতে পারি। পেটির লেখা গ্রন্থ লাইব্রেরিতে নেই এটি একটি বাজে কথা। আছে। স্মিথের ওয়েলথ অফ নেশনের ভেতরেই আছে পেটির গ্রন্থটি। অতএব, তোমাদের প্রথম কাজ হবে স্মিথ থেকে শুরু করা। স্মিথ পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ভদ্রলোক ছিলেন খুনী। তিনি পেটিকে খুন করে পিতা হয়ে বসে আছেন। কিন্তু তিনি যত বুদ্ধিমানই হোন না কেন খুনের চিহ্নগুলো সব কিন্তু তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি। আমরা এই খুনের চিহ্নগুলো শনাক্ত করে পেটির গ্রন্থটি উদ্ধার করব। তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে পেটিই আমাদের পিতা : পেটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদে ইংল্যান্ডের বিবর্তনের সময়ের হত্যাকাণ্ডগুলির বর্ণনা করেন তাঁর গ্রন্থে। যেহেতু পেটি ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের দর্শক এবং সাক্ষী, মাফিয়া নেতা স্মিথ তাঁকে খুন করেন। (খুনী স্মিথকে চিনে নাও)।

অতএব, পেটিই হলেন আমাদের পিতা। আমরাও আজ এই হত্যাকাণ্ডের নীরব সাক্ষী। (ভারতবর্ষ রেসের মাঠ মৎসুদ্দি বেণের)। অতএব, আমরা পেটিকে পিতা করব। মিছে কথা বলে লাভ নেই— আমরা বাস্টার্ড, আমাদের পিতা নেই। অতএব, সামাজিকতার জন্য কোনো এক পিতার জন্ম দেব। পুত্রই পিতার জনক।

অতএব, দেখ, বেশি রেফারেন্স পড়বার দরকার নেই। যে কোনো একটি বই পড়লেই চলবে। কেননা একটি গ্রন্থের ভেতরেই আছে সকল গ্রন্থগুলি। বেশি রেফারেন্স পড়ে বোকারা। কেন বেশি পড়বে ? দেখ, বাইরে সকাল, মিষ্টি শীতকালের রোদ, সাইবেরিয়া থেকে পাখিরা ফিরে আসছে আমাদের এই প্রাচীন জলাভূমিতে, কি হবে লাইব্রেরিতে গিয়ে।

অতএব, একটি বই-ই পড়। স্মিথের ভেতরেই তোমরা পাবে মার্কসকে। তারপর ক্যাপিটাল গ্রন্থটি নিজেই লেখ। এতে একটি সুবিধা আছে : মার্কসকে কেউ অবসোলিট বলতে পারবে না। আর যদি গোড়া থেকেই শুরু করতে চাও তো বেদ থেকে শুরু করতে পার। ঋগ্বেদ হল ইকনমিক অ্যানথ্রপলজির প্রথম টেক্সট। আমার Sa(va)ge Mind গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। দেখ সাহেবদের বজ্জাতি, লেভি স্ত্রাউস Savage Mind লিখেছেন : Sa(va)ge ছেড়ে Savage, ফরাসি মদ ছেড়ে ধেনো। ভাল করে Sage-দের লেখাগুলো পড়। Savage-রা কোন

চূড়োয় উঠতে পারে বুঝবি। দেখ তো, ঘণ্টা বেজে গেল। আমি বরাবর দেখেছি ক্লাসটা শুরু করতে না করতেই ঘণ্টা বেজে যায়।

ছয়

অতএব, লেখক নেই, গ্রন্থও নেই। বই লেখার দিন শেষ হল।
সুতরাং আর লেখক বলে কেউ রইল না। দি অথর ইজ ডেড। 'আমি লিখি' ভাবাটা আদপে হল এক গ্রাম্যতা। যেমন চাষি ভাবে ফসলটি সেই তৈরি করেছে ; চাষি বীজ বুনেছে, ফসল কেটেছে, এইবার চাষি-বৌ পাখা দিয়ে তাকে হাওয়া করবে। এটা ছেলেমানুষী।
গ্রামের তাঁতি ঠিক এরকম ভাবে না ; সে জানে যে তুলোটা তাকে চাষিই দিয়েছে। তবে তুলো থেকে কাপড়—এটা সে, একটি তাঁতি, করেছে। এটা হল পরিশীলিত গ্রাম্যতা।
আসলে লেখক লেখেন না ; একটা লেখা লেখকের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয় মাত্র। প্রতিসরিত, অর্থাৎ প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত নয়। যেমন আমার এই কথাগুলো প্রতিসরিত হয়ে পড়ছে তোমার চোখে, মুখে, তোমার মুখের মাংস ও চামড়ার রঙ বদলে যাচ্ছে, যেন দিনশেষের শেষ আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, অথবা ঊষাকালে ফুল তুলছ তুমি। (কেন রোজ ফুল তুলতে যাও, তুমি ?)
আমি যে চিঠি লিখি তোমাকে তার মানে আমি জানি না। আমার জাগরণ কাটে এক স্বপ্নের সন্ধানে। রাতে কি যেন এক স্বপ্ন দেখেছিলাম : গোয়ালঘরের দরজা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন চলে গেল, তুমি বললে 'উই, দেখ উড়োজাহাজ', আরও কি সব বলছিলে যেন তুমি, আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আমার স্বপ্নটিকে লিপিবদ্ধ করি। এ স্বপ্নের মানে কি ছাই, আমি জানি ? তুমি যেমন খুশি মানে করে নাও।
তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলব না। স্বপ্নটিকে লিখতে গিয়ে এদিক ওদিক থেকে চুরি করতে শুরু করলাম আমি। চুরি করতে গিয়ে দেখি, কি আশ্চর্য। ওগুলো তো সবই একসময় আমার ছিল। কোনটা যে আমার, কোনটা যে ওদের আমার গোল বেঁধে গেল। আমি সবকিছুই তোমাকে পাঠালাম। তুমি বুঝে নাও।
এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ আমার সব চিঠি আসলে একটাই চিঠি। আসলে দুটো চিঠি লিখবার ক্ষমতা আমার নেই। অথবা দ্বিতীয় চিঠি কি লেখা হয়েছে, আজও ? কে যেন, কবে, একটা, চিঠি লিখেছিল ? পোস্টম্যান ঝোলাকাঁধে ঘুরে বেড়ায় শুধু এক প্রাচীন চিঠি নিয়ে, দ্বার থেকে দ্বারে। বলতে আপত্তি নেই যে কায়দাটি আমি চুরি করি বাঙলার দ্বিতীয় পোস্ট মডার্নিস্ট কবি উৎপল বসুর কাছ থেকে।
'নিরক্ষর বেশ্যাদের জন্য চিঠি লিখে যাচ্ছি।'

দিনশেষে একবার যাব তোমার ঘরে, একটুক্ষণ বসতে দিও, তোমার ঘরের ধুলো না আনলে যে আমার পুজো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সাত

সোজা কথা সোজাভাবে বলাই ভাল : সাহিত্য (উপন্যাস / গল্প / কবিতা) বলে কিছু নেই। যেমন ইতিহাস নেই, সাহিত্যও নেই। ঐতিহাসিকরা যে মাথামোটা একথা আজ পৃথিবীর সর্বপ্রান্তেই স্বীকৃত। সাহিত্যিকেরা কিন্তু এখনও কিছু সম্ভ্রম (নোবেল প্রাইজ, পরস্ত্রী প্রেম) পান।

সাহিত্যিকেরা মানুষের মনের গভীর আনাচ-কানাচগুলোর খোঁজ জানেন, এটা স্রেফ একটা গুজব ; এ কাজটা প্রফেশনাল সাইকোঅ্যানালিস্ট অনেক ভাল পারেন। আর সমাজ ব্যাপারটা সাহিত্যিকের চেয়ে সমাজবিজ্ঞানী ভাল জানবেন এটাই তো স্বাভাবিক। বস্তুত সাহিত্যিকের কারবার শব্দ নিয়ে। শব্দ, শব্দানুভূতি এবং তারই অবজেক্ট হিসেবে আসে সমাজ, মরুভূমি, ফুল, মানুষ-মানুষী।

একটি বই-এর সঙ্গে এক বৃদ্ধের প্রেম, এই নিয়ে কি কোনও উপন্যাস লেখা যেতে পারে ? বৃদ্ধ বইটি পড়ছেন, বুঝছেন, নোট করছেন, সমান্তরালভাবে কতগুলো কথা আসছে তাঁর মনে, কিছু অনুভূতি, বন্ধুরা বুঝছে না, ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বৃদ্ধের মনে পড়ছে তাঁর ছেলেবেলার প্রেমের কথা, একজিসটেনসিয়ালিজম নিয়ে অতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল সে, গালে হাত দিয়ে শুনেছিল তনুকা, তনুকা এখন নিউইয়র্কে, বৃদ্ধের খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব ইচ্ছে করছে তার মনের কথা বলার, এমন সময় বালক ছেলেটি ছুটতে ছুটতে এল, বৃদ্ধের চোখ চকচক করে উঠল, আবার যাবে সে সমুদ্রে, মাছ ধরতে, আর সবকিছুর শেষে এক শূন্য আর এক উজ্জ্বল সোনালি সিংহ এই নিয়েই তো হেমিংওয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, লিখেছিলেন না ?

বিশ শতকের শেষে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীজুড়ে সীমানার অদলবদল হচ্ছে : বার্লিনের দেয়াল ভেঙে পড়ল, দেয়াল উঠল প্রাচীন রাশিয়ার রাজ্যগুলিতে। তেমনি করেই দেওয়াল ভেঙে পড়ছে সাহিত্য, দর্শন, সমালোচনা, এবং সমাজ বিজ্ঞানের। সমালোচক এবং সাহিত্যিকের মাঝ বরাবর কি কোনও লাইন টানা যায় ? আমি যখন মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থের সমালোচনা করি, তখন তো আসলে আমি আর একটা দাস ক্যাপিটালই লিখি। লিখি না ? তাহলে আমি কি ? লেখক না সমালোচক ?

আবার এই কাজ করাকালীন তো মাস্তানেরা আমাকে লাঠি নিয়ে মারতে আসে, আমি আহত হই, আমার চোখের কোণ দিয়ে রক্ত পড়ে (রক্ত না জল ?) চারপাশে পড়ে থাকে আমার পকেটের খুচরো পয়সাগুলো আর দুঃখ, সেই দুঃখ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, আমার লেখায়। তখন আমি কে ? সমাজবিজ্ঞানী কি ?

ন্যাশনালিজমের দিন শেষ হল, এখন মালটিন্যাশনালের দিন। এক প্রাচীন দৈত্য এসে

ভেঙে ফেলছে সব, আমাদের ঘরবাড়ি, অসূর্যম্পশ্যার আবরু গেল, রাইট অফ ফার্স্ট নাইট, আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন বিশৃংখল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে …কি হবে আর দেওয়াল তুলে, সাহিত্যিক ?
অতএব, এখন যে লেখাগুলো হবে তার লেবেল আমি জানি না। (তুমি সাহিত্য করছ না, আবার সমাজবিজ্ঞানও লিখছ না, তাহলে তুমি কি করছ ?) এক আদিম স্যাভেজ আমি, বিকোলার, ম্যাজিসিয়ান, চারপাশের কাঠ, খড় যা কিছু পাই সবকিছু মিলিয়ে একটা কিছু খাড়া করে দিই আমি, মাঝখানের শূন্যগুলো জুড়ে থাকে ছেঁড়া ছেঁড়া উপকথা, তার মানে আমি জানি না, তোমরা যেমন খুশি মানে কর অর্থাৎ আর একটা কিছু দাঁড় করাও। এইভাবে লেখার কিছু সুবিধা আছে। যেমন লেখাটিতে যখন ইমোশানের মাত্রা চড়ে যাচ্ছে অর্থাং লেখাটি প্যানপেনে হয়ে যাচ্ছে তখন কয়েকটি প্যারাগ্রাফ দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মাঝখানে রিলিফ হিসাবে প্রিয় নারীর সঙ্গে হেলিকপ্টার ভ্রমণের বর্ণনা রাখা যায়। ফলত ভাষাও একটি আলাদা মাত্রা পাবে। সাহিত্যিকদের ওয়ান ডাইমেনশনাল ভাষার বদলে নানা বিষয়ের সংযোগে ভাষায় অতি সহজ এবং সাবলীল এক ওঠানামা আসবে। এইভাবে আমরা একই স্পেসে সমুদ্র, অরণ্য এবং পাহাড় নিয়ে আসতে পারি। এইভাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের ভাষার দেওয়ালগুলো ভেঙে দেব। তখন দেখা যাবে যে বাঙলা, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষার সীমারেখাগুলি সরে গেল। আমার লেখা খুব সহজেই স্প্যানিশে অনূদিত হয়ে গেল, ল্যাটিন আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা আমার লেখা পড়ছে।
আমাকে একটি ভাষা দাও যা নেশন ভাঙতে পারে।

আট

পোস্ট মডার্নিজমের মূল প্রতিপাদ্য হল :
এক, ঈশ্বর নেই। অতএব নেশন নেই পার্টি নেই ফ্যামিলি নেই। না-ই সত্য। আর সব কিছু মিথ্যে।
দুই, আবার যা মিথ্যে তা অসত্য নয়। মিথ্যে একটি তাত্ত্বিক ক্যাটিগরি। মিথ্যে হল যে শূন্যের পর তৈরি ঘর, তাসের। উজ্জ্বল হরতন ইস্কাপন রুহিতনের সাহেব বিবি গোলামেরা ঘুরে বেড়ায়। একটু ফুঁ দাও, ওদের ঘর ভেঙে পড়বে। এই ফুঁ দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে ইন্টারোগেশন।
তিন, তখন তুমি এই তাসগুলি দিয়ে আর একটি ঘর করতে পার যার নাম ডিকনস্ট্রাকশন। এর জন্য আগের ঘরটিকে সম্পূর্ণ ভাঙার দরকার নেই। কয়েকটি সংবেদনশীল অংশকে ভাঙলেই

নয়

নেশন নেই রাজা নেই ঈশ্বর নেই, ভেঙে পড়ছে জব চার্নকের কলকাতা, গঙ্গার বুক দিয়ে বয়ে যায় গলিত অ্যাসিড, টিন, শব, টেকচাঁদ, বেশ্যাদের রাত, রবীন্দ্রনাথ। আমি কপিল সাংখ্যকার : একবার চোখ মেলে তাকালাম, সম্রাট সগরের সন্তানেরা ভস্ম হল। সেই থেকেই তো সাগর মেলার শুরু। সাগর মেলা আজও চলে, দেখ। এশিরিয়া ধুলো আজ, ব্যাবিলন ছাই হয়ে গেছে।

আমার মনে পড়ছে সব, আমি জাতিস্মর। সপ্তদশ অশ্বারোহী যখন এই বঙ্গভূমি আক্রমণ করে, তখন তাঁদের দু-হাত তুলে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল যে বৌদ্ধ ভিক্ষুক, সে তো আমিই। আবার সিরাজের কবর খুঁড়তে খুঁড়তে হো হো করে হেসে উঠেছিল যে ডোমটি সেও তো আমি। আজ আর একবার আমাকে বল্লাল সেনের সন্তানসন্ততিদের শেষ কৃত্য করতে দাও।

সত্তরের রাগী যুবকেরা বেঙ্গল রেনেশাঁসে দেশজ কিছুই দেখতে পান নি, এটা দুঃখজনক, সরলীকরণ। বেঙ্গল রেনেশাঁসের প্রায় সবটাই দেশজ, ইংরেজ নিমিত্ত অর্থাৎ মাধ্যম মাত্র। ইংরেজের হাত ধরে বল্লাল সেনের সন্তানসন্ততিরা ক্ষমতায় ফিরে এল। পাশ্চাত্য দর্শনের ডিজেনারেশনের শুরু সক্রেটিস থেকে, প্রাচ্যে ন্যায়শাস্ত্রে। ইংরেজ সহজ এবং সাবলীল-ভাবে এই দুই অবক্ষয়কে মেলাল। ফল : বেঙ্গল রেনেশাঁস। ভাটপাড়ার নৈয়ায়িক হলেন সাহিত্যসম্রাট। সেই থেকে অফিসিয়াল সাহিত্যের জায়গীরদারি মোটামুটিভাবে ভাটপাড়াতেই আছে। মাঝখানে রবিঠাকুর, কেমনভাবে জানি না, একটু নিমাইভক্ত হয়ে পড়লেন এবং ফলত পেলেন নোবেল প্রাইজ। তাও তো তিনি গদাই থেকে কিছুই চুরি

চলবে।

চার, সকল ঘরই যখন মিথ্যে ; একটি বই-ও অনিবার্যভাবে একটি মিথ্যে। বই-বলে কিছু নেই। অতএব লেখক বলেও কিছু নেই।

পাঁচ, অতএব ঈশ্বরও মিথ্যে। ঈশ্বর অর্থাৎ যে কোনো ধরনের আদর্শ : সাম্য, স্বাধীনতা, প্রেম, সোস্যালিজম।

ছয়, অর্থাৎ পোস্ট মডার্নিজম হল দৈত্যরাজের দর্শন। দৈত্য অর্থাৎ ক্ষমতা। অতএব, দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হল ক্ষমতা বিষয়ক প্রতিপাদ্যগুলি।

সাত, দৈত্যরাজ ঈশ্বরকে নির্বাসিত করে খুদে দেবদেবীদের মুক্ত করে দিল। বলা হল যে যার ব্যক্তিগত দেবদেবীদের পুজো

করেন নি। মডার্নিজমের দিন শেষ, অতএব অনিবার্যভাবে খসে পড়ছে জব চার্নকের কলকাতার ইঁট, খড়, নথিপত্র, মিউজিয়াম, মমি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, হিজড়েদের গান, বালিগঞ্জ, ব্রাহ্ম, সি পি আই, কলকাতার সুমহান ঐতিহ্য। শুধু পৌরাণিক কলকাতার ডাকাতে কালী জিভ বের করে হাসছেন, তাঁর সন্তান আমরা, শৃঙ্খল ছাড়া আমাদের আর কিছুই হারাবার নেই।

অতএব, বল্লাল সেনের কলকাতার অবিচুয়ারি লেখা শুরু হোক। আলোচনার সূত্রপাত অবশ্যই অধ্যাপক সরোজ দত্তের লেখা পত্র থেকে— আমার সকল আইডিয়াই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। শশাঙ্ক : এই নামটি আমার চোখের সামনে এক তেপান্তরের মাঠ খুলে দেয়। মূর্তি ভাঙার আর কোনো প্রয়োজন নেই, মূর্তিগুলোকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাও, ইন্টারোগেট কর, মূর্তিগুলো পিছু হঠতে থাকবে, তারপর এক সময় খাদের ভিতর পড়বে টুপটাপ : রক্তপাতহীন কালচারাল রেভল্যুশন। আসলে এদের দিন শেষ। অতিব্যবহৃত গণিকারা মাস্তানের মতো মাফিয়াসর্দার এইবার এদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে স্বয়ং, নিজহস্তে, গর্তে। অর্থাং এইবার মূর্তি আক্রমণ করলে পুরস্কার পাওয়া যাবে, নিউইয়র্ক থেকে কনফারেন্সের চিঠি আসবে, আর তখন ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার প্রাচীন বঙ্গজ মুৎসুদ্দিরা কি চেঁচাতে সাহস পাবে, কেননা তখন তো নব্য মুৎসুদ্দিরা এসে গেছে, এক মুৎসুদ্দিপনা থেকে আর এক মুৎসুদ্দিপনা—এই হল অ্যাকাডেমিক সোস্যাল সাইন্স।

আসল কথা : কলোনিয়াল পাওয়ার কিভাবে কাজ করে? কিভাবে তাঁর মতাদর্শগত প্রভুত্ব স্থাপিত হয়? মতাদর্শগত প্রভুত্ব স্থাপনে এজেন্ট বা কোলাবোরেটর কারা?

করতে পারে। এইভাবে দৈত্যরাজ তার মতাদর্শগত প্রভুত্ব স্থাপন করে। সহজ কথায় : পোস্ট মডার্নিজম বলে যে মানুষ নানা-রকমভাবে বাঁচতে পারে ; ইউরোপই একমাত্র মডেল নয়।

আট, ফলত অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে মাল্টিন্যাশনালগুলির এক নতুন সেতু তৈরি হল। মডার্নিজম নেটিভদের বুঝত না। পোস্ট মডার্নিজম নেটিভের অর্থ সৃষ্টি করল— নেটিভকে তার মতো ভাবে বুঝল। অতএব, পোস্ট মডার্নিজম কোনো এক ফ্যাশন নয়, এটা থাকবে বেশ কিছুদিন, দৈত্যরাজের দর্শন হয়ে।

অবশেষে, বিংশ দশকের শেষে এসে ঈশ্বরের মৃত্যু হল। ঈশ্বর, অবশ্যই, মানুষের শত্রু ছিল। কিন্তু ঈশ্বরকে হত্যা মানুষ করে নি, করেছে দৈত্যরাজ,— মানুষের আর এক শত্রু। কিন্তু ঈশ্বরের

কলোনিয়াল মাইন্ডের স্পেসিফিসিটি কি ? অর্থাৎ এটি একটি তাত্ত্বিক রিসার্চ প্রজেক্ট। পোস্ট মডার্নিজম একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দেবে ; বেঙ্গল রেনেশাঁস এই তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগের এক অতি উর্বর ক্ষেত্র। তখন দেখা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরা দাসত্বের যে উজ্জ্বল কাঠামো তৈরি করেছিল তার একটি আন্তর্জাতিক অর্থাৎ আমেরিকান মার্কেট আছে এবং এই মার্কেটের সাহায্যে বাঙালি একুশ শতাব্দীতে আর একটি নবজাগরণ ঘটাতে পারে। বাঙলা তার লোহা, কয়লা, তেল এবং এই লিপিবদ্ধ দাসত্বের কালচার বা ডিসকোর্সের সাহায্যে বিশ্বের দরবারে একটি স্থানও পাবে। এইভাবে তৈরি হবে একঝাঁক নতুন পম্পাস ভৃত্য : প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, অংক জানে কম্পিউটার জানে ইংরেজি জানে ফরাসি জানে উজ্জ্বল ছেলেরা ঘুরে বেড়ায় নগরীর রাজপথে, তাঁদের জন্য কাজ নেই, কাজ নেই তাই প্রেম নেই, অতএব ড্রাগ আছে নিষিদ্ধ যৌনবিহার আছে, অথচ বিপ্লব নেই, বিপ্লব তা শেষ হয়ে গেছে কবে, মার্কসকে আমরা খুন করেছি, মার্কস দীর্ঘজীবী হোক। এইখানে কোন্ স্বাধীন গোচারণ ক্ষেত্র তুমি তৈরি করবে, লেখক ? এখনই তো সময় তুমি তোমার নির্বাচিত কমরেডদের নিয়ে অ্যাবস্কন্ড করবে। গুপ্ত গহ্বর তৈরি কর, হারি আপ, কেননা কিছুক্ষণ বাদেই তো নগরীর উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠবে কলকাতায় আর লোডশেডিং নেই কলকাতা এখন কল্লোলিনী তিলোত্তমা এ কোন বেশ্যার সাজে সেজেছ কলকাতা চতুর্দিকে দালাল এবং পিম্প পরিবেষ্টিত আলোগুলো জ্বলে উঠেছে মহানগরীর পথ দিয়ে চলে দৈত্যরাজের রথ এখানে যে কোনো অ্যাকশান মানেই তো দৈত্যরাজকে হেইল করা। দৈত্যরাজ দীর্ঘজীবী হোক, আমি

মৃত্যু নিয়ে মরাকান্না আমি তুলি না। জন্ম হলে, মৃত্যু হবে। ঈশ্বরের জন্ম হয়েছিল, তাই মৃত্যু হল। দৈত্যরাজের সঙ্গে লড়তে হবে। মারতে না পারি, সামাল তো দিতে পারব। আপাতত লড়াই হবে দৈত্যরাজের অস্ত্র নিয়ে অর্থাৎ পোস্ট মডার্নিস্টদের ক্যাটিগরির সাহায্যে। এইসব ফুকো, ডেরিডাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাও, ইন্টারোগেট কর, দেখবে ওরা কেমন বাজে বকতে শুরু করেছে। কিন্তু আপাতত এসব কাজ না করাই ভাল। ফুকো ডেরিডার নাম করলেই ঈশ্বরভক্তরা মারতে আসবে। আবার ওরাও তো আমাকে খুব আদর করবে না। অতএব, চুপ কর, চুপ, যতদিন না ঈশ্বর নিয়ে মরাকান্না একটু থিতোয়।

পোস্ট মডার্নিজমকে হেইল করছি।
দেখ, আমি কেমন সাবলীলভাবে দৈত্যরাজকে হেইল করছি, যেমন করেছিলাম সপ্তদশ অশ্বারোহী বা ক্লাইভকে। আমার ঈশ্বর নেই অতএব দেশ নেই স্বাধীনতা নেই, পরাধীনতা নেই, আমার খালি গা, পা পথিকের, টাইম এবং স্পেস অতিক্রম করে আমি হেঁটে চলেছি। দস্যুরা যখন গোচারণ ক্ষেত্র আক্রমণ করেছিল কে লড়াই করেছিল, সে তো আমিই, কে প্রথম আবিষ্কার করে আগুন বা বর্ণমালা, আমি শূন্য, কে তোমরা আমাকে বাঁধবে ? তোমাদের ক্যাটিগরি দিয়ে আমাকে ধরতে যেও না, দেখ চাঁদ উঠেছে, পূর্ণ চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে আমাদের প্রাচীন পৃথিবী। আজ বুদ্ধপূর্ণিমা।

দশ

আসলে আমার লেখার কোনো মানে হয় না। কে আমি যে লিখব আর তোমরা আমার লেখা পড়বে ? লেখার নিজস্ব জোরের জায়গা থেকেই একটা লেখা পাঠক পায় এটি একটি অতি প্রাচীন বাজে কথা। আমি বড় ঘরের ছেলে নই, আবার সন্ন্যাসীও নই, মদ খাই না, গাঁজা খাই না, আমার ভৈরবী নেই, বন্দুক নেই, শুধু কলম আছে, তোমরা কেন আমার কথা শুনবে ? আমি ব্রুনোর মতো বোকা নই, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে জেনেছি তো এখানেই শেষ, বলতে গেলে লোকে মারতে আসবে, ওসব কথা লোকে গ্যালিলিও-র কাছ থেকে শুনতে চায়, আমার কাছ থেকে নয়। এই তো সেদিন বিশ্বম্ভর কি মারটাই না খেল : রাজা যাচ্ছিল রাজপথ দিয়ে, ও বলে উঠল রাজা ন্যাংটো, লোকজন কি মারটাই না মারল, রাজার সেপাই মারলে তো ভাল ছিল, বিশু বীর হয়ে কলেজে ফিরত, শ্যামশ্রীর কোলে মাথা রেখে শুত। তো, মারল বিশুর বন্ধু-বান্ধব। কি, এমন কথা ! ওরা সবাই দেখছে রাজার পরনে রেশমী কাপড়, আর বিশু বলে কিনা— ওদের ভারি অপমান লেগেছিল, শ্যামশ্রীতো বললই, বিশুদা, এটি তুমি ভাল কাজ কর নি। বেচারা বিশু। মার খেল, বন্ধুদের হারাল, প্রেমিকাও চলে গেল। (নারীকেও নিয়ে যায়।) শহীদ হবার দিন চলে গেছে— ব্রুনো তবু শহীদ হতে পেরেছিল। এসব হল রাম রাজত্ব : নীচু জাতের শম্বুক নিজের মতো পড়াশুনো করছিল, উচ্চবর্ণের সইবে কি করে, তাই প্রচার করা হল যে শম্বুক নাকি শিশুদের সঙ্গে যৌনক্রীড়া করে আর রাম এসে ঘ্যাঁচাৎ করে শম্বুকের গলাটা কেটে দিলেন আর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।
এইসব জানার পর আমি বন্ধুদের আর কিছুই বলি না। প্রিয় গাছ, তুমি নগরীর যুবকদের বলে দিও, রাজার দুটি শিং আছে। □

অরুণরতন বসু

কারুবাসনা ও জীবনানন্দর গদ্য

'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে···কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভ'রে দিয়েছে ছাই কালি ধূলির শূন্যতায়। যে উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসংকোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটরকার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে (সেই) আকাঙ্ক্ষা—উদ্যম নেই আমার' (কারুবাসনা)।

এই হচ্ছে বাঙলাসাহিত্যের প্রথম আধুনিক গদ্য, অথবা বলা যায় আধুনিক বাঙলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন, যা রবীন্দ্রপরবর্তী বাঙলা গদ্যকে প্রায় দু-ভাগ করে দিয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯৩৩ সালে লেখা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছিল প্রায় ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে ছাপা হয়ে বেরোনোর জন্য। এই ৫৩ বছরে মানুষ প্রায় বুড়ো হয়, অথচ দেখতে পাচ্ছি এই লেখাটি যেন ক্রমশ নবীন, ক্রমশ আরো উজ্জ্বল, গভীর ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, যেমন কবিতায়, তেমনই গদ্যে, জীবনানন্দই হচ্ছেন, বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার জনক।

উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে এইভাবে :

'আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড় ক্ষতি হয়। কয়েকদিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরোনো। ছেঁড়া-খোঁড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখেমুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে।'

এর পর বই কেনা সম্পর্কে কিছু কথা :

'গতবছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশনি করি, ট্রাম—সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা সাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম : ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর, একখানা নভেল এবং আরো দু-তিনখানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনিনি ; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়, ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেকদিন ধরে দেখিনি ; বই ক'খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি।'

এবার বলা হবে বই পড়ার কথা :

'টিনের সুটকেসে ক'রে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম, খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম, বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি : শালিখ ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে, দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।' লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে বইয়ে কী ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। শুধু কীভাবে বই পড়া হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। এরপর আসছে উইপোকার কথা :

'আমাদের এ ঘরে উইয়ের অত্যাচার বড় বেশি। মেঝেটা মাটির—বড্ড স্যাঁতসেঁতে; বর্ষাকালে উইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানারকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়, খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়েঘরে তিনি উই ছড়িয়ে দিয়ে তামাশা দেখেন। নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।'

এরপর ফের বইপড়া সম্পর্কে আরো দু-চার কথা বলি। "কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।' কল্যাণী সেলাই করছিল। কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুছতে মুছতে—'মাঝে মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব; থাকতে থাকতে তিনমাস হয়ে গেল। প্রায় একমাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।"

এইবার ঘটনা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা শুরু হল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এই মর্মান্তিক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য কোনো ঘটনার ঘনঘটা, মারপ্যাঁচ, নানান প্লট, চরিত্র-চিত্রণ এসব কিছুই নেই। কোনো গল্প নেই। আছে আন্তরিক আত্মকথন আন্তরিক কথোপকথন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কি আধুনিক উপন্যাস? আধুনিক গদ্য? এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আগেই বলেছি রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় অন্তত জীবনানন্দর কবিতা ও গদ্যচর্চা তাই করেছে। এর একভাগে রয়েছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত সাহিত্যরীতির সঙ্গে যার আত্মীয়তা নেই, যার মধ্যে কল্লোল, পরিচয় ও দেশ আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বিপুল গদ্য সাহিত্য কর্ম—যাঁদের অনাধুনিক বলা ছাড়া উপায় নেই। অন্যদিকে রয়েছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত সাহিত্যরীতির সঙ্গে যাঁদের আত্মীয়তা আছে। বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ি, কমলকুমার মজুমদার,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ। বলা যেতে পারে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক গদ্যকার এঁরাই। তুলনায় ক্ষীণকায় ও স্বল্প পরিচিত হলেও এটিই হচ্ছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্তঃশীল প্রবাহ। 'আধুনিক' ও 'অনাধুনিক' এই শব্দ দুটি নিয়ে এবার তর্ক উঠতে পারে। কাজেই প্রথমেই বলে নেয়া ভাল যে অনাধুনিক হলেই তিনি মহৎ গদ্যকার হবেন না এমন কথা নেই, কেননা শরৎচন্দ্র, মাণিকবাবু, তারাশংকর এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের স্রষ্টা নন, কিংবা আধুনিক গদ্যরীতির অনুসারী নন, কিন্তু এঁদের সাহিত্যকীর্তির মহত্ব সম্পর্কে কে সন্দেহ করবে? উল্টোদিকে 'আধুনিক' শব্দটি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থ নিয়ে এসেছে, যেখানে সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৈতন্যের এমন একটি স্তরকে ছোঁওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-প্রচার লোকশিক্ষা, ইতিহাস-চেতনা, রাজনৈতিক প্রচার এসব কিছুই নয়, যা সৃষ্টির রহস্য তথা এক কালহীন অনন্ত সত্যের গূঢ় শৃংখলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এইদিক থেকে দেখতে গেলে আধুনিক গদ্য সাহিত্য, আধুনিক কবিতার অনেক কাছাকাছি চলে আসে। স্মার্ট, ঝরঝরে, চালাক, রাগী কিংবা আক্রমণাত্মক গদ্য নয়। বরং সম্পূর্ণ উল্টোটাই হচ্ছে এই গদ্যরীতির ভাষা, আর এসবই হচ্ছে সেই মানুষের কথা, যার সামাজিক সফলতা নষ্ট হয়ে গেছে। যার 'সংসার ভরে গেছে ছাই কালি ধূলির শূন্যতায়।'

এইজন্যই আমি গোড়া থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছি। চোখের সামনে, হাতের কাছে, লেখার মধ্যে যদি তাঁর নিজের লেখার একটি নিদর্শন থাকে, তাহলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হবে প্রচলিত অনাধুনিক গদ্যের তুলনায় কোথায় জীবনানন্দর গদ্য আলাদা, কেননা জীবনানন্দর দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই, আর আধুনিক বাঙলা গদ্যের দৃষ্টান্ত তিনিই।

এইবার একটি জিনিস লক্ষ করার মতো যে, তাঁর এই উপন্যাস প্রায় ৫০ বছর বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। তাঁর বিচ্ছিন্ন কিছু গদ্যের ইতস্তত নমুনা যে আমরা আগেই হাতে পাইনি তা নয়, কিন্তু তবুও তাঁর গদ্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণই থাকত যদি না তাঁর উপন্যাসগুলি আমাদের হাতে এসে পেঁছত। মানতেই হয় যে তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি পড়ার পর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে, বাঙলা গদ্য সাহিত্য কি এই ঘটনার পর আমূলেই পাল্টে যাওয়ার কথা নয়? জীবনানন্দর পূর্ববর্তী বা এমনকি সমসাময়িক লেখকদের কথা যদি আমরা বাদ দিই, (কেননা ৮০র দশকে তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি বেরিয়েছে) যদি শুধু আমরা তাঁর পরবর্তী লেখক ও পাঠক-সম্প্রদায়ের কথা ভাবি যাঁরা তাঁর উপন্যাসের সংস্রবে এসেছেন, তাঁরা কীভাবে আবার পুরোনো পাঠাভ্যাসে ফিরে যেতে পারেন, কীভাবেই বা পুরোনো রীতিতে সাহিত্য রচনায় ফিরে যেতে পারেন তাঁরা? যেমন ধরুন কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কায়দায় এমনকি কোনো ইস্কুলের ছেলেও এখন কবিতা লেখে না, তেমন ভাবেই কি জীবনানন্দ-পূর্ব গদ্যরীতি প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে না জীবনানন্দর এই গল্প উপন্যাসগুলি বেরোনোর পর?

এবার অবশ্যই আমাদের কয়েকটি জিনিস ভাবতে হবে, দেখে নিতে হবে এই আধুনিক গদ্যরীতির চরিত্র-লক্ষণ কী অথবা এর মূল বৈশিষ্ট্য কী। এই গদ্যরীতি, মূলত বিষয়-নির্ভর নয়, অর্থাৎ অবজেকটিভ নয়, যুক্তিবিরোধী নয়; কিন্তু যুক্তিবাদী কিংবা যুক্তি-নির্ভর নয়। এটা মেনে নিলে অবশ্যই একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে, দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে আমরা 'অনাধুনিক' বলছি, তাঁর গদ্যরীতির মধ্যেই আছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত গদ্যরীতির বীজ, অর্থাৎ আধুনিক গদ্যসাহিত্যের বীজ। যদি চতুরঙ্গের গদ্যভাষার কথা কারও মনে থাকে, মনে থাকে চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, ল্যাবরেটরি কিংবা রবিবারের কথা তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। সবসময় যদি নাও হয়, অন্তত অধিকাংশ সময় আমরা লক্ষ করব, রবীন্দ্রগদ্যভাবনায় গৌণ হয়ে পড়ছে বাইরের ঘটনা, বারে বারেই আত্মার ভেতরের ঘটনাগুলিই তৈরি করছে উপন্যাসের আকার, উপন্যাসের বিষয়। কোনো 'নির্লিপ্ত' সমাজবিজ্ঞানী বা 'বৈজ্ঞানিক'-এর মতো বাইরে থেকে কোনো ঘটনাকে লক্ষ করা নয়, বরঞ্চ চৈতন্যের এক সূক্ষ্ম স্তরকে দেখে 'সমগ্র' সত্যের মূলভূমিকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা। চতুরঙ্গে শচীশের অন্তর্ভ্রমণ, তার চৈতন্যের ঝড় ও তুমুল বিক্ষেপ যদি না-থাকত, যদি থাকত শুধুই শ্রীবিলাস ও দামিনীর প্রণয় পরিণাম, তাহলে তা হতো নেহাতই মেঠো গল্প, যতই শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসকে দামিনী স্বামী হিসেবে গ্রহণ করুক না কেন। অর্থাৎ যদি কেউ মনে করেন শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ গার্হস্থ্য জীবনেই আছে প্রেমের সম্পূর্ণতা, — এরকম একটি ইঙ্গিত রবীন্দ্রসাহিত্যভাবনায় পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তিনি অবশ্যই নীতিগল্পের সুসমাচার সাহিত্যে খুঁজছেন, যা পাওয়া শক্ত। এবার আরেকটু লক্ষ করলে দেখা যাবে শচীশ-দামিনী সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব, যে ভাবনা ও জীবনযাপনের ব্যবধান রয়েছে, প্রায় তারই কাছাকাছি— অন্তত অনুরূপ না-হলেও— একটি দূরত্ব রয়েছে জীবনানন্দর তিনটি উপন্যাসের স্বামী-স্ত্রী চরিত্রে, যথাক্রমে 'মাল্যবান', 'জীবনপ্রণালী' ও 'কারুবাসনা'য়।

কারুবাসনার কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, জীবনানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন: 'সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন? তা ঠিক নয়; শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখ-সুবিধা সুব্যবস্থা চায় বই কি, কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবয়বকে [উপলব্ধি] করে আনন্দ, ও অবয়ব সম্পৃক্ত নিস্ফলতা, আবহমান কাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রয়ে গেছে।

একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখানা কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মতো স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে

অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট।... শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন অনেক নাম রয়ে গেছে যারা না-খেতে পেয়ে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায়, কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায়।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের বক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায় নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি। কোনোদিনও পারবে না।'

এরপরই লিখছেন : 'চারদিকে ছায়া জমে গেছে ; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার।'

আর এই অন্ধকার, মেঘের রাজ্য থেকে গভীর স্মৃতির অন্ধকার থেকে উঠে আসে তাঁর চিরদিনের প্রেমিকা, বনলতার মুখচ্ছবি :

'কিশোরবেলায় যে-কালো মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—··· নক্ষত্রমাখা রাত্রির কালাদিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার— প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী মেরীর মতো অপরূপ রূপ। মিষ্টি, ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্নশীতল নিরাবরণ দুখানা হাত ম্লান ঠোঁট। পৃথিবীর নবীন জীবন ও নরলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। সেই বনলতা— আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে।'

এরপর আরো কিছুকাল জুড়ে এক মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ, যার অন্তত বেশ কিছুটা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না, কেননা এখানেই গদ্য ও কবিতার সেই মিলনবিন্দু, যার আলো-আঁধারি জুড়ে বনলতার মুখচ্ছবি বারবার ভেসে ওঠে, যা আধুনিক গদ্য-রীতিরও এক দিকনির্দেশ, যেহেতু বাইরের আর্থ-সামাজিক ঘটনা নয়, আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, চৈতন্যের এক গভীর ও সূক্ষ্ম স্তরকে ছুঁয়ে যাওয়াই হচ্ছে আবহমান আধুনিকতা যা কিনা বিষয়গত বা অবজেকটিভ পদ্ধতির দ্বারা অসম্ভব।

তাহলে আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি বনলতার কাছে :

'...কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল বঁইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত

দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে মাঝপথে গেল থেমে। তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।

অনেকদিন পর আজ আবার সে এল ; মনোপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ী পরে, চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে ; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা, নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা— ।'

এই দীর্ঘ মর্মান্তিক স্মৃতিচারণার পরই শুরু হচ্ছে দীর্ঘ সংলাপ, প্রায় ১০ পাতা জুড়ে পিতা ও পুত্রের মধ্যে। তারপর আরো আরো সংলাপ কখনো স্বামী-স্ত্রী, কখনো বাবা ও বাচ্চা মেয়ে কখনো মা ও অলস বেকার কারুবাসনাতাড়িত ছেলের মধ্যে, কখনো বা মা স্তব্ধ, ছেলেই শুধু অবিরাম অনর্গল কথা বলে চলেছে আপন মনে, বলা যায় একের পর এক দীর্ঘ মনোলগ— এক অদ্ভুত, বিচিত্র ব্যাপার ! অবশ্য জীবনানন্দর অধিকাংশ উপন্যাসে সংলাপের প্রাধান্য থাকলেও তার এতটা প্রাচুর্য বড় একটা দেখা যায় না, তবু আবেগ ও যুক্তিতাড়িত সংলাপের প্রায় বিদীর্ণ হয়ে ওঠা চেহারা দেখে ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার মনে পড়া স্বাভাবিক, আরো মনে পড়া স্বাভাবিক এইজন্যই যে এইসব সংলাপ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়েই লেখক তাঁর শিল্পভাবনা, দর্শন এমনকি গল্পের নাটক বা ঘটনা একটানা প্রায় ক্লান্তিহীন বলে চলেছেন নিছকই কথা বলার মেজাজে,— আর এই সবকিছু থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই উঠে আসে, তা হল উপন্যাস কোনো বিনোদনসংখ্যার সম্ভার নয়, উপন্যাস হচ্ছে অমোঘভাবে লেখকের অন্তর্জীবনের এক পরিচয়, উন্মোচন, যা নিছক আত্মজীবনী নয়, স্বীকারোক্তি নয়, স্মৃতিচারণ নয়, অথচ যার মধ্যে এই সমস্ত উপাদানই আছে মিলে-মিশে। এবার আধুনিক গদ্যের কয়েকটি চরিত্রলক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার জন্য আগের দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন ছিল। এইসব লক্ষণগুলিকে যদি আমরা একজায়গায় জড়ো করে কাছ থেকে লক্ষ করতে চাই তাহলে দেখতে পাব :

১। এতে সাধারণভাবে ডিটেকটিভ গল্পের মতো কোনো খুনের কিনারা করার জন্য কিংবা আততায়ীকে গ্রেপ্তার করার জন্য একের পর এক সূত্র সাজিয়ে, অর্থাৎ প্লট ব্যবহার করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর তেমন তাড়া নেই।

২। এমনকি যদি কোনো খুনের গল্পও আধুনিক রীতিতে লেখা যায় (যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে) তাহলেও খুনী কে, অথবা খুনী কীভাবে ধরা পড়ল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে খুনের পেছনে কী মানসিকতা ছিল, চৈতন্যের কোন

আবহাওয়ায় মানুষ হত্যার দিকে যায়, অর্থাৎ পাপকর্মের চৈতন্যের নানান রহস্যময় স্তর, নানান ভাঁজ খুলে লেখক তারও অতীত অপর কোনো চৈতন্যের স্বরূপ সন্ধানের দিকে যান।

৩। স্মৃতিচারণ, কল্পনার বিস্তার ও প্রায় কবিতার কাছাকাছি যেতে পারে এমন আবেগ-স্পন্দন তৈরি করার জন্য এমন ভাষা ও শব্দের ব্যবহার যা সাংবাদিক শব্দ ব্যবহারের বিরোধী, অর্থাৎ যা নিছক খবর সম্প্রচার, কিংবা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভাষা নয়।

৪। সংলাপ এখানে নেহাতই কথোপকথন নয়, বরং কথোপকথনের মাঝখানে সুযোগ পেলেই, কথোপকথনের এলাকা পেরিয়ে চলে যায় অনেকটা শেকসপিরীয় নাটকের মনোলগের দিকে, যার মারফৎ ব্যক্তি তার অন্তর্জীবনের বিক্ষোভ, অনুসন্ধান, প্রকৃতি এ-সবেরই আভাস দিতে পারে অপর ব্যক্তিকে।

৫। আর এর কোনোকিছুই সম্ভব নয় যদি আমরা বিষয়গত রীতি বা অবজেকটিভ রীতি এক্ষেত্রে ব্যবহার করি। অবজেকটিভ রীতি হচ্ছে দুর্মরভাবে আধুনিকতার বিরোধী। এই সত্যটি আমরা ব্যবসায়িক গল্প-উপন্যাসের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করব। সেখানে দেখা যাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা 'গল্প' বলে যাওয়ার ধুম পড়েছে। এখানে লেখক সবসময়ই ঘটনাগুলিকে বাইরে থেকে দেখেন ও দেখান। এমনকি নিজের জীবনের ঘটনাকেও তিনি দেখেন ও দেখান বাইরে থেকে। ফলে লেখকের ভূমিকা এখানে অনেকটা সর্বশক্তিমান নিউটনীয় খ্রিস্টান ঈশ্বরের মতো, যিনি বিশ্বজগৎকে বাইরে থেকে একটি অতিকায় ঘড়ি হিসেবে দেখছেন— অর্থাৎ যিনি জগৎকে 'অবজেকটিভলি' দেখছেন। ফলে এই জগতে 'ভবিষ্যদ্বাণী' সম্ভব, এখানে পরমাণুর মতোই চেতনার অবস্থান বা ব্যক্তিমানুষের অবস্থান জানলে তার পরিণাম বলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ ও তার চেতনা এই সবকিছুই এঁদের হিসেবের খাতায় ঠিকঠাক ধরা আছে, কোনো অনিশ্চয়তার জায়গা এখানে নেই। এঁদের ভাষাও এইজন্য খুবই ঝরঝরে, 'স্মার্ট'। যেমন বিশ্বজগৎ তেমনি মানবচৈতন্যকেও এঁরা পুরোপুরি হিসেবের খাতায় ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর এ ব্যাপারে দক্ষিণ ও বামপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে তেমন কোনো ফারাক নেই।

আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই এই নিয়ন্ত্রণমূলক সাহিত্যের বিরুদ্ধে। তার মানে অবশ্য এ-ও নয় যে আধুনিক সাহিত্য চূড়ান্ত বিচারে বিষয়ীগত তথা সাবজেকটিভ ; কেননা তা যদি হত তাহলে সেন্ট অগাস্টাইন বা রুশোর মতো একের পর এক স্বীকারোক্তি লিখে গেলেই তা সাহিত্য হত, যদিও অগাস্টাইন বা রুশোর স্বীকারোক্তি যথার্থ সাহিত্য না-হলেও সাহিত্য পদবাচ্য।

এবার অবশ্য একটি অভিযোগ উঠতে পারে, যে পরমাণু এবং চেতনার আচরণকে তথা বস্তু ও চেতনাকে আমি একাকার করে দেখছি। চারপাশে অনেক সময়ই শোনা যায় যে সাহিত্যকে 'বিজ্ঞানসম্মত' হতে হবে, কিংবা সাহিত্যিককে হতে হবে বৈজ্ঞানিকের মতো

নির্লিপ্ত। বিশেষত মাণিকবাবুর সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে তো হামেশাই একথা শোনা যায়। এরকম চালু ধারণা অবশ্য এখন প্রায় বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে, কেননা 'বিজ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানসম্মত' বলতে আগে যা বোঝা যেত এখন আর তা বোঝায় না। ঊনিশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার কাঠামো অনুযায়ী অনেকেই বুঝতেন 'বিজ্ঞানসম্মত' মানে একটি কঠোর-কঠিন নিশ্চিত 'অবজেকটিভ' বা বিষয়গত পদ্ধতি, যা বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রায় নাকচ করে দিয়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ হাইজেনবার্গ একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে পরমাণুর জগতে নিশ্চয়তা নেই, সেখানে কাজ করছে 'অনিশ্চয়তা বিধি' (বা principle of uncertainty) যার ফলে পর্যবেক্ষণ না-করা পর্যন্ত বলা যাবে না পরমাণু আছে না নেই। পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত পরমাণু থাকছে একটি সম্ভাবনার তরঙ্গের মধ্যে (probability wave) এবং তার অবস্থান জানলে আমরা বলতে পারব না তার ভর বা গতিবেগ কী, তার ভর বা গতিবেগ জানলে আমরা বলতে পারব না তার অবস্থান কোথায়, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে পরমাণুর জগতে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়, এবং তার থাকা না-থাকা নির্ভর করছে পর্যবেক্ষক বা দ্রষ্টার উপর। পরমাণুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে হাইজেনবার্গের মত : 'But then one sees that not even the quality of being (if that may be called a 'quality') belongs to what is described. It is a probability for being or a tendency for a being' অর্থাৎ বলা যেতে পারে পরমাণু হচ্ছে 'হওয়া'র সম্ভাবনা বা 'হয়ে ওঠার' ঝোঁক।

এর চেয়ে ভিন্ন মতামত হচ্ছে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদী ডেভিড বম-এর, যিনি মনে করেন বস্তুকণিকার 'বিষয়গত বাস্তবতা' আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এক বহুমাত্রাবিশিষ্ট গূঢ় শৃংখলার (implicate order) ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপ (projection)। বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রের ছবি যেমন দ্বিমাত্রিক পর্দায় এক ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার প্রক্ষেপ, বস্তুকণাও তেমনই এক বহুমাত্রিক গূঢ় বাস্তবতার ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপ, চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপ যতটা বাস্তব, বস্তুকণিকাও ততটাই। বস্তুকণিকার জগতে অনিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমরা এখনো পর্যন্ত ঐ গূঢ় বা নিহিত শৃংখলা সম্পর্কে কিছুই জানি না, হয়ত বা কোনোদিনই জানতে পারব না। এক্ষেত্রেও বিষয়গত বাস্তবতাকে পুরোপুরি মানা হচ্ছে না, আবার একেবারে নাকচ করাও হচ্ছে না।

সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এই দুটি মতই জরুরি, কেননা পরমাণু বা বস্তুকণিকার বাস্তব অস্তিত্ব থাক বা না-থাক, বিষয়গত বাস্তবতার যে একটি কঠিন নির্লিপ্ত চেহারা ছিল তা ধসে গেছে, যে মুহূর্তে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রমাণ করেছে যে এই মহাবিশ্বেরই একটি অংশ হচ্ছে মানবচৈতন্য এবং বস্তুজগৎকে আমরা দেখি বস্তুজগতের ভিতর থেকে তার অংশ হিসেবেই, আরো সহজ ভাষায় বলতে

গেলে মহাবিশ্ব হচ্ছে একটি 'সমগ্র', এবং এই সমগ্র থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। এইজন্যই অস্তিত্ববাদীরা একসময় যে ভজিয়েছিলেন মানুষকে প্রকৃতি বা বস্তুজগতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে, সেটা আর সঠিক বলে মনে হয় না। মনে হয় না কেননা মহাবিশ্বে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক হার এমনই সূক্ষ্ম হিসেবে কাজ করে চলেছে যা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলার পেছনে একটি পরিকল্পনা আছে। উল্টোদিকে মহাবিশ্ব, মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন এ কথা তখনই বলা সম্ভব যখন বস্তুজগৎ বা মহাবিশ্ব থেকে আমরা নিজেদের বা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখব। অবশ্য একসময় কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী, যেমন মনো (Monod) ভজিয়েছিলেন যে মানুষের আবির্ভাব নেহাতই দুর্ঘটনা বা 'আকস্মিক' আর এই বিশাল মহাবিশ্ব তার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন। এখন অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীই তা আর ভাবতে পারছেন না। এঁদের মধ্যে আছেন খ্যাতনামা রসায়নবিদ ইলিয়া প্রিগোজিন, যিনি লক্ষ করেছেন বস্তুর নিজের মধ্যেই আছে 'আত্মসংগঠনের ক্ষমতা' (self organizing capacity) তথা চেতন-প্রক্রিয়ার গূঢ়াভাস, যেহেতু 'আত্মসংগঠন' একটি সচেতন প্রক্রিয়া ও শুধু স্থানীয়ভাবে নয়, দূরবর্তীভাবেও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ হচ্ছে এর সরবরাহ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। মহাবিশ্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' (open system) আর এদের মধ্যেই ঘটে চলেছে নব নব রূপ ও বিন্যাসের বিবর্তন। সেইসব ব্যবস্থাকেই আমরা 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' বলব, যা ভিতরের ক্ষয় বাইরের পরিবেশে পাঠিয়ে, পরিবেশ থেকে নতুন শক্তি আহরণ করতে পারে ভিতরে। এইজন্য দরকার অবিরাম বাহির ও ভিতরের মধ্যে অবাধ সচ্ছন্দ যোগাযোগ। বন্ধ ব্যবস্থায় এটা ঘটে না, যেমন ধরা যাক থার্মো ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের ভিতর গরম জল কিছুদিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শক্তির সাম্যাবস্থার জন্য। এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু মানবশরীর বা শহর হচ্ছে উন্মুক্ত ব্যবস্থার উদাহরণ, যেখানে অবিরাম বাহির ও ভিতরের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ঘটে চলেছে। যেখানেই স্পন্দন, পরিবর্তন ও নব নব রূপের বিকাশ, সেখানেই লক্ষ করব সাম্যাবস্থা (equilibrium) থেকে দূরে চলে যাওয়া এক অস্থির চঞ্চলতা, কিংবা ওঠা-নামা (Fluctuation)। এই অস্থিরতা একটি সংকটজনক চৌকাঠ পেরুনোর পরই ঘটতে থাকে বিভাজন বা বিভাজন প্রক্রিয়া, যখন নব নব রূপের আবির্ভাব। এই নব রূপের বিকাশ অনিশ্চিত, অনিশ্চিত বলেই বিচিত্র বা বৈচিত্র্যময়, তবু তা যেন এক নিহিত বহুমাত্রিক শৃংখলার প্রক্ষেপ বা প্রতিফলন— এমন কথাও আমরা ভাবতে পারি। শিল্প-সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন এ-কথা আরো বিশেষভাবে সত্য, যদি শিল্প-সাহিত্যকে আমরা একটি 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' হিসেবে দেখি। আধুনিক সাহিত্য এইজন্যই নিছক সমাজবাস্তবতামূলক কিংবা ঐতিহাসিক সাহিত্য নয়, নিছক সামাজিক নয়, এতে সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে পর্যটনের বিবরণ থাকে। মহাবিশ্ব ও মানবচেতনা যেন এখানে একসূত্রে গাঁথা, বস্তুকণিকার অনিশ্চিত আচরণের

সঙ্গে মানবচেতনার অনিশ্চয়তাকেও তাই এখানে মেলানো যায়।

এখানে অতিপরমাণু সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবনাকে, তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না : 'যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু, সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে।'

ব্যাপারটা সত্যিই তাই, অতিপরমাণুকে 'জিনিস' বলতে সত্যিই 'মুখে বাধে' অথচ তা জিনিসও বটে। এবার লেখার ব্যাপারে আবার ফেরা যাক। তবে তার আগে অতি-পরমাণুর সঙ্গে চেতনার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের মিল নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করে নেব, যা আমাদের সাহিত্যভাবনার পক্ষে কাজে লাগতে পারে। এখানে একটি কথা বলে নেয়া দরকার। এই রচনার লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র নন, অথচ যেকোনো সাহিত্য শিক্ষার্থীর মতোই তাঁরও বস্তুর চরিত্র কিংবা বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক ব্যাপারে জানার আগ্রহ আছে আর এইজন্যই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানগুলির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ গাণিতিক ভাষ্য জানা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক ও সম্ভব, এটা যেমন ঠিক, তেমনই গাণিতিক ভাষ্য ছাড়াও বিজ্ঞানের সাধারণ সিদ্ধান্ত, অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণগুলি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাই যেহেতু সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখে থাকেন, সেইহেতু এগুলি একেবারেই সাধারণের অগম্য কিংবা অনধিকার চর্চা এমনও নয়। তবু আমার ভাবনা ও তথ্যে অসম্পূর্ণতা কিংবা ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই সে বিষয়ে যদি কেউ আমার ভুল সংশোধন করে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। এখন আগের কথায় ফের আসা যাক। আমি আগেই বলেছি অতিপরমাণুর সঙ্গে চেতনার আরেকটি বিশিষ্ট মিলের কথা। মিলটি হচ্ছে পরমাণুর মতোই চেতনাও মুহূর্তের মধ্যে স্থান ও কালগত ব্যবধান পেরিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা শুধু খুলে বলা দরকার। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত হচ্ছে দুটি কণিকার মধ্যে এমনকি আলোকবর্ষের ব্যাবধান থাকলেও তারা পরস্পরের মধ্যে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে যোগাযোগ ঘটাতে পারে। যেহেতু পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত অতি-পরমাণুর গতিপ্রকৃতি, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত অনিশ্চিত, অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে পর্যবেক্ষণের সময় কণিকাটির কাছে কোনো না কোনোভাবে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে খবর পেঁাছোচ্ছে। অথচ অপেক্ষবাদের সূত্র অনুযায়ী আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে কেউ সংকেত পাঠাতে পারে না। তাহলে ধরে নিতে হয় এই ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পর্যবেক্ষণের সময়ই কোনো স্থানীয় গূঢ় বা নিহিত নিয়ন্ত্রক থেকে। অথচ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কোনো স্থানীয় গূঢ় নিয়ন্ত্রককে বিশ্বাস করে না। তাহলে অবশ্যই মানতে হয় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অসম্পূর্ণ। এটিই ছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের অভিযোগ। এই আপত্তি অবশ্য নীলস্ বোর বা হাইজেনবার্গ মানেননি, তাঁদের মতে যেহেতু দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য অতিপরমাণু একই সমগ্রের অংশ, অতএব দুটি স্বতন্ত্র এলাকার

মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে না, হচ্ছে একই সমগ্রর দুটি অংশের মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি প্রধান তত্ত্বের এই বিরোধ দীর্ঘদিন বজায় ছিল বা আছে। [বিশিষ্ট গণিতবিদ ফন নয়মান একদা গণিতের সাহায্যেই প্রমাণ করেন যে কোনো স্থানীয় গূঢ় নিয়ন্ত্রক বা গূঢ় চলরাশির (hidden variables) অস্তিত্বই নেই।] তবু এই বিরোধ, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অনেকেই মনে করেন বিশেষ একটি বাধাস্বরূপ, বিশেষত যাঁরা আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মিলগুলিকে একত্রে গেঁথে মহাবিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে বুঝতে চান, যেহেতু তাঁদের মতে, এই রহস্যকে বুঝতে গেলে ঐ দুটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মিলন না-ঘটিয়ে কোনো উপায় নেই।

এঁদের মধ্যেই অন্যতম হচ্ছেন ডেভিড বম, যিনি ফন নয়মানের গাণিতিক প্রমাণকে নাকচ করে গাণিতিকভাবেই প্রমাণ করেন গূঢ় নিয়ন্ত্রক বা গূঢ় চলরাশির অস্তিত্ব, কিন্তু যা স্থানীয়ভাবে নয়, অস্থানিকভাবে তথা দূরবর্তীভাবে (non local) দুটি পরমাণুর মধ্যে যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বম একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : ধরা যাক, একটি জলভরা কাচের পাত্র তথা অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে কয়েকটি মাছ আছে। আর তার দুদিকে যথাক্রমে পাশে ও সামনে আছে দুটি ভিডিও ক্যামেরা। এবার অন্য একটি ঘরের দুটি টেলিভিশন পর্দায়, দুদিকের ঐ দুটি আলাদা ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি দেখলে মনে হতে পারে বুঝি একটি পর্দার ছবির সঙ্গে অন্য পর্দার ছবিটির কোনো দূরবর্তী যোগাযোগ ঘটে চলেছে কিন্তু আসলে ব্যাপার হচ্ছে ঐ একই মাছের ছবি দুদিক থেকে দুটি ভিডিও ক্যামেরায় তোলা হচ্ছে ও একটি পর্দায় একটি মাছ পাশ থেকে নড়লে, অন্য পর্দায় সেই একই মাছ সামনে থেকে নড়বে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক একটি বস্তুর দ্বিমাত্রিক চলচ্চিত্র বা প্রক্ষেপ দেখছি আমরা। দুটি কণিকাও এরকমই। এক বহুমাত্রিক নিহিত বা গূঢ় শৃঙ্খলা থেকে পাঠানো একই কণার দুই স্বতন্ত্র প্রক্ষেপ দেখে আমরা ভাবছি দুটি স্বতন্ত্র ও সুদূর বস্তুকণিকার মধ্যে যোগাযোগ ঘটছে। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তা নয়।

যদিও অধ্যাপক বম্-এর এই তত্ত্ব বিতর্ক বহির্ভূত নয়, তবু যাঁরা তাঁর তত্ত্বের বিরোধী এমনকি তাঁরাও তাঁর তত্ত্বের পেছনের গাণিতিক ভাষ্যটিকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে যাঁরাই আইনস্টাইন ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে মিলন ঘটাতে চান, যেমন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোজার পেনরোজ যিনি স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে একত্রে ব্ল্যাকহোল বা কালো গর্তের গাণিতিক সূত্র প্রদান করেন,— তাঁদের কাছে ফন নয়মান বিরোধী বম্-এর গাণিতিক ভাষ্যটি বিশেষ মূল্যবান।

একটু আগেই চেতনার স্থান ও কালগত ব্যবধান পেরুনোর যে বৈশিষ্ট্যর কথা হচ্ছিল এবার তার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। স্মৃতি, বিশেষত দূর অতীত ও দূরবর্তী স্থানের কোনো স্মৃতি যখন আমাদের মনে মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ও প্রায় এক মুহূর্তের মধ্যে মানসচক্ষুতে যখন আমরা ফেলে আসা বহু ঘটনাকে একত্রে স্মরণ করতে

পারি, তখন বস্তুকণিকার অস্থানিক যোগাযোগের (non local connection) সঙ্গে তার বেশ মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও আরেকটি ব্যাপারেও এই দুয়ের মিল আছে। তা-হল নতুন কোনো শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় যখন এক ঝলকের মধ্যে শিল্পী বা সঙ্গীতকার দেখতে পান তাঁর গোটা সৃষ্টির চেহারাকে। পেনরোজ চেতনার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অস্থানিক যোগাযোগের ঘটনাটিকে এইভাবেই ঘটতে দেখেছেন। তিনি ইয়োরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকার মোৎজার্ট ও বাখ-এর দুটি সঙ্গীত রচনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, যেখানে মোৎজার্ট ও বাখ্ মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের দুটি বিশিষ্ট সঙ্গীতের পুরো আয়তনটিকে এক মুহূর্তে একত্রে দেখতে পান। বিশিষ্ট গণিতবিদ আঁরি পোয়াঁকারের একটি গাণিতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে, এমনকি পেনরোজের নিজের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে যখন তিনি 'কালো গর্ত' বা ব্ল্যাকহোলের গাণিতিক ভাষ্যের পুরোটি লেখার আগেই তার আভাসটিকে আগেই দেখতে পান তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করার সময়। পেনরোজের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কেননা যন্ত্রমানবের কৃত্রিম বুদ্ধি আদৌ কোনো 'চেতনা' কিনা অথবা যান্ত্রিক বুদ্ধির পেছনে যে গাণিতিক ছক থাকে তা মানবিক চেতনার মূলে কাজ করে কিনা অথবা মানবিক চেতনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'যান্ত্রিক চেতনা'র আবির্ভাব কোনোদিন আদৌ সম্ভব কিনা এ বিষয়ে পেনরোজ একটি মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। পেনরোজের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু যান্ত্রিক বুদ্ধির মূলে আছে গাণিতিক ছক, (algo-rithm) কিন্তু মানবিক চেতনার মূলে তা নেই, যা আছে তা হচ্ছে স্থান-কালের অতীত এক সত্যের মুহূর্ত-উদ্ভাস, সেইহেতু কোনোদিনই মানুষের চেতনার জায়গা যান্ত্রিক বুদ্ধি নিতে পারে না। তাছাড়া মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অতিপরমাণুর স্তরে এক অবিরাম অস্থানিক যোগাযোগ ঘটে চলেছে, যার ফলে মস্তিষ্ক কোষ তথা নিউরনগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও রাসায়নিক পরিবেশেও আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে এক অবিরাম অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে চলেছে যার চরিত্র সামগ্রিকভাবে (Globally) নিয়ন্ত্রিত, যা সরলরেখায় ঘটে না, যা অনেকটা মোৎজার্ট ও বাখের শিল্পপ্রেরণায় এক মুহূর্তের সামগ্রিক উদ্ভাসের মতো।

এরপর মানবমস্তিষ্কের গঠনবিন্যাসের সঙ্গে সাহিত্যের একটি যোগাযোগও আমরা লক্ষ করতে পারি। সম্প্রতি কালে মস্তিষ্ককোষবিদ্যার (neurology) একজন বিশিষ্ট গবেষক পল ম্যাকলিন লক্ষ করেছেন মানুষের মস্তিষ্কে পরপর তিনটি স্তর আছে অথবা এ-ও বলা যায় যে বস্তুতপক্ষে, আমাদের একটি মাথার মধ্যেই আছে তিনটি মস্তিষ্ক। এর সবচেয়ে উপরেরটি হচ্ছে সবচেয়ে নতুন মস্তিষ্ক যাকে বলা হচ্ছে নিও-করটেক্স যার দৌলতে আমাদের homo sapiens বা 'প্রাজ্ঞ মানুষ' বলা হয়। এর নিচের ধাপে আছে স্তন্যপায়ী-মস্তিষ্ক ও একেবারে নিচে আছে সবচেয়ে আদিম সরীসৃপ-মস্তিষ্ক। নিও-করটেক্স হচ্ছে যুক্তি, অনুভব, শিল্পসাহিত্য, অধ্যাত্মচিন্তা, গণিত, জ্যামিতি,

বিজ্ঞান ইত্যাদির আধার, স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কে আছে তীব্র আবেগ, স্মৃতি, উন্মাদনা, ভয়, উৎকণ্ঠা, পরার্থপরতা ইত্যাদি। এই মস্তিষ্ককে Limbc-system-ও বলা হয়। এর নিচে অর্থাৎ সর্বশেষে আছে সবচেয়ে আদিম তথা সরীসৃপ-মস্তিষ্ক যাকে ম্যাকলিন বলছেন Reptile-complex বা সংক্ষেপে R-complex এতেই আছে আদিম পশুর পাশবিক ঈর্ষা, রাগ, হিংস্রতা, অবাধ যৌন পিপাসা, দমন-পীড়নের ইচ্ছা, ধর্ষকাম, রিরংসা। অর্থাৎ সোজা কথায় বিবর্তনের যে তিনটি প্রধান ধাপ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেই স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ যুগের দুটি মস্তিষ্ককে আমাদের মাথা থেকে প্রকৃতিদেবী বাদ দেননি, বরঞ্চ ঐ দুই মাথার ওপরেই সংযোজন করেছেন নব্যমস্তিষ্ক তথা নিও-করটেক্স। ফলে মানুষের চেতনায় ও কাজে যে পাশবিক প্রবৃত্তি আমরা লক্ষ করি, তার ইতিহাস জুড়ে যে বারবার নৃশংস অত্যাচার, দমন-পীড়ন, রক্তলোলুপতা, ধর্ষকাম আর হত্যাস্পৃহা লক্ষ করি, সেসবই আমাদের ঐ সরীসৃপ-মস্তিষ্কের উত্তরাধিকার। ব্যবসায়িক ফিল্ম বা সাহিত্যেরও যে দুটি প্রধান অবলম্বন আমরা দেখি, তা হল উগ্র যৌনপিপাসা ও হিংস্রতা তথা হত্যাস্পৃহা। উগ্র রাজনৈতিক সাহিত্যেরও অবলম্বন হচ্ছে হিংস্রতা তথা দমন, নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস। সাধারণ পাঠকের আদিমতম প্রবৃত্তি যা সরীসৃপ-মস্তিষ্কের অবদান তাকেই নানানভাবে উসকে দেয়া হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক সাহিত্যের লক্ষ্য। যখনই কোনো পাঠক গো-গ্রাসে হিংস্রতা, ধর্ষকাম, যৌনক্ষুধা কিংবা উপর্যুপরি যৌন কর্মকাণ্ডের বিবরণ পড়ে রোমাঞ্চিত হন, তখনই বলা যায় তিনি তাঁর সরীসৃপ-মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন, শারীরিক অবস্থার দিক থেকে দেখলে তখন তিনি এক ভয়ংকর মৃগী রোগের শিকার, যা বস্তুতপক্ষে হচ্ছে মস্তিষ্কবিবর্তনের দিক থেকে কয়েককোটি বছর পিছিয়ে যাওয়া। একটি বিশেষ মৃগী রোগ, যেমন Grand mal epilepsy-র ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সাময়িক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ (regression)। যখন নব্য-মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে চেতনা সরীসৃপ-মস্তিষ্কের দিকে পৌছিয়ে যায় সমাজ বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা আর নিছক মৃগী রোগ থাকে না, এটা হয়ে যায় ফ্যাসিবাদের মতোই এক ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি যার প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী। এবার বলা যায় গণতন্ত্রী বা সাম্যবাদী যে ব্যবস্থাই হোক না কেন, যেখানেই দেখা যাবে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে উসকে দেয়ার চেষ্টা, তথা রিরংসা, ধর্ষকাম ও হিংস্রতাকে ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা সেখানেই সরীসৃপ-মস্তিষ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে, বুঝে নিতে হবে।

অতএব আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই এর বিরুদ্ধে। এইজন্যই আধুনিক সাহিত্য, কবিতা, সংগীতধর্মী শব্দব্যঞ্জনা ও চিত্ররূপময় চিত্রকল্পের ব্যবহার, যা একটি অতীন্দ্রিয় চেতনা বা কালহীন সত্যের মূলভূমি খুঁজে দেখতে চায়, যাকে অধ্যাপক ডেভিড্ বম্-এর ভাষায় এক গূঢ় শৃংখলাও (implicate order) বলা যেতে পারে।

আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় একই ব্যাপার দেখব। দেখব এখানে সরল-

রেখায় কোনো ঘটনা ঘটে না, প্লটের পর প্লট এখানে নেই, বরঞ্চ এখানে এক মুহূর্তে স্মৃতির উদ্ভাসের মতোই গোটা রচনার বিন্যাসে আছে এক সমগ্র স্মৃতিচারণ।

তাহলে একটি ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার হতে পারছি আর তা হচ্ছে লেখক এক্ষেত্রে যেমন আত্মজীবনী লেখেন না, স্বীকারোক্তি লেখেন না, তেমনই ডাক্তারের মতো অপরের চিকিৎসা করেন না, লাশ কাটেন না টেবিলে, উকিলের মতো অন্যের মামলা লড়েন না। তাঁর ইচ্ছা বা কাজ অনেকটা জীবনানন্দর কারুবাসনার নায়কের ভাষায় বলা যায় :

'... এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।' (পৃ. ৫)

সৃষ্টির রহস্যের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের রহস্যকে এইভাবে একাত্ম করতে গিয়ে, অথবা অন্যভাবেও বলা যায় নিজের হৃদয়ের রহস্যের ভিতর সৃষ্টির রহস্যকে অনুভব করতে গিয়ে লেখক আলো অন্ধকারের পথে অন্তর্ভ্রমণ শুরু করেন। সমস্ত মানবিক সম্পর্ক, সমস্ত মানবিক ঘটনাকে ভিতর থেকে দেখতে চান তিনি, তাই ঘটনা এখানে গৌণ, ঘটনার পেছনে যে মানবিক সম্পর্কের অবিরাম ক্ষয়, প্রায় দুশ্চিকিৎস্য যে অনিশ্চয়তা রয়েছে মানবচরিত্রের তথা মানবচিত্তের গোপনে ; যে অকথ্য বিকার রয়েছে, অপচয় রয়েছে মানব-স্বভাবের গোপনে— যার হাত থেকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কোনো আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের নিস্তার নেই,— একথাই নানানভাবে ধরা পড়ে তাঁর কাছে। অবিরাম যেমন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, তেমনি অপরকে ; তেমনি অপরলোকও তাঁকে প্রশ্ন করে— আর এভাবেই চলে সংলাপের পর সংলাপ, আর এইজন্যই এই ধরনের গদ্যে থাকে সংলাপের এক বিস্ফোরণোন্মুখ প্রাচুর্য যাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যদিও এটা কোনো আদর্শ দৃষ্টান্ত নয়। এখানে কথা হচ্ছে হেম অর্থাৎ উপন্যাসের তরুণ নায়ক ও তার মার মধ্যে :

— 'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। (হেম)

— কার ? তোমার ? কেন ? (মা)

— চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সেরকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছা করে ; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না-আসি।

— ও এইরকম ? কিন্তু এতো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায় ?

— গঙ্গার একটা ঘাট।

— কোন দিকে বলোতো ?

— তুমি দেখোনি।'

... ...

— 'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা ?

— কেন সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন ?
— কিংবা খুন করে জেলে গেলে ?
— স্ত্রী সন্তান আছে। মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ ?
— জেলের বাইরে থেকেই বা কী করতে পারি ?
— বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'
মাথা নেড়ে— 'হৃদয়ে যদি বিশ্বাস থাকত, তাহলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'
— 'কী সে বিশ্বাস ?'
—'যে বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায়। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

এবার আমরা লক্ষ করব, উপরের দুটি উদ্ধৃতিতে আত্মহননের ইচ্ছা ও চূড়ান্ত বিশ্বাস-হীনতার কথা বলা হয়েছে যা বলা যেতে পারে আমাদের সময়ের একটি সাধারণ লক্ষণ। এই রচনার শুরুতেও যেখানে বই কেনার উল্লেখ আছে তার পরেই আছে উইপোকার কথা। আরেক জায়গাতেও আছে কবিতার খাতা উইপোকায় কেটে দেওয়ার উল্লেখ। কিছু পুরোনো চিঠিও গেছে উইয়ের পেটে। 'চিঠিগুলো উইয়ের পেটের ভিতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।' এই সবকিছু মিলিয়ে দেখলে মানবজীবনের অবিরাম ক্ষয়, অপচয়, ধ্বংসের দিকে তার অবিরাম এগিয়ে চলা, তার নশ্বরতার কথা যেমন মনে পড়বে, তেমনি আরেকদিকে আমরা দেখব : 'নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি ; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।' অর্থাৎ মানুষের মেধা, মনীষা ও কল্পনাশক্তি তথা সৃষ্টিশীলতা যাকে জীবনানন্দ বলবেন, 'কারুতন্ত্র' বা 'কারুবাসনা' তারও অনিবার্য উত্থান, বলা যেতে পারে তারই অমোঘ টানে, একজন অবৈধ, অস্বাভাবিক মানুষ এগিয়ে চলেন, (যিনি সামাজিক দিক থেকে সর্বৈব ব্যর্থ। ব্যর্থ কিন্তু পরাজিত নন) ইতিহাস থেকে ইতিহাসের বাইরের দিকে, কেননা ইতিহাসের বাইরেই আছে সৃষ্টির রহস্য, যা কোনোদিনই হয়ত বোঝা যাবে না, অন্তত বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নয়। আগেকার দিনে অনেকেই সবকিছু 'বিজ্ঞানসম্মত' করতে চাইতেন, তাঁদের ধারণা ছিল বিজ্ঞানই এই মহাবিশ্বের সমস্ত জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে, সৃষ্টির রহস্য উদ্ধারের চাবি, ঠিকই, বিজ্ঞান একদিন জোগাড় করে ফেলবে। এখন দেখা যাচ্ছে বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞান আগের তুলনায় অনেক বেশি বিনয়ী, এই বিজ্ঞান মানবিক জ্ঞানের সীমা স্বীকার করে, এবং মেনেও নেয় যে সৃষ্টির অনেক কিছুই আলো অন্ধকারে ঢাকা, অসীম রহস্যময়। তবু দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে, থাকা স্বাভাবিক। তবে সাহিত্য মানেই হচ্ছে সমাজসমগ্র তথা লোক-সমগ্রর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সমাজপ্রগতির মূল ধারা বা মূল ঝোঁকটিকে সাহিত্যে প্রতিফলিত, প্রতিষ্ঠিত কিংবা 'শিল্পায়িত' করে তোলা এমন ধারণাকে যদিও

এখনো কেউ কেউ মোটাভাবে আবার কেউ কেউ সূক্ষ্মভাবে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তবুও এটা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে লোকসমগ্রই শেষ কথা নয়, কেননা মানবসমাজকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তাকে সমগ্রসৃষ্টির একটি শৃঙ্খলে গাঁথা হয়ে থাকতে হবে, অন্তত আধুনিক যুগে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন তাকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে। ফলে অরণ্য-নদী-পর্বত সংরক্ষণ তার এখন জরুরি কাজ, বন্যপ্রাণী কীটপতঙ্গ পাখি ফুল যা কিনা আগেকার দিনে তথাকথিত বাস্তববাদী বা বস্তুবাদী রাজনৈতিক লেখকদের কাছে হাসিঠাট্টার খোরাক ছিল, তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই কেবলই মানবসমাজ নয়, মানুষের ঐতিহাসিক সত্তার কথা নয়, ইতিহাস নয়, তার প্রাকৃতিক সত্তার কথাও ভাবতে হচ্ছে খুব জোর দিয়ে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবনানন্দর লেখায় পাড়াগাঁর গাছগাছালি নদী পাখি রাত্রি রাত্রির আকাশের অন্ধকার আগের চেয়ে আরো ঢের অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (এরই পশ্চাৎপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও আমাদের কাছে সমানই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।)

তবু ১৯৩৩-এ লেখা এই উপন্যাস 'কারুবাসনা' পাঠ করে কেউ কেউ হতচকিত হয়ে যেতে পারেন এই ভেবে যে যখন দুনিয়াজোড়া মন্দা, জর্মানিতে নাৎসিবাদের আবির্ভাব রাশিয়ায় জবরদস্ত মার্কসবাদের জয়জয়কার, ইয়োরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপুল অস্থিরতা, সেই সময় পূর্ববাঙলার এক পাড়াগাঁর গাছগাছালির ভীড়ে অন্ধকার বর্ষার রাতে এক কাব্যবিলাসী তরুণের একা আত্মকথন ! কোনো রাজনৈতিক সংগ্রামচেতনা নেই, ইতিহাস চেতনা নেই বরঞ্চ তার পরিবর্তে আত্মহননের ইচ্ছা, আত্মবিলাপ, প্রেম আর ব্যর্থ প্রেম ! জীবনানন্দর কাছে তখনই যদি ইতিহাসের ধূসর মূর্তি আরো ধূলিধূসর হয়ে যায় তাহলে কে তাঁকে দোষ দেবে, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস ইহুদী হত্যা, রাশিয়ায় গণশ্রম শিবিরের খতম কাহিনী, ভিয়েতনামে দানবিক ও নৃশংস মার্কিনী কার্যকলাপ, বুদাপেস্তে রুশ আক্রমণ তিয়েন-আন-মেনে ছাত্রহত্যা এসব পরবর্তী কালে একের পর এক ঘটে গেল। বরঞ্চ বলা যায় যে মৌলিক মানবিক বিকার ও অপ্রেম থেকে এসব ঘটনা ঘটে, তারই দৈনন্দিন চেহারা আমরা সাদামাটা ভাবে রোজই দেখি চারপাশের সফল ও সাফল্যসন্ধানী লোকদের ভিড়ে, আর তাদেরই প্রত্যাখ্যান করে যে 'অবৈধ ও অস্বাভাবিক লোকটি' ছাইধুলো ও কালিতে ভরে ফেলে নিজের সংসার, তাকেই কবি অর্থাৎ দ্রষ্টা বলি আমরা অর্থাৎ সেই হচ্ছে কারুবাসনার নায়ক। কিন্তু শুধু তাই নয়, ইতিহাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদও আছে। কেন আছে ? এবার সেটা বই থেকে শোনা যাক :

— 'দেখো, কেমন লেবুগাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা ?'

বাবা একটু চুপ থেকে— 'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে— 'এমনি পাড়াগাঁ-র এইসব রাত তোমার খুব ভালো লাগে

বুঝি ?'

মনে মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিস। জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারাজীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই— বেঁচে থেকে বিছানায় শুয়ে, গড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি— কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম— 'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার ; চারদিকে এই আম-জাম-কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

বলা যেতে পারে জীবনানন্দর লেখায় সক্রিয়, সচেতন অথবা সংগ্রামী রাজনীতিহীনতার কিংবা আর্থ-সামাজিক চেতনার অভাবের অভিযোগের উত্তর হচ্ছে উপরের ওই ক'টি লাইন। আধুনিক গদ্যের শিল্পভাবনায় যদি ওই একই ঘাটতির নালিশ কেউ তোলেন, তাহলে তার উত্তর ওই একই।

কিন্তু আগে বলেছি, আত্মহননের ইচ্ছা, বিশ্বাসহীনতা, অপচয়, ক্ষয় এসব হচ্ছে আমাদের সময়ের সামান্য লক্ষণ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এটি শুধু আমাদের সময়ের সংকট নয়, এটি হচ্ছে মানবচিত্তের একটি মূল সংকট, যেহেতু মনের একটি দানবিক কারখানা আমরা বানিয়েছি অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের সাহায্য নিয়ে এই উদ্দেশ্যে যে যুক্তির সাহায্যে আমরা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে, পরমাণুর আচরণ তথা মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য এ সবকিছুকেই একটি ফর্মুলায় বা কার্যক্রমে বেঁধে আনতে পারব। এখন অনেক গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী বলছেন তা সম্ভব নয়। যেমন অতিপরমাণুর ক্ষেত্রে তেমনই চেতনার ক্ষেত্রে রয়েছে সুদূর এক গূঢ় কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত এক অনিশ্চয়তার খেলা যদিও তার মধ্যে একটি সম্ভাব্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁক রয়েছে।

আধুনিক গদ্যসাহিত্য হচ্ছে এই সুদূর এক গূঢ় রহস্যকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনিশ্চয়তার সাহিত্য, নায়ক এখানে নিশ্চিত সাফল্যের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত রাস্তায় হাঁটতে থাকে, কেননা সে অনুভব করে তার বাড়ি এখানে নয়, অন্য কোথাও, যাকে আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় 'ব্যর্থতা', কিন্তু বস্তুতপক্ষে সাফল্য ও ব্যর্থতার বাইরের এক অবস্থান, যেখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দিয়ে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দিয়ে লেবুফুলের গন্ধে ভরপুর বর্ষার রাতের অন্ধকার নিবিড় স্তব্ধতায় এক অনাস্বাদিত রহস্যের আস্বাদ পান— যা ইতিহাস নয়, যা তার বাইরের কোনো দূর রহস্যলোকের ইঙ্গিত।

এবার শেষ করার আগে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই ! এই লেখায় আধুনিক গদ্যের আধুনিকতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এই রচনাকারের ব্যক্তিগত অভিমত। এর চেয়ে ভিন্ন, উৎকৃষ্ট ও সঠিক মতামত থাকা শুধু সম্ভব তা-ই নয়, থাকা স্বাভাবিক। অতএব বর্তমান রচনাটিকে একটি ব্যক্তিগত রচনা বলাই ভাল। □

ভাস্কর রায়

আমাদের অন্তর্গত নির্বাসন এবং কারুবাসনা

ভাষার ভিতরেই রয়ে গেছে মানুষের অন্তর্গত নির্বাসনের বীজ। আবার সাহিত্য ভাষার শিল্প। ভাষার মুক্তি নানাবিধ চিন্তা ও অনুভূতির অবাধ প্রকাশে। সাহিত্যের অন্বিষ্টও তাই। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর তা তর্ক-সাপেক্ষ। বস্তুত, সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষার পরিমার্জিত রূপ মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'কারুবাসনা' উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা বিশেষ অর্থবহ। সাকুল্যে একশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের প্রায় সবটা জুড়ে থাকে সংলাপ। সংলাপের ফাঁক ফোকরে 'সিচুয়েশন'-বর্ণনা এবং টুকরো-টুকরো কিছু চিন্তার স্বগত উচ্চারণ। সংলাপের ভাষা সরাসরি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা থেকে তুলে নেওয়া, কেজো, খুচরো কথা আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো গভীর অর্থ থাকে না। ভাষা অন্যত্র অন্য-প্রকার। কিন্তু সবটা মিলিয়ে ভাষার একটি সামগ্রিক রূপ-ব্যঞ্জনা তৈরি হচ্ছে, ভাষা সময়ের ভেদ মানছে না। সমুদ্রের সঙ্গে মহাকালের উপমা দিই আমরা। ভাষা এখানে তাই। এই সমুদ্র আবার মরু হয়ে যায়। ভাষা তখন অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। ধ্বনি গুরুত্ব পাচ্ছে। ভাষা থেকে চলে যাওয়া হচ্ছে নীরবতায়। এইভাবে নীরবতার এক ভাষা ক্রমাগত গড়ে উঠছে। আমাদের বিচার্য : উপন্যাসের চিন্তার সামগ্রিক বিন্যাসে এই ধরনের ভাষা কতটা সুপ্রযুক্ত বা ফলপ্রসূ এবং উপন্যাসের অন্যান্য উপকরণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সার্থক সমগ্র রূপ সৃষ্টি করছে কিনা ?

একজন 'সফলতা'-বিমুখ মানুষের 'অসফল' হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত এই উপন্যাস। তার জীবন ও শিল্পসাধনা-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা, সমস্যাগুলি জড়িয়ে মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং সামগ্রিক অর্থে রূপ ও অ-রূপের দ্বন্দ্ব, এইসব উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে অন্বিত থাকে। বৃত্তান্তটি নানাভাবেই বলা যেত, উপন্যাসে সচরাচর যেমন বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঘটনার যুক্তিপরম্পরা, ঘটনা ও চরিত্রের স্থান-কাল-গত সুনির্দিষ্ট নির্দেশ, চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বস্ততা নিয়ে ক্রমশ গড়ে ওঠা ইত্যাদি ইত্যাদি। উপন্যাসটি গড়ে উঠছে এইসব প্রথাগত সূত্রগুলি অস্বীকার করেই। 'কবিতা ঘটনাসম্ভবা নয়' এমন একটি ভাবনা ক্রমে পরিব্যাপ্ত হয়ে বৃত্তান্ত-সম্পর্কিত আমাদের চিরাচরিত সব ধারণাই পালটে দেয়। বৃত্তান্তে কাহিনী-অংশ নেহাতই কৃশ, সংলাপে ও চিন্তার বর্ণনায় কাহিনীর একটা আভাস থাকে মাত্র। কার্যত কিছুই ঘটে না এখানে। কোনো মহৎ চিন্তা বা

তত্ত্বের কথাও উচ্চারিত হয় না। আবার চেতনাপ্রবাহ, মনস্তত্ত্ব বা স্বপ্ন-বাস্তব মেলানোর খেলাটিও এখানে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র একটি 'সিচুয়েশন', একটি 'মুড' সৃষ্টি করার অবিরত আগ্রহই থাকে। অনেকটা কবিতার মতো। কিন্তু এখানে কবি জীবনানন্দ এবং গদ্যকার জীবনানন্দের ভেদরেখাটি সুস্পষ্ট। লেখক অতি সচেতনভাবেই কবিতা হয়ে ওঠার ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। যদিও মহৎ শিল্প মাত্রই শেষপর্যন্ত কবিতাধর্মী হয়ে ওঠে। আবার উপন্যাসের ঢঙটি একটা ডায়েরি লেখার মতো। মুখ্য চরিত্র হেম উত্তম পুরুষে এখানে বলে যায়। সে যেন কয়েকটা দিনের পরিসরে তার পরিবারের অন্যান্য চরিত্র, বাইরের জগৎ এবং তার শিল্পচর্চার সঙ্গে নিজের অবস্থানটি নানান দিকে বুঝে নিতে চেষ্টা করে। সব মিলিয়েই এই উপন্যাসের গঠনটি অভিনব। বাঙলা সাহিত্যে শুধু নয়, অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেও এই উপন্যাস-রূপের নিকট-পুরোগামী সম্ভবত কিছু নেই। সেই অর্থে ফর্মটি পিতৃত্বহীন, প্রথম। একটা ছবির ক্যানভাস আমরা ভেবে নিতে পারি, যার ওপর এলোমেলো কিছু রঙের ছোপ, অস্পষ্ট কিছু রেখার টান কোনো সুচিন্তিত বিন্যাসের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে না। ক্যানভাসটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রেখে এর সঙ্গে কখনো নিরবচ্ছিন্ন ধারার শব্দস্রোত, কখনো ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত, বৃষ্টির নানাবিধ শব্দ জুড়ে দিলে ওই রঙের ছোপ, রেখাগুলি একটা অন্তর্গত প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে একটি অনুভূতির দ্যোতনা আনে। গোটা উপন্যাস জুড়েই প্রায় থাকে বৃষ্টির উপস্থিতি। উপন্যাসের গঠন অনেকটা ওই ছবির ক্যানভাসের মতো। পুরো ক্যানভাস জুড়ে রাখা থাকে অনেকগুলি শূন্যস্থান। কাহিনী-বর্ণনার 'প্রয়োজনীয়' তথ্যগুলি ওই ফাঁকা জায়গাগুলিতে যেন আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে একটি গভীর সাযুজ্য-ভাব লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটি একটি অবিভাজ্য সত্তা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়, সেই মুহূর্তে ঘটে যায় এর অনন্য রূপটির বিচ্ছুরণ। অবিরত একটা স্থির চিত্রকল্প তৈরি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কোনো একটি টেক্সট পড়ার বিষয়টি এসে পড়ে। পাঠান্তরে লেখাটি বদলাতে থাকে। ক্রমাগত একটি নতুন লেখা তৈরি হয়ে যায়।

শিল্প-সাহিত্যে বক্তব্য বা বিষয়বস্তু ব্যাপারটি বিড়ম্বনার। শিল্পী যেন তার শিল্পকর্মটিতে একটা বক্তব্য লুকিয়ে রাখে, আমাদের কাজ হল ওই বক্তব্য বা বিষয়বস্তুকে খুঁড়ে বের করা। অনেকটা রহস্যভেদ করার মতো। বক্তব্যটি বা বিষয়বস্তুটি আবিষ্কৃত হওয়ামাত্র রহস্যেও ইতি পড়ে। আমাদের কৌতূহল মিটে যায়। 'সত্য' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হল এই জাতীয় ভাবও কিছুটা তৈরি হয়। শিল্পী কীভাবে তার কথাটি বলল সেটা গৌণ হয়ে পড়ে। তার বলায় যে অনেকটাই না-বলা' থাকে সেটা আমরা নির্দ্বিধায় এড়িয়ে যাই। বস্তুত, কোনো কিছুর বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে ওই 'না-বলার' কোনো ভূমিকা থাকে না। বাস্তব এখানে সবটাই গ্রাস করে। জাপানি 'দার্শনিক' উদ্যানের পরিকল্পনাটির উল্লেখ এখানে

প্রাসঙ্গিক। পনেরোটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে এই কল্পিত উদ্যানটি নির্মিত। আমরা যেখান থেকেই উদ্যানটি দেখি না কেন, একসঙ্গে সর্বাধিক চৌদ্দটির বেশি কখনোই দেখতে পাই না। একটি খণ্ড সবসময়ই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। আমরা শুধু উদ্যানটির সামগ্রিক বিন্যাস দেখতে পাই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এর বিভিন্ন রূপ ধরা পড়ে মাত্র। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রশ্ন উঠতে পারে ওই পনেরোতম খণ্ডটি আসলে কোনো শিল্পকর্মের একটি গুহ্য তত্ত্ব, সত্যের একটি অনড়, অচল সত্তার দিকেই নির্দেশ করছে, যা কেবল আমাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায়। ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু উক্ত খণ্ডটি কোনো একটি শিল্পকর্মের রহস্যময়তার কথাই ব্যক্ত করছে, তার 'না-বলা', অব্যক্ত ভাবটিই প্রকাশ করছে। আমরা শুধু নানাভাবে ওই কারুকর্মটির রস উপলব্ধি করতে পারি। এখানে বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গটি এসেই পড়ে। আসলে শিল্প-সাহিত্যে বিষয়বস্তু বলে কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু চিহ্নিত করা যায় কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। শিল্পী তার দেখার, শোনার অনুভূতির জগৎ এবং তার স্বপ্নের জগৎ এই দুই জগৎকে যে-উপায়ে মেলায় তাতে শিল্পের অনুষঙ্গটিই আগাগোড়া পালটে যায়। এই অনুষঙ্গ বাস্তবের দু-একটি তথ্য, সূত্র সচরাচর বিষয়বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। বাস্তব ও স্বপ্নের ওই রসায়নেই শিল্পকর্মের সার্থক উত্তরণ। সেই কারণে শিল্পে বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান নিরর্থক।

উপন্যাস গতি পায় একটি ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। লেখক এই একটি মাত্র ঘটনারই আভাস রাখেন সারা উপন্যাসে। জীবিকার সন্ধানে হেম কলকাতায় ফিরে যাবে, তার জীবনে একটা সুস্থিতি আসবে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা তার পরিবারের সবার মনে থাকে। কিন্তু কোনো এক অন্তর্গত কারণে যাত্রার ক্ষণটি ক্রমাগত বিলম্বিত হতে থাকে। লেখক এখানে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণে আদৌ আগ্রহী নন। ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। একটি সংকেত। যার সাহায্যে তিনি অস্তিত্বের সমস্যা অন্বেষণ করছেন। মানুষের বেঁচে থাকার কতগুলি প্রাথমিক শর্ত এখানে উঠছে। হেমের সংশয়, উদ্বেগ আসলে একটি ব্যক্তি মানুষেরই অস্তিত্বের অন্তর্লীন সংকট। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'হিউম্যান সিচুয়েশন' তারই এক সার্থক শিল্পরূপ সৃষ্টি হয়। সংলাপে, চিন্তার বর্ণনায় হেমের কলকাতা বাসের পটভূমিটি তৈরি হয়ে যায়। সফলতা, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জন করা এম. এ পাশ হেমের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু যে-মানুষ সংসারের অ-রূপে ক্রমাগত ক্লান্ত, 'মানুষিক সৈনিক' সাজায় যার তীব্র অনীহা, যার ভিতর রয়ে গেছে প্রতি মুহূর্তে শিল্প-সৃষ্টি করার 'জন্মগত অভিশাপ' তার জীবনে নির্বাসন অনিবার্য পরিণতি নিয়ে আসে। গ্রাম ছেড়ে নির্বাসনের ওই ধূসর নিসর্গে, কর্মোদ্যোগের এক বিপুল অমানবিক স্রোতে, ফিরে যেতে গিয়ে বিবমিষা, অবসাদে আক্রান্ত হয়ে সে যেন 'সমাপ্তির গন্ধ' পায়। কিন্তু এখানেও তো মৃত্যু উপত্যকা।

বৃষ্টির প্রসঙ্গটি জরুরি। উপন্যাসে বৃষ্টি নানাবিধ 'মোটিফ' নিয়ে আসে। একটি

'মোটিফের' কথা ধরা যাক। উপন্যাসের ঘটনাবলি একটি বাড়িতে একটি পরিবারের মধ্যে সংঘটিত হয়। বৃষ্টি যেন পরিবারটিকে গোটা পৃথিবী থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেয়, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীরই একটি প্রাচীন, জীর্ণ দ্বীপের অনুষঙ্গ আনে। এই নির্বাসনের বিজন দ্বীপে কতগুলি মানুষ পাতালের বিষে জর্জরিত হয়ে অন্ধ কীটের মতো অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়। চারিদিকে কেবল ক্ষয় আর মৃত্যুর চিহ্ন। উইয়ের প্রসঙ্গটি, যা উপন্যাসের গোড়াতেই আছে, এখানে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একটি প্রাকৃতিক ক্ষয়, অনেক দিনের পুরনো একটি পৃথিবী যেন সামনের টানে আর চলতে না পেরে দীর্ঘ-প্রলম্বিত এক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। চারিদিকে কেবল প্রিয় জিনিসের ক্ষয়। 'নানারকম কষ্টার্জিত বই', 'মনের কর্তৃত্বে' কেনা বইগুলি উইয়ের দল ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে। বিশ বছর ধরে সযত্নে রক্ষিত চিঠি, এমনকি হেমের কবিতাগুলিও উইয়ের অমোঘ দংশন থেকে রক্ষা পায়নি। পরিহাসপ্রিয় সৃষ্টিকর্তা হেমের জীবন শূন্যতায় ভরে দেয়। হেম ও তার পরিবার ধীরে ধীরে গোটা সভ্যতারই প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। 'সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতা' সভ্যতারই বুকে এঁকে দেয় নির্বাসনের ক্ষতচিহ্ন। 'ঈশ্বর মৃত' এই ঘোষণাটির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নির্বাসনের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বর এক মহান খুনীরূপে চিহ্নিত হন। সভ্যতার চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে কেবল খুনের চিহ্ন। স্বেচ্ছাচারী সৃষ্টিকর্তা সুবিচারের নামে প্রত্যাখ্যাত হন। পিতার প্রিয় উপনিষদের স্তোত্র হেমের কাছে কোনো অর্থ বা স্বস্তি নিয়ে আসে না। তীব্র ক্ষোভ, বেদনা আর অস্ফুট আর্তনাদে সে ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেয় এবং তার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির চরম ঔদাসিন্যের মুখোমুখি হয়। লেখক এই বিপুল পটভূমি তৈরি করেন অনায়াসে। একটি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ তীব্রভাবে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি কথা, সামান্যতম ভাবভঙ্গি প্রতিটি চিন্তার বর্ণনা গভীর প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। এখানে বাইরে থেকে কোনো চিন্তা বা প্রতীক চিহ্ন চাপিয়ে দেওয়া হয় না। উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিতেই প্রতীকগুলি গড়ে ওঠে।

প্রাচীন, জীর্ণ দ্বীপটিতে একটি নর এবং একটি নারী, এক চিরন্তন নাটকের অক্লান্ত পুনরাবৃত্তি। চারিদিকে মানবিক সম্পর্কের চাপেই মানব ক্রমে নিঃশেষিত। স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গেও কি হেমের এই অ-প্রেম, অ-রূপের সম্পর্ক ? দুধ খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর কিছু খুচরো কথার বিনিময়, পুনরাবৃত্তি কি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরই দূরত্ব প্রকাশ করে ? কল্যাণী স্বামীর কাছে সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দই কেবল প্রত্যাশা করে ? স্ত্রীকে এই স্বচ্ছলতা দিতে না পারায় হেম কি পাপবোধে ভোগে ? তাই নিজে না খেয়ে স্ত্রীর দিকে দুধের গ্লাসটি এগিয়ে দেয় ? নর-নারীর চিরন্তন খেলা, তাদের অন্তর্নিহিত পৃথক ব্যক্তি-সত্তার সংঘর্ষ ? এই সব প্রশ্ন ওঠে ; পরে কিন্তু এসবের জবাব খোঁজার আগ্রহ লেখকের নেই। বস্তুত এ যেন এক নষ্ট হয়ে যাওয়া, শুকিয়ে

যাওয়া সম্পর্কেরই নির্দয় বিবরণ! সম্পর্কটির প্রাক্-ইতিহাস এখানে উল্লিখিত নয়, তেমন জরুরিও নয়। উপন্যাসে এই সম্পর্কই এক অন্যতম প্রধান উপাদান। সামগ্রিক বিন্যাসে সম্পর্কটি গভীর অর্থ পায়। জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি দেখা যায়। লেখক আসলে মানুষের এই সম্পর্ক-ঘটিত মৌলিক কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন, নানারকম সংশয় তাঁকে আলোড়িত করছে। আবার এই সংশয় তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কিত উদ্বেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

দুধ খাওয়ার প্রসঙ্গটিকে আমরা এভাবেও দেখতে পারি: দুটি নর-নারী যেন টেনিস কোর্টের দুই বিপরীত প্রান্তে, পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে দেয় ক্ষিপ্রগতির কিছু কথা প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষের দুর্বলতাটি বুঝে নিতে। অভিনীত হয় একে অপরকে প্রবঞ্চিত করার খেলা, যা আদতে আত্মপ্রবঞ্চনা। নর-নারীর সম্পর্কে আমরা যে নিঃস্বার্থ প্রেম আর আত্মদানের দিকটি কল্পনা করে থাকি তার চিহ্নমাত্রও এখানে থাকে না। দুধ কেনা হয় কল্যাণীর জমানো এক আনিটি দিয়ে। হেমের এখন এই দুধ-কেনার সম্বলটুকুও নেই। একে অপরকে দুধ খাওয়ানোর জন্য যে অনুরোধ-উপরোধের পালা চলে তাতে একটি কৃত্রিম মোড়ক থাকে। আমাদের চিরাচরিত ধারণাগুলি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অতি তুচ্ছ, আপাত নিরীহ কিছু শব্দের ক্রমাগত অভিঘাতে হেম ও কল্যাণীর দূরত্ব ক্রমে বেড়ে যায়। শব্দগুলি হয়ে ওঠে অর্থহীন কিছু ধ্বনি। ভাষা হয়ে ওঠে নীরবতার ইঙ্গিত। হেম ও কল্যাণীর ভিতর অযুত আলোকবর্ষের নীরবতা নেমে আসে। তৈরি হয় একটি সুপরিচিত সামাজিক ভঙ্গির প্রতিচ্ছবি যা ভালবাসার নয়, যা বস্তুত স্বার্থের ইঙ্গিতবাহী, প্রাচীন দ্বীপটিতে নির্বাসিত নর-নারীর প্রকৃত মুখচ্ছবি। এই সবই গড়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অতি সাধারণ, 'অপরিমার্জিত' ভাষার প্রয়োগে। প্রয়োগটি অভিনব। একটি অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়ায় ভাষার মুক্তি ঘটে যায়। খুচরো, কেজো কিছু শব্দ ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত হয়ে চিন্তা ও অনুভূতির দ্যোতক হয়ে যায়। নির্বাসন থেকে মুক্তি, ভাষার এই নিরুপম যাত্রা।

শুধু দুধ কেন, উপন্যাসে খাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে নানান খেলা চলে। সংলাপের একটা বেশ বড় জায়গা জুড়ে থাকে এই খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গটি। এর আবার সিংহভাগ থাকে হেমের মেজকাকার মুখে। সংসারে গভীরভাবে আসক্ত, উদর-সর্বস্ব এই মেজকাকাটি উপন্যাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা কাউন্টারপয়েন্টের অনুষঙ্গ এতে তৈরি হয়। হেম যে রূপের জগতের অন্বেষী কাকাটি তার বিপরীত মেরুতে। এই বৈপরীত্যের খেলায় রূপ ও অ-রূপের দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। পুনরায় সংঘটিত হয় অতি আপাত তুচ্ছ কথার খেলা। অবসরপ্রাপ্ত মেজকাকা কদিনের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছে। অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দে নির্লিপ্ত আদতে এই জীবটি নিজের উদরপূর্তি নিয়েই ক্রমাগত ব্যস্ত। নিজের কথা, নিজের সুখ, নিজের জীবনে 'সাফল্যের' কথা বলেই তার আত্মতৃপ্তি। সাধারণ ভাষা কতটা প্রতীকী হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন

লেখক এখানে মুন্সিয়ানার সঙ্গে রাখেন। মেজকাকার আত্মপর ভোগসর্বস্বতা, যা বস্তুত এই সমাজেরই একটি সুপরিচিত ভঙ্গি, ভাষার প্রয়োগে তীব্র ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। আমরা যেন ক্রমশ সভ্যতার বিপরীত দিকে টান অনুভব করি। মানুষের বিপুল কর্মোদ্যোগে সভ্যতা ক্রমশ উন্নতির পথে, মানুষ ক্রমে উচ্চতর জীবে উন্নীত হচ্ছে, ধারণাটি কার্যত খারিজ হয়ে যায়। আমরা সভ্যতার একটি প্রধান সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পেঁছে যাই। লেখক অতি সচেতনভাবে প্রসঙ্গটি বারবার আনেন। এই পুনরাবৃত্তিতে আমরা সবসময়ই পরস্পর বিরোধী দুটো টান অনুভব করি—মানুষের সহজাত জীবধর্ম, প্রকৃতির মতোই যা স্বাভাবিক ও সরল, এবং মানুষের আত্মপর ভোগবাদ যা আদতে কৃত্রিম ও আত্মবিনাশী। কোনো কোনো পাঠকের কাছে হয়ত মেজকাকার প্রসঙ্গটি অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ মনে হতে পারে। অযৌক্তিকও লাগতে পারে। পূর্বেই বলেছি, লেখকের উদ্দেশ্যটি এখানে সুস্পষ্ট। এক, একটি বাস্তব পটভূমি তৈরি হচ্ছে যা আমাদের মূল সমস্যাটির দিকে সবসময়ই সজাগ রাখে। দুই, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে মেজকাকার সম্পর্ক ওই চরিত্রগুলিকে ভিন্ন মাত্রা দিচ্ছে। তিন, হেমের সংকটের কিছু দিক মেজকাকার সঙ্গে কথোপকথনে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়।

মানুষের 'গভীর, গভীরতর অসুখ'। শিল্পী এই 'অসুখের' কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে, সংসারের অ-রূপে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েও রূপের অন্বেষায়, রূপ-সৃষ্টির পথে বারবার ফিরে আসে। লেখক শিল্পী হেমকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। হেম যেন আমাদের ভিউ পয়েন্ট। আবার আমরা হেমকেও দেখি। যেমন ধরা যাক বহুবার উল্লেখিত সেই দুধ-খাওয়ার প্রসঙ্গটি। হেম এখানে দু-টুকরো। শিল্পী হেম মানুষ হেম থেকে সরে আসে। কল্যাণী 'দুধের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা; মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মতো হিম, বেদনাতুর; মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবন্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মতো বিহ্বল বিষণ্ণ চোখ। উটের লোম দিয়ে যে ব্রাশ তৈরি হয়, যার সঙ্গে রঙ মিশিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশই-বা কোথায়? রঙই-বা কোথায়? ছবি আঁকবার শক্তিই বা কোথায়?' এই ছবি আঁকার তাগিদে শিল্পী তার দৃষ্টি দৃশ্যমান বস্তু থেকে সরিয়ে নেয়। ফিরে আসে নতুনবোধে একটি সৌন্দর্য-প্রতিমা সৃষ্টি করতে। এই প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি লক্ষ করার মতো। লেখক নানাভাবে এই বিষয়টি নিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যাবর্তনের পথটি তিনি সহজভাবে রাখেন না। এখানে রক্তপাত, দ্বিধা আর যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত থাকে। 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম?' হেম তা হলে বাঁচে কী ভাবে? তার শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণাই-বা কোথায়? পুনরায় বৃষ্টির 'মোটিফ'-টি লেখক নিয়ে আসেন, অবশ্যই ভিন্ন এক মাত্রায়, নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি, বৃষ্টিসিক্ত পৃথিবীর আদিম গন্ধে হেমের মানস-প্রতিমা বনলতা হাজির হয়। প্রকৃতি, প্রেম, স্মৃতি একাকার হয়ে যায়। বিষয়টি আলোচনার

দাবি রাখে। একদিকে মানুষের সফলতা, কীর্তি, উদ্যমের ইতিবৃত্তে অনিবার্য ক্ষয়ের চিহ্ন সভ্যতাকে রিক্ত করে। অন্যদিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক, সহজ সৌন্দর্য বহমান। হেম প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতায় ফিরে যেতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষাটি উপন্যাসের নানান জায়গাতে নানাভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। হেমের প্রকৃতি-মনস্কতায় বিশ বছর আগের একটি পৃথিবীর স্মৃতির অনুষঙ্গ থাকে। বিশ বছর আগে কিশোরী বনলতা তাদের পাশের বাড়িতে থাকত। মানুষ তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে একটিই সত্তা। প্রকৃতির একটি প্রসারিত অঙ্গ। হেমের স্মৃতি বনলতাকে তুলে আনে প্রকৃতির আধারে। বাঙালি ঘরের কালো মেয়েটি আর রক্ত-মাংসের মানুষ থাকে না। শিল্পী হেমের সৃষ্ট একটি প্রতিমা হয়ে যায়। প্রকৃতি ও মানুষের কল্পনার এক অনুপম রসায়ন।

প্রকৃতির সহজ, স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জীবনানন্দের শিল্প-ভাবনার একটি প্রধানতম দিক। আকাঙ্ক্ষাটি নিছক প্রকৃতি-প্রেম নয়। নান্দনিক ভাবনা এখানে সামাজিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। হেম প্রায়ই একটি বাড়ি তৈরি করার কথা ভাবে। প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতিরই উপাদান দিয়ে নির্মিত একটি বাসগৃহ। আধুনিক মানুষের বহির্মুখী, আত্মপর, আগ্রাসী জীবনপ্রণালীর বিপরীতে স্বাভাবিক, আত্মগত একটি জীবনপ্রণালী। আদতে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকারই শেষ ভরসা। প্রকৃতি-পরিবেশ অখণ্ডতার ভাবনা জীবনানন্দের প্রায় উপন্যাসেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তবে 'কারুবাসনা'-তেই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত, সামগ্রিক বিন্যাসে ভাবনাটি একটি 'মহাকাব্যের' মাত্রা আনে। কথাটি হয়ত ঠিকভাবে বলা হল না। ব্যাকরণগত অশুদ্ধি হয়ত রয়েছে। বলাবাহুল্য, উপন্যাসটিকে 'এপিক'-ধর্মী বলার কোনো অভিপ্রায় নেই। কথাটি এই অর্থে বলা যে, সভ্যতার এক বিশাল পটভূমি উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে জেগে থাকে।

বিশ বছর আগের এক পৃথিবী। যেন পৃথিবীরই শৈশব। এই বিশ বছরে হেমের জীবনে আঁকা থাকে অনেক ক্ষতচিহ্ন। যে চিঠিগুলি বিশ বছর ধরে সে জমিয়ে রেখেছিল সেগুলির অবশিষ্টও আর নেই। বন্ধু অবিনাশের চিঠি যা বিগত যৌবনের বেহিসেবি আবেগ আর উচ্ছ্বাসের, মাধুরীর চিঠি যা তাকে প্রেমের বিরহ-যন্ত্রণার অপরূপ রূপ চিনিয়েছিল সবই উইয়ের খাদ্য এখন। আর হেমের কাছে স্মৃতির খাদ্য। বাস্তবে সে যা দেখছে সবই অর্থহীন। বর্তমান তার কাছে অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। সে ক্রমাগত স্মৃতির 'অবাস্তবে' চলে যায়। বস্তুত একটি 'অবাস্তব' জগতে সে বাস করে। তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়। উপন্যাসের অনেক জায়গাতেই কেবলমাত্র ভাষার প্রয়োগে এই 'অবাস্তব' জগতের অনুষঙ্গ তৈরি হয়। ক্রমে একটি 'অবাস্তবতার' ভাষা তৈরি হচ্ছে যা সময়ের ভেদ মানছে না। যেটা শুধু ধ্বনির, একটা অব্যক্ত অনুভূতির। যেমন, এক জায়গায়: 'আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে মা এত বছর ধরে তো অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে আসছেন। গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। শুপুরি কাটার শব্দ, গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা

সারাদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরেছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম।' কয়েক লাইন পরে : 'এমনি বাদলের অমাবস্যার রাতে কত চাষি ধানের ক্ষেতে ফিরছে, পাটের চারার ভিতর ঘুরছে, কত বধু খাল-বিলের কাছে বসে।' এই বর্ণনাটি মেজকাকার সঙ্গে কথাবার্তার অব্যবহিত পরেই আসছে। কাকার নৈশভোজন শেষে হেমের মা ঝড়-বৃষ্টি, অন্ধকারের মধ্যে ঘাটে বাসন মাজতে চলে যায়। বর্ণনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তব বলতে আমরা যে তথ্য, সূত্রগুলি বুঝি অর্থাৎ যে অনুষঙ্গে আমাদের বাস্তব-সম্পর্কিত ধারণা, তার কোনো লক্ষণই এই বর্ণনায় থাকে না। অর্থাৎ কোনো বাস্তব পরিবেশ রচিত হচ্ছে না। শব্দের ব্যবহার, তার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা এখানে এমন একটি অনুরণন সৃষ্টি করে যা বাস্তবকে 'ধ্বংস' করে। তৈরি হয় এমন একটি ব্যক্তিগত জগৎ যা একান্ত শিল্পীরই। এক মুহূর্তে একটি মহাকালের বোধকে ধরে রাখে, এমনি ভাষার মুন্সিয়ানা।

বিশ বছরের জীবনধারণের ক্লান্তিতে পৃথিবীর সব রঙ-রূপ মুছে যায়। বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার, প্রিয় জিনিস হারানোর বেদনা হেমকে আক্রান্ত করে। বনলতাদের পরিত্যক্ত ভিটে তার মনে তীব্র 'নস্টালজিয়া'-র অনুভূতি আনে। ক্রমে বেদনার অনুভূতিও ফিকে হয়ে আসে। আকাঙ্ক্ষার পালকগুলি ঝরে পড়ে। অবসাদে, ক্লান্তিতে সে এখন গভীর ঘুমের আয়োজন করে। নির্বাসনের বৃত্তটি এগিয়ে আসে। একে একে অর্গল বন্ধ হতে থাকে।

উপন্যাসে তিনটি প্রজন্মের কথা থাকে। এই ব্যাপারটি জীবনানন্দের প্রায় উপন্যাসেই থাকে। তিনি যেন একটি গল্পই বারবার বলছেন। আসলে তিনি একটি গল্পই লিখছেন। হেমের পিতা গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। হেমের মতোই তিনি বিষয়বুদ্ধিহীন, 'সফলতা'-র সিঁড়িতে কোনোদিন পা রাখার আগ্রহ বোধ করেন নি। তিনি বেঁচে থাকার সহজ, গভীর মূল্যবোধগুলি নিয়ে ভাবেন। হেমের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন উপন্যাসকে একটা স্থিতি দেয়, যেন বা আমরা একটা অবলম্বন পেলাম এমনি একটা ভাব তৈরি হয়। তাঁর কথাবার্তায় এই প্রথম একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনি। তাঁর আছে পরিষ্কার একটি বিশ্বাসভূমি। তিনি হৃদয়ের কথা বলেন, জীবনের প্রসারতা নিয়ে চিন্তা করেন। উপনিষদের স্তোত্র তাঁর কাছে গভীর অর্থ নিয়ে আসে। মানুষের বেঁচে থাকার প্রচলিত রকমগুলি তাঁর কাছে অর্থহীন। সেই কারণে দেশপ্রেম, 'সাফল্য' অর্জন কীর্তি-যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর বিচারে সবই বাহ্য। নিজের মুখের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেন। পিতাপুত্রের কথাবার্তায় 'সফলতা' / 'ব্যর্থতা' এই দ্বন্দ্বটি বিশেষ তাৎপর্য পায়। 'সফলতার' পিছনে দৌড়ে মনকে সংকীর্ণ না করে হেম যেন নিজের কাছে, নিজের শিল্প-সাধনায় অবিচলিত থেকে 'ব্যর্থতা'-ই বেছে নেয়, হেমের পিতা তাকে এমনি উপদেশ দেন। কিন্তু লেখক পুনরায় আমাদের স্বস্তি-ভাব ভেঙে দেন। হেমের পিতাও তো আসলে নির্বাসিত। উপনিষদের স্তোত্রও তো এখানে বাহ্য, একটি জোর করে আঁকড়ে ধরা অবলম্বন মাত্র। লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যে সাধারণ কতগুলি 'অ্যাকশনের'

মারফত তাঁর একাকীত্ব ব্যক্ত করেন। তিনি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ক্রমাগত উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি করেন, দু-চার মিনিটের জন্য বাতি জ্বালান আবার নিভিয়ে ফেলেন, হেমের ঘরে বারবার উঁকি মারেন, অন্ধকার বিছানায় চুপচাপ বসে থাকেন, এই জাতীয় কতগুলি প্রাত্যহিক ঘটনা। একটি দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ যাত্রার প্রস্তুতি যেন। হেম তাঁর পিতার সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা বোধ করে। কিন্তু পিতার মতো মঙ্গলময় ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। তবে শিল্প-সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে! জীবনের অবসাদ, স্থূলতাকে আত্মসাৎ করে শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সে মুক্ত হতে পারে। হেমের বাবার নিষ্ক্রমণের এই পথটি নেই। শুধু নীরবতা, একটা নিরন্ধ্র বলয়ে শুধু অবিরত হাঁটা। অতি সাধারণ উপায়ে এমন একটি চিত্র আঁকার নজির বাঙলা সাহিত্যে বিরল।

একটি দৃশ্য (উপন্যাসের শেষের দিকে): ঝড়-বৃষ্টির রাত। পিতাপুত্র কথাবার্তার শেষে বসে-বসে ঝিমোতে থাকে। ঝড়-বৃষ্টি তাদের ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করেছে। হেম চোখ মেলে দেখে বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। একটু আগেই একটা নিরাশ্রয় বিড়ালছানা কাঁদছিল। হেমের বাবা ওই ছানাটিকে ঘরে এনে দুধ খাওয়ানোর কথা বলে। হেম উঠে গিয়ে দেখে তিনি ছানাটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। পরক্ষণেই হেম বুঝতে পারে সে স্বপ্ন দেখছিল। 'কোথাও বিড়ালের ছানা নেই, আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারী এতক্ষণে জমল তা'হলে?' হেম যা দেখছে সবই অর্থহীন, নিয়ম, রীতি কোনো কিছুই কোথাও নেই। আবিষ্কারের জায়গাও আর কোথাও নেই। তার স্বপ্ন দেখাও শেষ। একটা অসীম শূন্যতাবোধ সঞ্চারিত হয়। উপন্যাসের কাঠামোগত চিন্তায় এই জায়গাটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটা অন্তিম পরিণতির ইঙ্গিত থাকে। হেম সব কিছু খোঁজার শেষ প্রান্তে দাঁড়ায়। পিতার ভাব-মূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মূল্যবোধের জগৎটিও ভেঙে পড়ে। পিতার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়। যেন পরমপিতা তাকে নির্বাসিত করেছেন। সে গভীর নাস্তিবোধে ডুবে যায়। পিতার ব্যঞ্জনাটি উল্লেখযোগ্য। পিতা বলতে একটি গভীর, আদি সত্যের প্রবহমানতাকেই লেখক বোঝাতে চাইছেন। এই চিরন্তন প্রবাহকে স্তব্ধ করে অস্তিত্বের একটি শূন্য আধার তৈরি করাই লেখকের অভিপ্রায়।

জীবনানন্দ যেন নতুন করে আমাদের ভাষা শেখাচ্ছেন। স্বপ্ন ও বাস্তবে ভাষার এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে।

উপন্যাসের কাঠামোতে একটা ডায়েরি লেখার ভঙ্গি বর্তমান একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ডায়েরির উল্লেখে কতগুলি তথাকথিত বাস্তব-ঘটনা-বর্ণনার অনুষঙ্গ স্বভাবতই আমাদের মনে আসে। এখানে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবতা ততটাই যতটা ডায়েরি লেখার কার্যটি একটি বাস্তব ঘটনা! বস্তুত সংলাপগুলি যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তাতে

লেখকের একটি সুনির্দিষ্ট নক্‌শার ভাবনাই ধরা পড়ে। সংলাপগুলি আসলে তার চিন্তারই নানাবিধ প্রক্ষেপ। মনোযোগী পাঠে এই লক্ষণটি প্রকাশিত হয়। সংলাপগুলির সাহায্যে তিনি কতগুলি অর্থহীনতার শূন্য আধার তৈরি করেছেন। এই শূন্য আধার-গুলি নিয়ে তিনি একটি শূন্যতার মহা আধার সৃষ্টি করতে মনোযোগী। সংলাপগুলি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচ।
মেজকাকার সঙ্গে চার।
পিতার সঙ্গে চার।
মার সঙ্গে দুই।
কন্যার সঙ্গে পাঁচ।
বন্ধু বিরাজের সঙ্গে এক।
যদুনাথ বাবুর সঙ্গে এক দফায় হেমের কথোপকথন।

সংলাপগুলি অবশ্য উপরোক্ত পরম্পরায় ঘটে না। সংলাপগুলি পরপর সাজিয়ে নিলে আমরা দেখব, লেখক শূন্যতার এক একটি খণ্ড নিয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকল্প নির্মাণ করে চলেছেন। একটি চিন্তার পরিণতিই এখানে অভিপ্রেত, চরিত্রগুলির বাস্তব পরিণতি নয়। আপত্তি উঠতে পারে, শিল্প-সৃষ্টি কি এতটাই সচেতন একটি প্রক্রিয়া? কিন্তু এটাও সঠিক নয় যে শিল্পী কী তৈরি করেছে, কীভাবে করছে সেই ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোনো শিল্পই কেবলমাত্র স্বজ্ঞা দ্বারা নির্মিত নয়। যে-প্রক্রিয়াতেই একটি শিল্পকর্ম নির্মিত হোক না কেন, তার একটি অন্তর্লীন বিন্যাস থাকবেই।

প্রথম সংলাপ কল্যাণীর সঙ্গে। সংলাপের আগে-পরে ও মাঝখানে কয়েকটি বর্ণনা। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে উপন্যাসের মেজাজটি তৈরি হয়ে যায়। একটা গতির অনিশ্চয়তা, উদ্বেগের কেন্দ্রে আমরা পৌঁছে যাই। উইয়ের প্রসঙ্গটি এখানে রয়েছে। মেজকাকার সঙ্গে সংলাপ এর পরেই। উপস্থিত চার চরিত্র : হেম, কাকা, হেমের মা ও পিসি। একটি দীর্ঘ অধ্যায়। সংসারেরই এক দীর্ঘ-প্রলম্বিত ইতিবৃত্ত। অধ্যায়টি প্রথম সংলাপের সূত্র ধরে গড়ে উঠছে। নর-নারীর একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গোটা সমাজ-শরীরে যেন প্রতিসরিত হচ্ছে। এখানে হৃদয়ের বিনিময় হয় না। বস্তুত মানসিক স্তরে কোনো যোগাযোগই গড়ে ওঠে না। সমস্ত কথাবার্তাই বৈষয়িক সাফল্যকে কেন্দ্র করে। ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পরশ্রীকাতরতা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ভাষা এখানে প্রবঞ্চনার। আত্মপ্রবঞ্চনার। কথাগুলি পুনরাবৃত্ত হয়ে, ব্যবহৃত হয়ে, ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের ক্লান্ত করে। লেখকের উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট : প্রচলিত মানবিক সম্পর্কগুলিকে অর্থহীন, অবাস্তব স্তরে নিয়ে যাওয়া। হেম এখানে সংলগ্ন হতে পারছে না। সে যেন বহিরাগত। শ্লেষ এবং রসিকতার বর্ম দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করে :

যেমন, [হেম উই-দংশিত চিঠি ও কবিতার খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে]
মেজকাকা এসে বললেন, 'উইয়ে খেয়ে ফেলেছে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'সার্টিফিকেট বুঝি ?'
মাথা নেড়ে, 'হ্যাঁ'।
—'কার সার্টিফিকেট ছিল ?'
—'বর্ধমানের মহারাজার।'
কিন্তু আত্মরক্ষার বর্মটি বড়ই ভঙ্গুর। গভীর নৈরাশ্যবোধে ডুবে যায়।

এই দীর্ঘ অধ্যায়ের অব্যবহিত পরের বর্ণনায় হেমের শিল্পীসত্তার চিত্রটি পাওয়া যায়। অনেকটা নাটকের 'পজ'-এর মতো। পরবর্তী অধ্যায়ে যেতে আমাদের যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে। আমরা শিল্পী হেমকে দেখি। সমাজের পটভূমিতে তার কারুসাধনার সমস্যা ব্যক্ত হয়।

পিতার সঙ্গে প্রথম দুটি সংলাপ। যেন সিম্ফনির 'মুভমেন্ট'-এর মতো একটি থিম প্রবেশ করল, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বিপরীত মেজাজ নিয়ে। মানুষ হেম ও শিল্পী হেমের সমস্যা বাস্তব পৃথিবীর পটভূমিতে ধরা থাকে। একটি মানবিক জীবনপ্রণালীর কথা এখানে বলা হয়। যার ভিত্তি কতগুলি শাশ্বত মূল্যবোধ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস। একটা সুস্থিতির ভাব আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু ভাবটি ক্ষণস্থায়ী। সংলাপের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যেতে থাকে। 'মনে মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল···।' হেমের এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে একটা স্থবিরতার অনুষঙ্গ আনছে। এ-যেন আত্মবিলোপের ভাষা। অস্তিত্বের তীব্র দহনে হেম নিজেকে নিজের মধ্যে ক্রমাগত গুটিয়ে নিচ্ছে।

উপন্যাসে দুটো কণ্ঠস্বর সমান্তরালে চলে। প্রথম কণ্ঠস্বরটি হেমের। প্রতিদিনের ঘটনা যেমন যেমন ঘটে তারই বিবরণ পরপর রেখে যায়। স্বভাবতই হেম সচেতনভাবে কোনও ভাবনা করছে না। মাঝে মধ্যে কিছু চিন্তার বর্ণনা রাখছে, এই মাত্র। দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি স্পষ্টতই লেখকের, অনুচ্চারিত। হেমের বিবরণের সূত্র ধরে চিন্তার একটি সামগ্রিকরূপ নির্মাণ করে চলেছে। এই নির্মাণের প্রক্রিয়া ধরে পুনরায় কল্যাণীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। একটা প্রচ্ছন্ন যৌনতার উল্লেখ যেন। কথাটি পরিষ্কার করা জরুরি। বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অবতারণা এখানে অভিপ্রেত নয়। হেম ও কল্যাণীর সম্পর্কের এটা একটা দিক মাত্র। দম্পতিটির কথাবার্তায় মোট ছাব্বিশবার ওই জাতীয় ইঙ্গিত থাকে।

ইঙ্গিতটি সামগ্রিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে হেমের অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধার প্রকাশ যেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্পর্কেরই স্বাভাবিক পরিণতি। উপন্যাসের এই পর্যায়ে সম্পর্কটি ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের অভাবে কল্যাণী হেমের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এমন একটা ধারণা গোড়ার দিকে আমরা পেয়েছি। সমস্যাটি আরও গভীরে প্রোথিত। 'তুমি যদি রাজপুত্র হতে আর আমি যদি তোমার রাজপ্রাসাদে থাকতাম, তা হলেও এই পান্তা আর মরিচ খাওয়া ও অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কান্না ঘুচত না আমার।' হেমের স্ত্রী নয়, হেমের অপরিচিত সম্পূর্ণ পৃথক একটি ব্যক্তিসত্তা, কল্যাণীও তো আসলে নির্বাসিত। উপন্যাসে কল্যাণীর এই সংকট বাস্তব ঘটনার বিবরণে আসে না, কার্যকারণ-বিশ্লেষণও এখানে থাকে না।

ধরা যাক, অর্থগতভাবে একটি বাক্যকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 'থিম', অর্থাৎ, বাক্যে যে প্রচলিত অর্থটি থাকে। 'রিম' (Rheme), অর্থাৎ, বাক্যটিকে যে-ভাবে যে-জায়গায় রাখা হয়েছে তারই অনুষঙ্গে বাক্য যে নতুন অর্থ পায়। শিশুকন্যার সঙ্গে হেমের যে কথোপকথন চলে সেগুলি প্রচলিত অর্থে পিতা-কন্যার রোজকার অন্তরঙ্গ বিনিময় মাত্র। অনুষঙ্গে কথাগুলি একেবারেই পালটে যাচ্ছে। আমরা হেমের গভীর উদ্বেগ, আশঙ্কা অনুভব করতে পারছি। বৃষ্টি পুনরায় আরেকটি প্রজন্মকে হেমের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে, তাদের ঘিরে একটা বৃত্ত যেন আঁকা হয়ে যায়। হেম অসহায় যেহেতু পিতা কন্যাতে উত্তরাধিকারসূত্রে গভীর কিছু রেখে যেতে পারছে না। একটি গভীর, আদি সত্য যেন তার পরম্পরা হারিয়ে ফেলেছে। কন্যা থেকে সে বিচ্ছিন্ন। একটা হারানোর ভয় তাকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। ভবিষ্যত তার কাছে অদৃষ্টের খেলা, সেই কারণে অবাস্তব, অস্তিত্ববিহীন এবং অর্থহীন। অধ্যায়টি দীর্ঘ। দীর্ঘপ্রলম্বিত, অবিরত যন্ত্রণার।

যন্ত্রণাদগ্ধ হেম জন্মদাত্রীর কাছে আসে। মার দুঃখে সংবেদনশীল, একই সঙ্গে বাবার প্রতি আনুগত্য হেমকে দীর্ণ করে। তার কথায় অভিযোগের সুর থাকে। যন্ত্রণা থাকে। হেম-কল্যাণীর সম্পর্কেরই অন্য একটি অভিব্যক্তি হেমের বাবা-মার সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে তফাৎ এই যে, বাবার প্রতি মার আচরণে একটি চিরাচরিত অভ্যাসের দাসত্ব থাকে। বিবাহ নামক প্রথাটি সামাজিক আচার-আচরণের অঙ্গ মাত্র, একটি যথার্থ মানবিক সম্পর্কের প্রকাশ নয়। মার কথায় স্বামীর প্রতি তার প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ আর যন্ত্রণা থেকে যায়। হেম ও কল্যাণীর সম্পর্কে এই অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি না। নর-নারীর ওই চিরাচরিত অভ্যাসের সম্পর্ককে হেম স্বীকার করে না। তার কথাবার্তায় আর্তনাদ ভেঙে পড়ে। একটি মানুষের কণ্ঠস্বর, যার সমস্ত অস্তিত্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হেম তার সমগ্র অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে উন্মুখ। নৈরাজ্য বোধে ডুবে যাচ্ছে। মার সঙ্গে এ-ধরনের বাক্যালাপ যেমন কাহিনীর কাঠামোগত দিক, তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক

থেকেও যথোপযোগী। কাঠামোগত দিক থেকে, কারণ হেম চূড়ান্ত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, যেহেতু মা জন্মদাত্রী, আদি সত্য, যার কাছে ক্ষোভ, যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করা যায়। এই অর্থে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা মূলত মস্তিষ্কজাত, মানুষের সমস্যা নিয়ে বৌদ্ধিক আলাপচারিতা। মার সঙ্গে কথাবার্তার অব্যবহিত পরেই পিতার সঙ্গে সংলাপটি আসে। আমরা পূর্বেই এ-নিয়ে আলোচনা করেছি। পূর্ববর্তী পরবর্তী দুই প্রজন্মের সঙ্গে হেমের নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

একটি মানবিক প্রয়াস। শেষ একটি প্রচেষ্টা যা হেমকে একটা অবলম্বন দিতে পারে। অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পেতে পারে হেম। একটি সম্ভাবনা। কল্যাণী হঠাৎ যেন সজীব হয়ে ওঠে। তার বিগত জীবনের প্রেমাস্পদ, স্বাধীনতা-যোদ্ধা নির্মল, এক অজ পাড়াগাঁয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে। গয়না বিক্রি করে কল্যাণী তার পাশে দাঁড়াতে চায়। মৃত্যুপথযাত্রী নির্মলকে সাহচর্য দিতে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কল্যাণীর জীবনের এই অধ্যায়টি হেমের কাছে অপরিচিত ছিল। কল্যাণীর ভিন্ন এক রূপ দেখে সে বিস্মিত হয়। বনলতার কথা ভাবে, কল্যাণীর এই ভূমিকায় বনলতাকে দেখতে চেয়ে ভাবনাটির অসাড়তা উপলব্ধি করে। তার বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল হয়। কিন্তু কল্যাণীর প্রচেষ্টার সাফল্যে সে উদযোগী হয়। এখানে এক ধরনের মর্ষকামী প্রবণতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তার অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই প্রবণতার যেন একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। যোগসূত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু হেম ক্রমাগত নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছে, যদিও এই পথটি শেষ পর্যন্ত নির্বাসনের বলয়েই ফিরে আসে। আমরা অন্যভাবেও বিষয়টি দেখতে পারি। একটি সদর্থক দিক ; কল্যাণীকে একটি স্বাধীন মানুষ হিসাবে দেখার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি বাস্তবায়িত হয় না। কল্যাণী পরাজিত, সংসারের চিরাচরিত অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। একটি মানবিক প্রয়াসের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেল। হেমের স্মৃতির জগতটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ('হয়ত বনলতাও আজ এই রকম।') অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতবিহীন একটি পরম শূন্য অস্তিত্ব। শেষ অর্গলটি বন্ধ হয়ে যায়।

একটি দীর্ঘ-প্রলম্বিত প্রলাপ। মার সঙ্গে শেষ সংলাপটি অনিবার্যভাবেই আসে। হেমের কথাবার্তায় অভিযোগ ও তিক্ততার স্তর আর থাকে না। হেম যেন রোগশয্যায় শায়িত শিশু। অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তায় হেমের কলকাতা বাসের বৃত্তান্ত থাকে। কিন্তু এখানে তার প্রকৃত চিত্রটি আমরা পাচ্ছি। বাক্যের দ্বৈত চরিত্র এখানে নানান স্তরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

—'যদি যক্ষ্মা নিয়ে আসি, তা হলে তোমরা কী করবে।' হেমের আশঙ্কা, আসলে তার অন্তর্গত উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ।

—'মেজকাকার জন্য আজ লুচি ভাজবে না ?'

—'কেন ?'

– 'আমাকে একখানা দেবে ?'
শিশুসুলভ আবদার, হেম যেন শৈশবের নিশ্চয়তায় ফিরতে চায়।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলকাতা বাসের প্রকৃত চিত্র। বর্ণনাটি একটি দীর্ঘ মনোলগ। যেন রোগশয্যায় শায়িত হেমের প্রলাপ। শব্দের অভিঘাতে দুঃসহ একাকীত্ব আর শূন্যতাবোধ উঠে আসে। এখানে একটি ক্রমাগত হাঁটার উল্লেখ থাকে। হেম যেন অনন্তকাল ধরে অসীম শূন্যতায় হাঁটছে। তার আত্মহননের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। মার কাছে হেমের এই স্বীকারোক্তি তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু একমাত্র জন্মদাত্রীর কাছেই এরকম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা যায়। এতে একটি পরম সমাপ্তির দ্যোতনা থাকে। কিন্তু আত্মহনন 'দাঁড় ঝুলিয়ে' বা 'বিষ খেয়ে' নয়। 'সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে' এই রকম বাসনাটিতে থাকে হেমের অন্তিম প্রয়াস, অ-রূপের জগৎকে প্রত্যাখ্যান করার একটি দুঃসাহসিক অন্তিম বাসনা।

প্রাচীন দ্বীপটিতে একজন আগন্তুক। যদুনাথবাবু চিত্তবান পুরুষ, উদ্যম আর সাংসারিক সাফল্যে যার সহজাত বিচরণ। তিনি যেন মুক্তিদাতা। হেমকে তিনি নিষ্ক্রমণের নানা পথ বাতলাচ্ছেন। বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা তিনি অনায়াসে বলে ফেলেন। আবার দর্শনের কথাও বলেন, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ। 'ভগবান নির্বাণ দেন নি, দিয়েছেন স্মৃতি, ভালবাসা দিয়েছেন। সমুদ্রের মত আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু দেহটাকে তৈরি করেছেন দুই রত্তি ঘুণ দিয়ে', এই জাতীয় কথা। আমরা শব্দবাণে বিদ্ধ হই। রাশি রাশি বস্তুপুঞ্জ দ্বারা আক্রান্ত হই। আমরা অনুভব করি, হেমের প্রত্যাবর্তনের পথ, আমাদের রূপের জগতে ফিরে যাওয়ার পথ ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসছে, 'নির্বাসনের এক নিরন্ধ্র বলয়' আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব গ্রাস করে নিচ্ছে।

ইতিকথার পরের কথা। জীবনের অবসাদ আর স্থূলতা আত্মসাৎ করে হেম, জীবনানন্দ 'কারুবাসনা' লিখে ফেলেছেন। তিনি নির্মুক্ত হয়েছেন। গ্রিক পুরাণ-উক্ত ভাস্কর পেরিলেসের উপাখ্যানটি এখানে প্রাসঙ্গিক। এক স্বৈরাচারী শাসক পেরিলেসকে একটা ব্রোঞ্জের ষাঁড় নির্মাণ করতে আদেশ করে। পেরিলেস ষাঁড়টি নির্মাণ করেন। নির্মিত ষাঁড়ের ঠোঁটদুটোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব রেখে দেন। বিশেষত্বটি এই রকম : ব্রোঞ্জের ষাঁড়ের ফাঁপা পেটে একটি মানুষকে ঢুকিয়ে যখন তলায় আগুন দেওয়া হয় তখন ওই মরণোন্মুখ মানুষটির তীব্র আর্তনাদ ওই ঠোঁটদুটোর মধ্য দিয়ে সঙ্গীত হয়ে বেরিয়ে আসে যেন। বলাবাহুল্য, স্বৈরাচারী শাসক পেরিলেসকে দিয়েই প্রথম পরীক্ষাটি করে। পৃথিবীর অসুখের গভীরে থেকে শিল্পী যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর তার চিৎকার ক্রমাগত শিল্পের অপরূপ রূপ হয়ে যাচ্ছে। জীবন ও শিল্পের এই চিরন্তন সংঘাত।

'কারুবাসনা' উপন্যাসটি ১৯৩৩-এর আগস্ট মাসে রচিত। জীবনানন্দের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটিও দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত ছিল। বস্তুত কিছুকাল আগেও গদ্যকার জীবনানন্দের পরিচিতি পাঠকের কাছে ছিল না। সম্প্রতি দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় প্রতিক্ষণ প্রকাশনী জীবনানন্দের গদ্যের কয়েকটি খণ্ড বের করেছে। 'কারুবাসনা' উপন্যাসটি উক্ত সঙ্কলনের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু বেশির ভাগ পাঠকই উপন্যাসটি পড়েননি (অন্যদিকে এই নিবন্ধটি মূল উপন্যাস পাঠে পাঠককে উৎসাহিত করুক সেটাই একান্ত কামনা বলেও)। নিচে উক্ত উপন্যাস থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল। আমাদের আশা, ওই অংশটি থেকে পাঠকেরা জীবনানন্দের গদ্যরীতি এবং উপন্যাসটির ধরন কিছুটা ধরতে পারবেন। সঙ্গে অংশটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়াসও রইল। অংশটি 'প্রতিক্ষণ'-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

জীবনানন্দ দাশ প্রণীত কারুবাসনা উপন্যাস থেকে

...

খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।

ঘরের ভিতর বাবা এসে ঢুকেছেন।

—'খোকা'।

—'আমাকে ডাকছ বাবা?'

—'শুয়ে আছিস যে?'

—'এমনিই, তুমি কখন ইস্কুল থেকে এলে?'

—'অনেকক্ষণ।'

—'সাড়াশব্দ পাই নি তো।'

—'বারান্দায় বসে ছেলেদের এক্সসাইজ খাতা দেখছিলাম। তোর মা কোথায়?'

—'রান্নাঘরেই তো—'

—'তা হবে; দেখলাম এক থালা লুচি ভেজে সুরেশকে দিল; বিকেলে তুই খাস নি?'

—'না। তুমি?'

হেমের বাবা আসছেন। সহজ ও প্রাত্যহিক ঘটনা। উপস্থাপনার বিশেষত্বে তা মুহূর্তে হয়ে উঠছে বিশেষের প্রবেশ। পিতার প্রবেশ ('খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ')। এক, তাঁর অন্তর্মুখী, নিভৃত স্বভাবটি ব্যক্ত হচ্ছে। দুই, পরিবারে তাঁর ভূমিকা চিহ্নিত হচ্ছে। অন্ন যে জোগায় সেই সর্বময় কর্তা, তারই ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সংসার চলে, সংসারে এই জাতীয় ব্যবস্থা স্বাভাবিক মনে করা হয়। পিতার চরিত্রে এই ধরনের ভাবনার কোনও প্রতিফলন নেই। তাঁর চলাফেরায় কর্তৃত্ব-ফলানোর

—'আমি ঐ ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, একটু গুড় দিয়ে দিয়ে খেলাম। খাবি না কি ?'
—'আছে আরো ?'
—'ঢের আছে—'
বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন।
বাধা দিয়ে—'আচ্ছা আমিই নিয়ে আসব এখন, তুমি বসো।'
—'আচ্ছা বেশ'
একটু হাই তুলে 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাসনি ?'
—'হ্যাঁ পেয়েছি।'
—'তা হলে ঝাঁপ খুলে রেখেছিস কেন ?'
—'কী আর হবে ?'
—'জানলার জলের ছাট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজে যাচ্ছে যে।'
—'যাক। এমন কী আর বই ?'
—'কেন, কোনো ভাল বই নেই ?'
মাথা নেড়ে—'না।'
বাবা বললেন—'খানিকটা খুচরো চা এনেছি'।
—'মেজকাকার জন্য ?'
—'না, সুরেশ কি আর এই ছ-আনা পাউণ্ডের চা খাবে ?'
—'ছ-আনা বুঝি ?'
—'হ্যাঁ। চা খাবি ? তা খাওয়াই ভাল, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঠাণ্ডা লাগে, একটু গরম চা বেশ কাজ করে ; সর্দি-কাশি নষ্ট হয়, মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়। তোমার মাকে দিও, করে দেবে।'
—'তুমি খাবে না ?'
—'চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

সামান্যতম প্রবণতা দেখা যায় না। তিনি একমাত্র স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কে আস্থাশীল। প্রথম বাক্যটি থেকে ষষ্ঠ সংলাপ ('সাড়াশব্দ পাইনি তো') তাঁর আত্মগত, নীরব অস্তিত্ব প্রকাশ করছে।

তিন, একটি সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গ এখানে অনুভব করা যায়। যেন অতি মৃদুলয়ে একটি 'থিম' প্রবেশ করল, অনেকটা সিম্ফনির মুভমেন্টের মতো। প্রসঙ্গত, উপন্যাসের মূল ভাবের বিস্তার এই অংশে ঘটেছে। 'বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন'

—'নেই অবিশ্যি, কিন্তু—'

—'খেলে ঘুম হবে না যে রে।'

চায়ের মোড়কটা জীর্ণ-বিবর্ণ শাদা খদ্দরের কোটের পকেটের থেকে বের করে বাবা টেবিলের ওপর রাখলেন।

বললেন—'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'

—'একদিন গেলেই হয়।'

—'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল।'

—'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'

—'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মত হবে না।'

—'হবে না?' একটু হেসে, 'কী করে তুমি জানলে বাবা?'

—'আমার বিশ্বাস, তোমার মারও বিশ্বাস…'

একটু বিদ্রূপ করে হেসে বললাম, 'কী যেন বলছিলাম…'

বাবাকে আহত হতে দেখে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—'তোমার মেজকাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'চাকরি-বাকরির কথা?'

—'হ্যাঁ, হয়েছিল।'

—'কী বললেন?'

—'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, পরকালে হয় ত কপাল খুলে যাবে।' দু-এক মুহূর্ত বাবা শ্রীহীন, জীর্ণ, ক্ষীণ মুখে বসে রইলেন।

তারপরেই হো-হো করে হেসে—'ও, তা এই বুঝি বললে সুরেশ?'

—'হ্যাঁ।'

পিতা-পুত্রের সুন্দর একটি সম্পর্ক আমরা পাচ্ছি। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অধীনতার নয়, বরং বন্ধুত্বের। আবার পিতার উদার চরিত্রের একটি নিদর্শনও এখানে থাকে। 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাস নি' থেকে (মাথা নেড়ে—'না') হেমের বর্তমান মানসিক অবস্থা নির্দেশিত করছে। সবকিছুর প্রতি অনীহা তাকে স্থবিরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'চা খাবি? ….. মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়'—পিতার এই কথাটি উল্লেখযোগ্য। এতে পিতার একটি রুচিশীল, সংস্কৃত

—'মন্দ বলে নি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'
—'আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'
—'পারলে না?'
—'মৃত্যুর পর কী আর থাকে?'
—'থাকে বই কি; সমস্তই থাকে: আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের—'
—'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেন নি তো; রক্ত মাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে—ধারণা তাদের ভাল লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।'
—'এক দিন হয় ত দেখবে।'
—'আশীর্বাদ করো, দেখতে পারি যেন।'
—'নিজের মনের আন্তরিক অনুসন্ধানে যা সত্য বোধ হয় সেই টেঁকে; বিশ্বাস করো এই আশীর্বাদ করি।'
—'তা হলে হয় ত চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।'
—'থেকো।'
—'ভাবতে গেলে তোমার দুঃখ করে না বাবা?'
—'কী দুঃখ? একে-একে যে দুই হয় এ-কথা যদি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, আমার বুদ্ধি-বিচার কল্পনা সমস্তই যদি সাব্যস্ত করে যে তিন হয়— তা হলে এই অন্ধতার অভিশাপ বুকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে; এ অভিশাপ মোচন করবার শক্তি আমার নেই। কোনো মানুষের নেই— বিধাতা যদি দয়া করে আলো দেন তবেই তা ঘুচতে পারে।' শাদা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাবা বললেন—'কিন্তু এটা মনে করো না হেম, যে একে-একে তিন হয়, দুই হয় না। এই ভুল ধারণা নিয়ে তুমি জীবন চালাচ্ছ। হয় তো আমার এ ভগবানে বিশ্বাস, পরলোকে ঐকান্তিক আস্থা, সেই সব ভুল; জীবন-মৃত্যুতে আমিই ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম।' বলে শাদা গোঁফে হাত

মন প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু উদর-পূর্তি নয়, মানুষের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন মূলত তার মনকে সজীব রাখতে। এই প্রসঙ্গে আমরা মেজকাকার কথা স্মরণ করতে পারি। তার ভোজনবিলাস আদতে এই সমাজের লোভী, ভোগবাদসর্বস্ব মনের পরিচয় দেয়। এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখক সূক্ষ্মভাবে রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বটি নির্মাণ করছেন। বলা বাহুল্য, এই নির্মাণে অন্যান্য উপাদানও ব্যবহৃত হয়েছে। 'খানিকটা খুচরো চা এনেছি' থেকে 'খেলে ঘুম হবে না যে রে' পুত্রের প্রতি

বুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবার।

বললেন 'যাক্ দু-তিন বছরের মধ্যেই বুঝতে পারব সব।'

চোখ তুলে তাকালাম বাবার দিকে।

—'ভগবান ও শান্তির দিকেই যাচ্ছি, এই ভেবে মরব।'

—'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বাবা বললেন — 'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি নিও না।'

—'কেন ?'

—'হেড মাস্টার হয় ত সামান্য বি. এ. পাশ, ফাস্ট ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশে ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আর তোমাকে দেওয়া হবে ভূগোল আর অংক পড়াতে। এ সব অবিচার চোখ বুজে ক্ষমা করে দেবার মত কোনো প্রয়োজন দেখি না আমি।'

চুপ করে ছিলাম।

—'হ্যারিসন রোডের মেসে যদি থাকো তা হলে উল্টাডিঙ্গি, ঢাকুরিয়া বা চেতলা-ফেতলায় কোনো টিউশন নিতে যেও না।'

—'নেব না ?'

—'না'

—'কেন ?'

—'এ সম্বন্ধে আমার মতামত খুব ভাল করেই জানো। হয় তো কুড়ি টাকা-পঁচিশ টাকা দেবে তোমাকে, কিম্বা আরো কমই দেবে হয় ত, জীবনে টাকার মুখ তুমিও কম দেখেছ, সে ট্রেন ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার অন্তঃকরণ খেঁকিয়ে উঠবে একেবারে। এ বড় দীনতার কথা, মানুষ এতে বড় খাটো হয়, বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাবে সেই উল্টাডিঙ্গি, পায়ে হেঁটে ফিরবে আবার ; শরীরের দিক দিয়ে এর ভেতর যত না কষ্ট, আত্মার দিক দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি অপচয় ; কেন এ অপচয় করবে তুমি ?'

পিতার গভীর স্নেহ প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে তিনি যেন কুণ্ঠিত। আবার সংসার দ্বারা বঞ্চিত পুত্রের প্রতি সহানুভূতিও থাকে। পুত্রের জন্যই তিনি যে চা এনেছেন এটা স্পষ্ট, যেহেতু তিনি নিজে চা পান করেন না। অংশটির এই পর্যায় অবধি খুচরো কিছু কথার বিনিময়ে পিতা-পুত্রের গভীর সম্পর্ক বর্ণিত হয়ে যায়। 'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি' থেকে '—পরকালে হয়তো কপাল খুলবে' একটি বাস্তব সমস্যার উত্থাপন। হেমের জীবিকার সমস্যা। এই

একটু চুপ থেকে হেসে—'তা না-হলে কী করব ?'
—'তা তুমি জান, আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে। কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিশ করো না তুমি ; বেদনা ও সংকীর্ণতা এক জিনিশ নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার ; কী আর করবে ? পনের টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি।'
হাসছিলাম।
বাবা বললেন—শকুন ; কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে দশ টাকা-পনের টাকার টিউশন এর জন্য যারা চেতলা-উল্টোডাঙা পাড়ি দেয় তাদের দলে ভর্তি না হলে কলকাতায় যুদ্ধ যে আজকাল চলে না বাবা কি তা জানেন ? দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে ?
বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না ?'
—'খাই'
—'দোকান থেকে ?'
—'হ্যাঁ'
—'বৌমার ঘরে একটা স্পিরিটের স্টোভ পড়ে আছে, খুকি হবার সময় কেনা হয়েছিল, সেইটে নিয়ে নেও।'
—'আচ্ছা'
—'এক বোতল স্পিরিট কিনে নেবে—খানিকটা খুচরো চা, নিজে তৈরি করে খাবে।'
—'তা খাওয়া যায়।'
—'আর খানিকটা বাতাসা, চা-র সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে কী করো ?'
—'যদি টিউশন থাকে তো ছেলে পড়াতে যাই।'

বিষয়ে হেমের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। 'কী করে জানলে বাবা' হেমের এই কথায় তার কলকাতায় জীবিকার্জনের ব্যর্থ অভিজ্ঞতা, ফলত তার চূড়ান্ত নৈরাশ্যবাদের, নির্দেশ থাকে। আবার কথাটি পিতার বিশ্বাসী জগৎকেই প্রশ্ন করছে। 'মিরাকল' কিছু ঘটে না, সংসার এমনই স্থূল, বাস্তব। 'পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি' থেকে 'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর' পিতা-পুত্রের দুটি ভিন্ন জগতের চিত্র। 'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন···তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনও কারণ দেখি

—'আর যদি না-থাকে ?'

—'তা হলে ফুটপাথে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে, ওল্ড বুক শপের দু-চারখানা বই নেড়ে দেখি, এক-একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবার হাঁটি, চায়ের দোকানের খবরের কাগজ নিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

—'বাঃ, এ সব কি মানুষের ভাল লাগে ?'

—'না, আগে ভাল লাগত না একদম, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তালিম হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু তবুও এ ত সত্যিকারের জীবন নয়।'

—'তা হয় ত নয় আমার কি ইচ্ছে করে জানো ?'

বাবা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম— 'মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকি ; পাশে মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী। পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না, দিন রাত লিখি আর পড়ি। দিগন্তবিস্তৃত সোনালি খড়ের মাঠের কিনারে বেড়াই, লাল আকাশ ভেঙে সন্ধ্যার দাঁড়কাকগুলোকে ঘরে ফিরে চলে যেতে দেখি।'

বাবা চুপ করেছিলেন।

বললাম— 'কিন্তু এ হয় ত শখ হল, পলায়ন হল, জীবন হল না। জীবন হয়ত ভিড়ের মধ্যে মিশে যা করতে ইচ্ছা করে না, ভাবতে ভাল লাগে না, সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

বাবা এ-সব কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললেন— 'কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই ?'

—'বছরের পর বছর ক্রমেই কমে যাচ্ছে।'

—'কেন ?'

—'মতিগতির পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে হয় ত—'

না'—মানুষের একটি মূল সমস্যা এখানে ব্যক্ত হচ্ছে। এই জাতীয় বিশ্বাস মানুষকে গভীর জীবনের পথ দেখাতে পারে কি না হেমের যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়। ফলত হেম তার ব্যক্তি-সত্তা নিয়েই জগতের মুখোমুখি হয়। 'জীবন-মৃত্যুতে আমিই ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম'—পিতার মনেও সংশয়ের বীজ থাকে। '…মরে জেগে উঠব না আর'—মৃত্যু সব কিছুর চরম সমাপ্তি। ফলত মানুষ ঈশ্বরবিহীন এই পৃথিবীতে নির্বাসিত। হেমের কণ্ঠে আমরা তার আর্তনাদ শুনতে পাই যেন।

বাবা একটু চুপ থেকে— 'তারা হয় তো সাংসারিক সফলতা লাভ করছে।'
'হ্যাঁ, কেউ করেছে, কেউ চেষ্টায় আছে।'
—'যাদের সঙ্গে থাকতে, কলেজে পড়তে, তারা আজ ট্রামে করে সেক্রেটারিয়েটে যায় আর তুমি ঘোরো ফুটপাথে ?'
—'অনেকটা তাই।'
—'অবিশ্যি এতে ব্যথা পাবারই তো কথা—'
—'না, সেক্রেটারিয়েট আর এমন-কী জিনিশ, সেখানে ঢুকতে না পেরে খুব বঞ্চিত হলাম এ-কথা অবিশ্যি মনে করি না।'
—'নিজের মনকে হয় ত সান্ত্বনা দাও এই ভেবে যে এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের বড় জিনিশ। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ ; হয় ত কোনো এক ভবিষ্যতে সেখানে সে নেতা হয়ে বসবে।'
—'না অতদূর ভাবি না।'
—'খানিকটা ভাবো নিশ্চয়ই ; ভাবাই স্বাভাবিক। জীবনের আরাম ও বিলাসের জিনিশ-গুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, অবশেষে তারা ত্যাগ ও মহিমার অকৃত্রিম ভক্ত হয়ে ওঠে, না-হলে দাঁড়াবে কোথায়, বলো ? ঐশ্বর্য যাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করে, ঐকান্তিক অশ্রু দিয়ে ত্যাগকে পূজা করবার শক্তি তার যেমন হয়, আর কারু তেমন হয় না।'
—'কই, কংগ্রেসে আমি যাই নি তো !'
—'যাবার দরকার করে না তো ; অনেক দিন থেকেই তোমার হৃদয়ে দেশপ্রেমের আসন পেতে রেখেছ হয় ত ; সে আসন সব সময়ই চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এক-এক সময় পড়ে, যখন কলেজের বন্ধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে মোটর চালিয়ে ছুটছে আর তুমি পথের বেকার ; যখন ছেলেবেলার খেলার সাথি তার মেমসাহেবকে নিয়ে বক্সে বসেছে আর তুমি চার আনার সিটে মাথা গুঁজে আছ।'
একটু চুপ থেকে— 'দেশ, কংগ্রেস, দেশবন্ধু, বিরাট আত্মত্যাগ, অপরিমেয় স্বদেশপ্রেম

পৃথিবীতে যন্ত্রণাভোগের কোনও কার্যকারণ নেই। এই যন্ত্রণা-ভোগই শেষ কথা, পরলোকে শান্তি পাবার আর কোনো পথ খোলা রইল না। মানুষ অভিশপ্ত, যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতেই হবে— এই অভিশাপ। 'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি নিও না' থেকে '…দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে ?' হেমের পিতা যন্ত্রণার কথা বোঝেন, হেমের বেদনা উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি হেমকে মানুষের জীবনযাত্রার মূল কথাটি বলেন। বস্তুত তিনি একটি আদর্শ জীবনের কথাই বলছেন, যেটা

— এই সবের কথা তখন মানুষের চিত্তকে সজীব করে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।'
গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন,— 'পৃথিবীতে টিঁকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিঁকে থাকবার এই রকম সব বিধি ব্যবস্থা আছে। এ-সব না-থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড় ভয়াবহভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এ-সবের ঢের মূল্য আছে।' একটু চুপ থেকে বাবা—'বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর-এক ভাবে— জীবনের সঞ্চারিত পথ ও ভগবান কিংবা ভবিতব্যতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার আসে নি। এখনো দেশের মাটি, কংগ্রেস, কবিতা ও সাহিত্যের মর্যাদা, সাহিত্য স্বপ্ন, অবাস্তববাদ এই সব মোহকে আশ্রয় করেই ফুটপাথে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে।'
—'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি।'
— 'করো ?'
—'মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে— সত্তর হয় নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে ; কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, তখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনদিনও ফুরোয় না যেন আর।'
—'আর কী-রকম চিন্তা করো ?'
চুপ করেছিলাম।
—'এই সৃষ্টিটাকে একটা পাখির খাঁচার মত তৈরি করে নিতে পারা যায়, তখন মানুষের অবস্থা বড় ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমার অনেক সময় মনে হয় জীবনটা কলে ধরা ইঁদুরের মত। যেন চারদিকে শিক আর শিকল শুধু— না আছে রূপ না আছে ফুর্তি—'
বাবা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বললেন— 'দুপুরবেলা কী করো ? মেসে থাকো ?'
—'আগে থাকতাম না, আগে বড় নির্বোধ ছিলাম।'

নষ্ট হয়ে গেছে, চিরতরে হারিয়ে গেছে। এই অর্থে তার অস্তিত্ব 'অবাস্তব' অপ্রয়োজনীয়। 'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না' থেকে 'আর খানিকটা বাতাসা, চা-র সঙ্গে' হেম যেন তার পিতার কাছে শিশু, অসহায় শিশুটিকে তিনি যেন বাইরের পৃথিবী থেকে আগলে রাখতে চান। 'সন্ধ্যার দিকে কী করো ?' থেকে '…সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা' হেমের শিল্পী-সত্তার বাস্তব চিত্রটি পাচ্ছি। লেখকের ভাবনার একটি প্রধানতম দিকও এখানে থাকে। 'মস্ত বড় একটা মাঠের

—'কী রকম ?'

—'মেসের বিছানায় একা-একা শুয়ে থাকতে বড় খারাপ লাগত।'

—'একা-একা ?'

—'হ্যাঁ। সবাই অফিসে চলে যায় ; অফিসারদের মেস, সকলেই কোথাও-না-কোথাও কাজ করে—জীবনের জবাবদিহি দেয়, জীবনের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। এই সব অনেক দিন ভেবে-ভেবে বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারি না আমি আর। মনে হত বেড়িয়ে গেলে আমিও হয় ত সৃষ্টির কাছে নিজের জীবনের কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ বের করে নিতে পারব।'

—'কিন্তু আজকাল বেরোও না বুঝি আর ?'

—'নাঃ,' একটু হেসে বললাম, 'অবাক হয়ে ভাবি, জীবনের চার-পাঁচটা বছর ধরে সমস্তটা দুপুর কলকাতা শহরের কত জায়গায় টো-টো করে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স অফিসগুলো। এক-একটা জায়গায় পনের-বিশ বার করেও গিয়েছি। নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের একজন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয়, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের করলে হয় না। এই চার বছর যদি আমি এক মনে শিল্পসৃষ্টি করতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

—'যাক, চার বছর ঘুরেছ ভালই করেছ ; না-যদি ঘুরতে তা হলে হয় ত মনে করতে কতকগুলো অসার কবিতা লিখে রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল।

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন— 'আমাদের মন এই রকমই কেমন যেন রহস্যের জিনিশ।'

একটু চুপ থেকে— 'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো ?'

—'খবরের কাগজ পড়ি।'

—'খবরের কাগজ আর-কতক্ষণ পড়া যায় ?'

মধ্যে কুঁড়ে ঘর···ফিরে চলে যেতে দেখি'—হেমের এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রাচীন ও অন্তর্নিহিত বাসনা। সভ্যতা এই সহজাত ধর্মকে বিনষ্ট করেছে। 'কলকাতায় তোমার কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই' থেকে···'ফুটপাথে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে' হেমের পিতা মানুষের জীবনপ্রণালীর প্রচলিত সব রীতিকে প্রশ্ন করছে। আবার দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মানুষের তথাকথিত মহৎগুণকে তিনি আদতে বেঁচে থাকার কতগুলি বাহ্যিক অবলম্বন মনে করছেন। এখানে লেখকের কণ্ঠস্বরটি স্পষ্ট।

—'বোর্ডাররা প্রায় চার-পাঁচখানা খবরের কাগজ রাখে।'
—'পড়বার ভার দিয়ে যায় তোমার উপর ?'
—'পড়তে মন্দ লাগে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'
—'এই তো রচনার কথা বলছিলে, কিন্তু লেখোটেখো না কেন ?'
—'লিখতে চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।'
—'তারপর ?'
—'পেরে উঠি না—'
—'কেন ? দুপুরবেলা মেস তো বেশ নিরিবিলি।'
—'কবিতা লেখার ওপর আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।'
—'কেন ?'
—'মানুষের জীবন নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে স্থূল হয়ে পড়ে যেন— অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন···।' একটু চুপ থেকে— 'নবপর্যায়ের কবিতা লিখবার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে-ধীরে আত্মসাৎ করে এর [অংশ] হওয়া দরকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হয়েছে, যা হয় নি সেই কথা ভেবে-ভেবে, জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি।'
দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।
—'তা হলে নবপর্যায়ের কবিতা লিখবে তো ?'
—'হ্যাঁ লিখব বই কি ?'
—'হ্যাঁ, লিখো, একটা কিছুতে বিশ্বাস রেখো', বাবা বললেন, 'লাইব্রেরি থেকে বই এনে দুপুর বেলাটা পড়ো।'
—'আচ্ছা।'
—'খবরের কাগজ বিশেষ পড়তে যেও না, এই রকম হতাশ পরিশ্রমের কাজ মানুষের জীবনে আর দ্বিতীয়টি নেই।'
বললেন—'লাইব্রেরি থেকে কী বই এনে পড়বে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অধিকার আজ

তিনি মানুষের অস্তিত্বকে মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখাতে চাচ্ছেন। 'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি' থেকে '···রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল' হেম শূন্যতাবোধে ডুবে গেছে। জীবনধারণের ক্লান্তিতে সে এখন অনন্ত ঘুমের আয়োজন করে অর্থাৎ সে চেতনাকে লুপ্ত করতে চাইছে, যেহেতু চেতনা কেবল যন্ত্রণাই দেয়, কেবল শূন্যতাই সৃষ্টি করে। মাত্র চৌত্রিশ বছরের জীবন যেন এক অতিদীর্ঘ জীবন। কোনও কিছুর আশায় বসে থাকা নেই, কোনও কিছু আবিষ্কৃত হওয়ার

আমার নেই ; যে-বই রুচিতে ধরে, তাই পড়ো। কিন্তু লাইব্রেরিটা যেন উঁচু জাতের হয়, যেমনটি ধরো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি।' একটু চুপ থেকে— 'এতদিন ধরে তুমি যা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছ, তোমার যা শক্তি ও বিচার আছে, তাতে এ-সব লাইব্রেরির থেকে বই পড়বার অধিকার পেলে নিজের চিন্তা বা কল্পনার অপব্যবহার করবে না তুমি—এই আমি আশা করি', — বলে উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকালেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে তার পর বলতে লাগলেন— 'আমাদের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেসে একা ঘরে তুমি দুপুরবেলাটা কাটাবে— যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, জীবনে কোনো নিকট সফলতা নেই হয় ত, যারা অনেক দিন ধরে সংসারের কাছে বিড়ম্বিত হয়ে আসছে, যাদের হৃদয় শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক স্থূল নয় কিন্তু সত্যিই খুব কুণ্ঠিত, নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চিত করবার শক্তি যাদের ঢের কম, আত্মপীড়িত করবার শক্তি খুব বেশি— এই দুপুরবেলার সময়টা তাদের কাছে কত যে যন্ত্রণার জিনিশ হতে পারে আমি তা খুব গভীরভাবেই বুঝি।'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে শেষে বললেন, 'কিন্তু তবুও কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি, তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতিত করতে যেও না, তোমার চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায় অহরহই এই জিনিশ দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে বলে নিজের মনের স্থৈর্য নষ্ট করে বসো না, উত্তেজিত হয়ে সময়ে-অসময়ে ফুটপাথে ঘুরে মরো না ; কাজকর্মহীন লোকের পক্ষে কলকাতায় থাকা একটা বিড়ম্বনা। ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয় ; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে। নিজের শক্তি ও রুচির পরিমাপ খুব গভীরভাবে বিচার করে

নেই, এমনি একটি সমাপ্তির ভাব। 'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো ?' থেকে '…তাকিয়ে-তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি' শিল্প ও জীবনের দ্বন্দ্ব। একই সঙ্গে শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিও এখানে বলা হচ্ছে। এক অনন্ত পর্যবেক্ষণ। 'তাহলে নব পর্যায়ের কবিতা লিখবে তো ?' থেকে '…সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো' হেমের পিতা নয় যেন পরমপিতা। হেমকে আত্মগত হতে বলছেন। জীবনের গভীর সত্যের কথা বলছেন। 'খবরের কাগজ…আর দ্বিতীয়টি নেই'—সংবাদপত্র

ঠিক করে নিও। নিজেকে যে-পথের উপযুক্ত মনে করো বস্তুনিষ্ঠ হয়ে সেই পথেই চলো। জীবনে আশা, আশাভঙ্গ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরিণামের হিশেবে অবহিত থেকে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাবাকে আমি বললাম—'দেখেছ বাবা, কী রকম বৃষ্টি পড়ছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'দেশের এই বর্ষাকে জীবনের সত্তর বছর বসেই তো দেখলে।'

—'দেখলাম।'

—'পাড়াগাঁয়ের এই বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষত এমনি রাতের বেলা।'

—'বেশ জিনিশ।'

মনে-মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ-ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল, জাম, তেতুল ও কাঁঠালের ঠান্ডা ডালপালার অবিরাম শব্দ, কোনো তিমিরচারিণীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে প্রেতজীবনের প্রতিধ্বনির মত দু-তিনটি দাঁড়কাকের অবশ বিহ্বল কলরব।

—'তুমি শুয়ে পড়েছ বাবা?'

—'না।'

—'কী করছ?'

—'না, একটু আলো জ্বালিয়ে পড়ছি।'

—'রাতের বেলা পড়ো না, তোমার তো ক্যাটারেক্ট।'

বাবা একটু হেসে, 'তেমন সিরিয়াস ক্যাটারেক্ট তো নয়। ভগবান শিগগির অন্ধ করবেন বলে মনে হয় না।' একটু চুপ থেকে—'এই রাতে আলোতে চোখে তেমন খোঁচা লাগে না তো।' আরো খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'অবশ্য নীল চশমাটা পরেছি, চোখে বেশ আরাম লাগে।'

...

সম্পর্কে এ সকল কথা আজ ফলে গেছে, স্কুলের ছাত্রের সময়ের স্কেল নয়, বন্ধ্যা সময়ের শাসক সংবাদপত্র। এখানে আদতে কোনো স্কেলই নেই। সীমা অতিক্রমকারী সময়। এক সময়হীন সময়। 'সফলতা', 'ব্যর্থতা' প্রসঙ্গটি এখানে থাকে। হেমের পিতার কথায় এই দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণ অর্থ পায়। বস্তুত, তিনি চিরাচরিত সফলতার ধারণাটিকেই অস্বীকার করছেন। এইভাবে হেমের পিতা উপন্যাসের চিন্তার সামগ্রিক কাঠামোয় একটি প্রধান স্তম্ভ হয়ে যায়।□

কল্যাণ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ : দেরিদা

১

দেরিদা বিষয়ে কোনো কিছু বলার প্রধান সমস্যা হচ্ছে তাঁর বিস্তৃত প্রভাব, বিভিন্ন রুচির পাঠক মহলে তাঁর বক্তব্যের প্রবল অভিঘাত। শুধুমাত্র দার্শনিকের কাছেই নয়, তাঁর আবেদন সাহিত্যিক মহলেও সমানভাবে পেঁছে গেছে। সুতরাং দেরিদা সম্পর্কে যে কোনো আদর্শ উপস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে দার্শনিক অথবা সাহিত্য সমালোচকের বিভিন্ন প্রবণতা বা মানসিকতা সেখানে সমভাবে আশ্রয় পায়। এই কাজ নিঃসন্দেহে খুবই দুরূহ। ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ে আরও একটি কারণে। সাহিত্য সমালোচকরা দেরিদাকে ততটুকুই ব্যবহার করেন যতটুকু তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য বা প্রবণতার সঙ্গে খাপ খায়। এঁরা দেরিদাকে সংস্থাপিত করেন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম-এর পটভূমিকায় এবং তিনি যে দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে বিভাজন রেখাটি তুলে দিয়েছেন— এই কথাই বারবার জোর দিয়ে বলতে ভালবাসেন। ফলে এঁদের আলোচনার কুহকে আমরা ক্রমশই ভুলতে থাকি, দেরিদা প্রথমত এবং প্রধানত একজন দার্শনিক। শিথিল অর্থে নয়, যথার্থ অর্থে। শুধু মেটাফর বা শুধু ভাষার মোহিনী মায়া নয়—তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ক্রমশই পরিস্ফুট হতে থাকে সুশৃংখল ও যুক্তিনির্ভর এক ধারণাগত কাঠামো। অন্যদিকে কোনো দার্শনিকের দেরিদা রূপায়ণ এতই বিমূর্ত ও গগনবিহারী যে সাহিত্যিক-মহল সেখানে ডানা মেলতে পারে না। ফলে দেরিদার দর্শনের মূলকেন্দ্রে এই মহল সঠিকভাবে পেঁছতে পারে না।

এইসব অসুবিধের কথা স্মরণ রেখে আমাদের বেটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত তা হচ্ছে দেরিদার দর্শনকে যথার্থভাবে তুলে ধরা। কিন্তু এই কাজের প্রধান অন্তরায় দেরিদা নিজেই। তাঁর বক্তব্যের দার্শনিক অবয়বটি ঢাকা পড়ে যায় ভাষার বিচিত্র ও জটিল প্রয়োগের আড়ালে। এমন এক ভাষা যা কোনো অর্থেই সাধারণ নয়, যেখানে নানা ব্যঞ্জনা, বিন্যাস, সংকেত, নানা সূক্ষ্মতার চমক, নানা শ্রাবন্তীর কারুকাজ ; এমন এক ভাষা যেখানে মেটাফর ও প্যারাডক্সের সমন্বয়— যার মধ্য দিয়ে আমাদের অতিপরিচিত সাধারণ পৃথিবীর মুখ দেখা যায় না। দেরিদা ভাষার সেই নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করেন, দার্শনিকরা বৌদ্ধিক কারণে যা বাতিল

করেন। ভাষার যে খেলায় তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন, প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলি সেখানে প্রশ্রয় পায় না। তাঁর বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ তর্কশাস্ত্রসম্মত; কিন্তু ভাষার এক বিশেষ বিস্তার ও সম্প্রসারণের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের প্রচলিত দার্শনিক ধারণার সীমানা থেকে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু দেরিদার ভাষা প্রয়োগের এই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে আমরা অস্বস্তি বোধ করলেও এর যে কোনো মূল্য নেই এমন কথা বলা ঠিক হবে না। ভাষার এমন এক নিগূঢ় জটিল বিন্যাসের সঙ্গে ভিটগেনস্টাইনের পাঠকও সুপরিচিত। দার্শনিক ফিন্ডলের ভাষায়, এই 'magic of stylistic talkingness' প্রচলিত দার্শনিক ধারণার সংস্কার আলগা করে দিয়ে এক নতুন দিগন্তে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, দর্শনকে দেখায় নতুন আঙ্গিকে, পরিচিতের মধ্যে তুলে আনে অন্য এক পরিচয়।

সংক্ষেপে এই-ই হচ্ছে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন বা অবনির্মিতির কাজ। এটি দর্শনের এক বিশেষ পদ্ধতি যার প্রয়োগ জগতের উপর নয়, দর্শনের উপর। দর্শনের বিষয় জগৎ-চিন্তা, জগৎ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল বৌদ্ধিক রূপায়ণ। এর জন্য নানা বিচার বিশ্লেষণ, নানা নির্মাণ। কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই। যা মেনে নিয়েছি বিনা বিচারে তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা। কোনো কিছু সম্ভব হয় কী করে—দার্শনিক যখন এই প্রশ্ন তোলেন তখন তার উত্তরের সূত্র ধরে আমরা উত্তীর্ণ হই অতি চেনা দৈনন্দিনতার অন্ধ অভ্যাস থেকে দূরে অন্য এক নতুন, অপরিচিত মাত্রায়। এই চেনার মধ্যে অচেনাকে তুলে ধরা—এই পরিক্রমায় অবশ্য দর্শন নিঃসঙ্গ নয়, কবিতাও তার সহযাত্রী। তবু কবিতা ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মূল প্রভেদ সর্বদাই থেকে যায়। দর্শন বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত, কবিতার বিশিষ্ট আবেগ ও অনুভবের দ্বারা সংক্রামিত নয়। বলা বাহুল্য যে দর্শনের কথা আমরা বলছি, দার্শনিক রর্টির ভাষায় তা হচ্ছে edifying philosophy : যার কাজ জগৎ সম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত ভাবনা বা সংস্কারই যে শেষ কথা নয়, বস্তুত জগৎ-সম্পর্কিত যে কোনো ভাবনার মধ্যেই যে একটা অনিবার্য ফাঁক থেকে যায়—সেই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। একেই আমরা বলব ডিকনস্ট্রাকশন বা অবনির্মিতি। এই ডিকনস্ট্রাকশন দর্শন যা জগৎ-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, দেরিদা প্রয়োগ করেন দর্শনের উপর। তাই তাঁর অবনির্মিতি প্রাণ পায় দর্শনের প্রতি এক সুতীব্র মানসিকতায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন দর্শনের প্রচলিত রীতি, প্রচলিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে। দেরিদার এই দর্শনের বিরুদ্ধগামী ডিকনস্ট্রাকশন রীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভিটগেনস্টাইনের সেই মানুষদের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা যারা 'normally react to the gesture of pointing with the hand by looking in the direction of the line from finger-tip to wrist, not from wrist to finger-tip'

(Philosophical Investigations 185, Zettel 317 দ্রষ্টব্য)। এই অদ্ভুত ও অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে ভিটগেনস্টাইনও দেরিদার মতোই আমাদের অভ্যস্ত দার্শনিক ব্যবহারের উপর প্রশ্ন তোলেন। এই প্রচলিত দার্শনিক ধারার মধ্যে যারা লালিত তাদের কাছে দেরিদার এই পদ্ধতি এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। কিন্তু এর জন্য দেরিদা দায়ী নন। দায়ী আমাদের উপযুক্ত মানসিক প্রসারতার অভাব। যদি থাকে সেই প্রসারতা, সেই ঔদার্য, যদি মুক্ত হতে পারি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দৃঢ়মূল অভ্যাসের দাসত্ব থেকে তবে আমরা ধরতে পারি দেরিদার বক্তব্য, পৌঁছতে পারি সেই সত্যের কাছে যা দেরিদা আমাদের কাছে উন্মুক্ত করতে চান।

এবার দেরিদার এই অবনির্মিতির বিশিষ্ট সংস্থানের দিকে একটু তাকানো যাক। তাঁর অবনির্মিতি এক বিশেষ পঠন রীতি : বিষয়বস্তু দর্শন বিষয়ক টেক্সট। এই টেক্সট বলতে বোঝায় পাশ্চাত্য দর্শনের সমগ্র ধারা— যে প্রবাহ প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে হুসার্ল, হাইডেগার পর্যন্ত বিস্তারিত, যে প্রবাহ তৈরি করেছে 'One great discourse' (Margins, পৃ. 177)। এই পঠনরীতি পথ খুঁজে নেয় একটি দার্শনিক টেক্সট থেকে অন্য দার্শনিক টেক্সটে এবং প্রতিটি টেক্সটের মধ্যে যে significant structure শরীরী হয়ে উঠেছে তুলে ধরে তার অসম্পূর্ণতার ফাঁক। এই কারণে অবনির্মিতিকে বলা যায় 'radical incompleteness thesis'। কথাটি অন্যভাবেও বলা যায়। ডিকনস্ট্রাকশনের পঠনরীতি বা ভাষ্য সাধারণ-ভাষ্য থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ অর্থে interpretation বা ভাষ্যের কাজ একটি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সত্য বা অর্থ বিশদ করে তুলে ধরা, তুলে ধরা গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য বা প্রেরণা, তাঁর বিশেষ অভিপ্রায়। কিন্তু ডিকনস্ট্রাকশন এর থেকে স্বতন্ত্র। কোনো গ্রন্থের মূল বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছনো এর উদ্দেশ্য নয়; এটা নয়, ওটা : কোনো গ্রন্থের এই দ্বিধাহীন, নিশ্চিত ও অনড় সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পরিকল্পনা যে কত ভঙ্গুর তা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। দর্শনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সিদ্ধান্ত, রীতি ও বিশ্বাসের মধ্যে অসম্পূর্ণতার ব্যবধান অনাবৃত করাই অবনির্মিতির লক্ষ্য। এই অর্থে দেরিদার অবনির্মিতিবাদ দর্শনের প্যারাসাইট : দার্শনিক ঐতিহ্যের আশ্রয়ে সে পল্লবিত হয়। একমাত্র দর্শনের প্রসঙ্গে, কিন্তু দর্শনের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই অবনির্মিতিকে বোঝা যায়।

এই অবনির্মিতির সাধারণ চরিত্র দেরিদা নিজেই উদ্ঘাটিত করেছেন এইভাবে। তিনি তিনটি স্তর বা পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। (১) যে কোনো টেক্সটেই লক্ষ করা যায় দুটি ক্রম বা প্রত্যয়ের মধ্যে এক অসম দ্বন্দ্ব এবং এর মধ্যে একটি প্রত্যয়কে প্রাধান্য দেবার ঝোঁক। প্রথম পর্যায়ে অবনির্মিতির কাজ এই দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্যের চিহ্নিতকরণ।

(২) দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায়ে অবনির্মিত এই প্রাধান্যের মোড় উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে যেটিকে কোনো টেক্সটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার গৌরব খর্ব করে অবহেলিত বিরোধী প্রত্যয়ের মহিমা তুলে ধরা হয়। (৩) এবং তাকে দেওয়া হয় এমন এক নবতর ব্যঞ্জনা যার ফলে টেক্সটে যে মৌলিক সংঘাতের কথা ছিল তার শিকড় শিথিল হয়ে পড়ে। (Positions দ্রষ্টব্য)!

২

এই পদ্ধতি দেরিদার পঠনপ্রণালীতে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেখা যাক। দেরিদার বিরুদ্ধে একটি বহু প্রচলিত ধারণা অথবা অভিযোগ আছে। তা হচ্ছে এই, তিনি তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ ব্যাখ্যায় নির্বিচার, অযৌক্তিক স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই অভিযোগ যে কত অসার দেরিদার যে কোনো পাঠকই তা জানেন। তিনি জানেন, হুসার্ল, রুশো অথবা অস্টিনের বিভিন্ন রচনার গ্রন্থিমোচনে দেরিদা কত সনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত। দেরিদা সমস্ত গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করেছেন ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। তাঁর মতে এ ছাড়া কোনো দার্শনিক বক্তব্যই বোঝা যায় না। ('It is a mistake to believe in the ahistorical legibility of a philosophical argument'. Margins, পৃ. 188, Alan Bass-এর ইংরেজি অনুবাদ)। তাই তাঁর যে কোনো গ্রন্থভাষ্যে আমরা পরিচয় পেয়েছি এক প্রখর ও উজ্জ্বল ইতিহাসবোধের। উদাহরণ স্বরূপ, হুসার্ল সম্পর্কে তাঁর আলোচনাটির কথা ধরা যাক। হুসার্ল তাঁর Ideas গ্রন্থে দাবি করেন, তাঁর ফেনোমেনোলজি দর্শনের ইতিহাসের শেষ পরিণতি; যে অভীষ্ট নিয়ে দর্শন-ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে তা সমে এসে পৌঁছেছে তাঁর ফেনোমেনোলজিতে। দেরিদা হুসার্লের এই দাবিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন হুসার্লের অন্যতম অবদান এক 'authentic metaphysics' যেখানে আদর্শ বা সারধর্ম (ideal or essence) তথ্য (factual) থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, এই সারধর্ম দিয়েই আমাদের ব্যক্তি বা বস্তুর জ্ঞান হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতেই নির্ধারণ করি, অথবা প্রতিটি টেবিল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় টেবিলত্ব—এই জাতির মারফত। এই জাতি বা সারধর্ম সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :

'The positing of essence...does not imply any positing of individual existence whatsoever : Pure essential truths do not make the slightest assertion concerning facts.

'Knowledge of essences : independent of all knowledge about Facts. It is a matter of indifference [with regard to the essence] whether such things have ever been given in all experience' (Ideas 8, W. R. Boyce-Gibson-এর ইংরেজি অনুবাদ) ।

Essence-এর সঙ্গে ও Fact-এর এই বিযুক্তিকরণের অভিপ্রায় নিয়ে গ্রিক দর্শন সত্তার (reality) স্বরূপ অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছে বলেই দেরিদা হুসার্লকে ধরবার চেষ্টা করেছেন গ্রিক দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বের অনুষঙ্গে। এই অ্যারিস্টটল দেরিদার বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। 'The Supplement of Copula', 'Ousia and Gramme' ইত্যাদি প্রবন্ধে আমরা লক্ষ করি দেরিদার ইতিহাস-চেতনা, অ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যে চিহ্নিত 'general code of metaphysics'-এর প্রতি তাঁর মনোযোগ। তাঁর হুসার্ল পাঠ অ্যারিস্টটল পাঠের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর লেখা 'Form and Meaning : A Note on the Phenomenology of Language' প্রবন্ধে আমরা পড়ি :

'Only a form is self-evident, only a form has or is an essence, only a form presents itself as such...Form is presence itself. Formality is whatever aspect of the thing in general presents itself, lets itself be seen, gives itself to be thought...Metaphysical thought...is a thought of Being as form' (Margins, পৃ. 157-58, Alan Bass-এর ইংরেজি অনুবাদ) ।

এই presence-এর ধারণাটি দেরিদা নিয়েছেন হাইডেগার থেকে এবং মিলিয়েছেন অ্যারিস্টটলীয় form-এর সঙ্গে। অ্যারিস্টটলের মতে, আকার সত্তার ভিত্তি, কিংবা সত্তা আকারের মধ্যেই বিধৃত। এই আকার উপস্থিত না থাকলে সত্তা নির্বিশেষ, অনির্ধারিত বা অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। আবার এই আকারের উপস্থিতি সত্তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও জ্ঞানের বিষয় করে তোলে। তাই এই আকার বা ফর্ম জ্ঞানবিদ্যা (epistemology) ও তত্ত্ববিদ্যার (Ontology) মধ্যে সংযোগ রচনা করে। জোসেফ ওয়েন্স-এর ভাষায়, 'The Form alone defines the thing' and expresses all the Being in the singular thing...as knowable and definite'. ভিটগেনস্টাইনের প্রথম দিকের চিন্তায়ও আমরা এই অ্যারিস্টটলীয় ফর্মের পুনরাবৃত্তি দেখেছি, বিশেষ করে Tractatus-এ তাঁর 'picture theory'-তে। এই চিত্র-তত্ত্ব আসলে ফর্মেরই তত্ত্ব। কোনো বচন (proposition) সত্তার প্রতিলিপি হতে পারে এ জন্যই যে হাত ও দস্তানার মতো তাদের আকার ও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

এই ফর্মকে কেন্দ্র করে গ্রিক দর্শনে যে যাত্রা শুরু হুসার্লের eidos বা ঘটনা সারতত্ত্বে তার সার্থক পরিসমাপ্তি। বন্ধনীকরণ (apoche') পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন বস্তু জগতের সারার্থ আবিষ্কার—সংক্ষেপে এই হচ্ছে হুসার্লীয় দর্শনের মূলকথা। কিন্তু ফর্মের দিকে কেন এই ঝোঁক? অ্যারিস্টটল থেকে হুসার্ল অবধি সমস্ত দার্শনিকদের? কারণ একটিই। দর্শনকে কাল ও পরিবর্তনের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা। সংগ্রাম একটিই: কালের যাত্রার বিরুদ্ধে - যার রথ নিত্যই উধাও। ফর্মকে গুরুত্ব দিয়ে এই সব দার্শনিকরা রচনা করেন এক র‍্যাশনাল অর্ডার যা সমস্ত বাস্তব, সমস্ত কনটিনজেন্সির অনিশ্চয়তা, সমস্ত বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে ছাড়িয়ে যায়। তাই এঁদের তত্ত্বে যা মুখ্য হয়ে উঠে আসে তা হচ্ছে কালোত্তীর্ণ ফর্ম, যা গৌণ হয়ে পড়ে তা হচ্ছে কাল, পরিবর্তনের ধারা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই পরিবর্তন কি স্বীকৃতি পায়নি, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বে? তিনি কি বলেন নি, কালের মধ্যেই আকার বিকশিত হয়ে ওঠে, প্রস্ফুটিত হয়? পোটেনশিয়ালিটি ও অ্যাকচুয়ালিটির কথা বলে আসলে অ্যারিস্টটল এই বর্ধন বা পরিবর্তনের ধারাটির উপরই জোর দিয়েছেন। দুটি গাছের দুটি বীজের কথা ধরা যাক—যারা এমন অবস্থায় আছে যে কোন বীজ থেকে কোন গাছ জন্ম নেবে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবু এ কথা নিশ্চিত যে এই দুটি বীজের মধ্যে একটি থেকে ওক গাছ হবে, অন্য বীজ থেকে অপর একটি গাছ। অন্য ভাষায় বলা যায়, ওক গাছের বীজ যদিও বাস্তব ওকে পরিণত হয়নি, তবু সেই বীজের মধ্যে সুপ্তাকারে রয়েছে ভবিষ্যত ওক গাছের সম্ভাবনা। অর্থাৎ সেই বীজটি কালক্রমে ওক হয়ে উঠবে, এবং কখনই অন্য কোনো গাছ হবে না। সুতরাং পরিবর্তন বা বর্ধন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রবণতা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। কিংবা এ কথাও বলা যায় বস্তুর প্রচ্ছন্ন আকার পরিণতিতে পেঁছে দেবার জন্য কালের প্রয়োজন। কাজেই অ্যারিস্টটল কাল বা পরিবর্তনের কথা বলেননি এমন নয়। তবু কিন্তু সংশয় থেকে যায়। তবু বলা যায়, অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বে প্রধান হয়ে ওঠে ফর্ম, পরিবর্তন যাকে স্পর্শ করতে পারে না, পরিবর্তন যার অমোঘ প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। তাঁর তত্ত্বে উপেক্ষিত হয় কালের নিজস্ব স্পন্দন, অনিশ্চিত সম্ভাবনা। অ্যারিস্টটল সর্বদাই 'অ্যাকসিডেন্ট'-এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেন। তিনি বলেন, এই অ্যাকসিডেন্ট বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত নয়: এখানে প্রশ্রয় পায় নিয়মহীন ব্যত্যয়, এখানে সব কিছুই এলোমেলো, অনিয়মিত, দুর্বোধ্য। বৌদ্ধিক বৃত্তের বাইরে অধিষ্ঠিত এই অ্যাক্সিডেন্টকে তুচ্ছ করার অর্থই হচ্ছে কালের মহিমাকে তুচ্ছ করা। সেন্ট অগস্টাইনের ভাষায়, 'Being of time tends not to be!'

হাইডেগার অবশ্য ফর্মের অনৈতিহাসিক উপস্থিতির সঙ্গে ইতিহাস ও কালের একটি

সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন 'disclosure' কথাটি ব্যবহার করে। বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা অস্বীকার করে একমাত্র ঐক্য বা identity-কে গুরুত্ব দেবার পেছনে যে গভীরতর অসুখ নিহিত আছে সে সম্পর্কে হাইডেগার অবহিত। তাই তিনি এক সাযুজ্য রচনার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, সত্তার সংগঠনের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে বিভিন্ন রূপ। এই বিভিন্ন রূপ একমাত্র মানুষের কাছেই অনাবৃত, প্রকাশিত হয় বিভিন্নকালে। সত্তার এই প্রকাশ বা disclosure mode-এর মধ্যেই কাল তার নিজস্ব মহিমা ও দীপ্তিতে প্রকাশ পায়, আর এইভাবে তৈরি হতে থাকে এক সেতু—কাল এবং সত্তার সুপ্ত আকার বা সংগঠনের মধ্যে।

এই হাইডেগারীয় প্রয়াসে দেরিদা অবশ্য একেবারেই সন্তুষ্ট নন। এই মেলবন্ধন তাঁর মতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাঁর যুক্তি, হাইডেগারের দর্শনে কালের কোনো যথার্থ ভূমিকা নেই, সে শুধু সত্তার মধ্যে ন্যস্ত বিভিন্ন আকারকে উন্মোচিত করতে সাহায্য করে মাত্র, আর কিছু নয়। তাঁর নিজের ভাষায় :

'If Heidegger has radically deconstructed the domination of metaphysics by the present, he has done so in order to lead us to think the presence of the present' (Margins, পৃ. 131)।

দেরিদার অবনির্মিতির লক্ষ্য ফর্মের বর্মে প্রতিহত কালের পুনরুদ্ধার। তিনি তুলে ধরেন কালের স্বাতন্ত্র্য তার অনিশ্চয়তা। এর অর্থ এই নয়, আকার নিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধি গ্রাহ্য সত্তার ঐক্যকে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি শুধু বলেন, এই ঐক্যের মধ্যে লগ্ন হয়ে থাকেপরি বর্তন, কনটিনজেন্সি ; এই ঐক্যের মধ্যে নিহিত থাকে নিত্য নব রূপান্তরের সম্ভাবনা, যাকে তিনি বলেছেন, 'play of differences'.□

গুরুদ বন্দ্যোপাধ্যায়

'শব্দের বিবেক' : কানেত্তির সাহিত্য দর্শন

শিরোনামের নাম শব্দটি এই শতকের সাহিত্য সংসারে একজন অপ্রতিষ্ঠিত লেখকের নাম। তাঁর মুখ্য পরিচয় বর্তমানে এই যে তিনি ১৯৮১-তে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর দুর্ভাগ্য যে এইটাই তাঁর এখন মুখ্য পরিচয়, অথচ তাঁর যা প্রকৃত পরিচয়—লেখকদের রাজ্যে অসাধারণ বৈদগ্ধ্যে তিনি এক প্রবল মনীষা— এখনো আমরা জ্ঞাত হইনি। তিনি অপ্রতিষ্ঠিত ও উপেক্ষিত কারণ তিনি তথাকথিত সৃজনশীল সাহিত্য রচনার চেয়ে চিন্তার ক্ষেত্রেই মৌলিকভাবে সৃজনশীল হতে চেয়েছেন। অতিখ্যাত, অল্পখ্যাত অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে কানেত্তির ক্ষেত্রে আদৌ তা ঘটে না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় লেখকদের মধ্যে কাজ করে একটা বিশেষ ঝোঁক (নান্দনিক পরিভাষায় হয় তো প্রেরণা) যা তাঁদের টেনে নিয়ে চলে গল্প-উপন্যাস-নাটকের নানা খাতে আর এইসব খাতে যখন তাঁদের কলম চলে তখন তাঁদের মনের গভীরে বিচারশীল ও চেতনে জাগ্রত সন্ধানী চিন্তা যত না কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে তাঁদের ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ওই সমস্ত ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট ছাপজট। এই মনোধর্মানুসারী প্রক্রিয়ায় যা লেখা হয় তা তাৎক্ষণিকভাবেই পাঠক সাধারণের কাছে বোধগম্য হয়ে থাকে বলে লেখকে পাঠকে সম্বন্ধটা হয় মিত্রতার, ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে যাকে মনোরমভাবে বলা হয়েছে 'সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য'— পরিস্থিতি। কিন্তু এমন কোনো লেখক যদি থাকেন যাঁকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর মনোগঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, যিনি গল্প-উপন্যাস-নাটক তৈরির তাগিদে লিখতে বসেন না বরং যাঁর সৎ চিন্তাশীলতা এবং চিন্তাশীল সততা অনিবার্যভাবে অমোঘ টানে 'শব্দের বিবেকে' এসে পৌঁছয়, তাঁর ভাগ্যে কী ঘটবে ? যে লেখকের ওই মনোধর্মের কারণে পাঠকের সঙ্গে হবে না সহজ সখ্য, বরং পাঠকের সঙ্গে তাঁর হবে কঠিন চিন্তা-দ্বৈরথের সম্বন্ধ, সেই লেখকের ভবিতব্য কী? এইসব প্রশ্নের উত্তর ইলিয়াস কানেত্তি। কারণ কানেত্তি লেখকদের মধ্যে মনোধর্মে ব্যতিক্রম ; কারণ কানেত্তি-র সঙ্গে পাঠকের মিত্রতা নয়, দ্বন্দ্ব ; কারণ কানেত্তি তথাকথিত সৃজনশীল সাহিত্যের লেখক নন কিন্তু যাঁর সৃজনশীল চিন্তার থেকে নিঃসৃত 'শব্দ-বিবেক' সৃষ্টি করেছে কথা সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনা। তাই কানেত্তি সুদীর্ঘকাল অনাদৃত, অস্বীকৃত এবং অপ্রতিষ্ঠিত তো বটেই। ইউরোপে তিনি প্রায় অপরিচিত এবং আমাদের দেশে অজ্ঞাত কুলশীল। লেখক

হিসেবে কানেত্তি-র একমাত্র পরিচয় তিনি বিদগ্ধ পুরুষ। অনেক কালজয়ী লেখক বৈদগ্ধ্যে সামান্য মানুষ। [যেমন ছোট গন্ডীতে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রেমচন্দ, সমরেশ বসু বড় গন্ডীতে ডিকেন্স]। অনেক সামান্য লেখক বৈদগ্ধ্যে অসামান্য ; কানেত্তি ওই দুই শ্রেণীর কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তাঁর মধ্যে অসামান্য বৈদগ্ধ্য থেকে জন্ম হয়েছে এক অসাধারণ লেখকের। অবিদগ্ধ লেখক কালজয়ী শিল্প প্রতিভায় অমরত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। কালজয়ী শিল্প প্রতিভার ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। আবার অসামান্য বৈদগ্ধ্যর থেকে অনিবার্যভাবে একজন অসাধারণ লেখকের আত্মপ্রকাশ নাও ঘটতে পারে। তাই এমন ব্যক্তি সাহিত্য জগতে বিশেষ কোনো স্বীকৃতি পাবেন না, এটাও নিয়ম। কিন্তু সাহিত্য জগতে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে আশ্চর্যের তা হল বিদগ্ধ পুরুষ যদি শক্তিমান সাহিত্যিক হন তো তাঁর প্রাপ্য দন্ড। এই আশ্চর্য নিয়মটার উৎস অবশ্য পাঠককুলের মনোজগৎ! পাঠক চিন্তাশীল মনীষীকে ভয়ে ভয়ে ভক্তি করেন কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, মনীষী প্রাবন্ধিক হিসাবে বিশেষ সমীহ করেন। এই পাঠকই আবার গল্প-উপন্যাস-নাটকের সাহিত্য শিল্পীকে, 'স্বভাব কবি'-কে নিজের মনের মানুষের মতো ভালবাসেন ; আজীবন নিরন্তর চলে তাঁদের সঙ্গে প্রেম ও প্রণয়। সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত তাই রাসেল এবং উপন্যাস-প্রবন্ধকার সার্ত্র-ও। এবং অন্য দিকে শপ্যাঁ, ভ্যান গগ বা পল রোবসনের মতো ডি.এইচ লরেন্স, মোরাভিয়া, পাস্তেরনাক, হেমিংওয়ে ইত্যাদি। আমরা পাঠক হিসাবে ছাড়পত্র দিই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়কে কিংবা বুদ্ধদেব বসুকে। সাহিত্যের জগতে দুটি মাত্র বাতিঘর— মনীষার জ্যোতি কিংবা শিল্পের দ্যুতি। আলোর বৃত্তে অধিষ্ঠিত তাই মনীষী আর আর্টিস্ট বা কথাশিল্পী। আর সকলে অন্ধকারে, অপরিচয়ের অন্ধকারে। সমকালীন সাহিত্যে কানেত্তি-ও এই অন্ধকারে এতদিন অজ্ঞাত ছিলেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নিষ্ঠাবান শ্রমিকের মতো যিনি সৃজনধর্মী কথা সাহিত্যে প্রতিটি শব্দ রচনা তীক্ষ্ম করেছেন প্রতিভাদীপ্ত কলমে তাঁর অসাধারণ মৌলিক চিন্তা-মনীষার মুক্তির প্রেরণায় সেই কানেত্তি বরাবরই অজ্ঞাত সাহিত্য কর্মী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ নজির, যিনি বিশুদ্ধ প্রেরণা নির্ভর বাগ্‌বিস্তারে কিংবা চিন্তামুক্তির একমাত্র উপায় হিসাবে মননশীল প্রবন্ধের গন্ডীটুকুতে আবদ্ধ থাকতে বিশ্বাসী নন। বরং তিনি বরাবর মনে করে এসেছেন যে চিন্তামুক্তির পদ্ধতি প্রয়োজনমতো প্রবন্ধ হলেও বিশুদ্ধ, পরিশীলিত মনন স্রোতের মন্থনে বিচারসিদ্ধ চিন্তাগুলির ব্যাপকতর ও গভীরতর রূপায়ণের পদ্ধতি হল গল্প-উপন্যাস-নাট্যসৃষ্টি। কথা সাহিত্যের একটি মাত্র উপাদান তিনি স্বীকার করেন এবং তা হল বিশুদ্ধ চিন্তাশীলতা বা মনন ক্রিয়া। চিন্তাকে বহন করার জন্যই গল্প বা উপন্যাস বা নাটক। এগুলির অন্যবিধ সার্থকতা নেই। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলাফল তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অবশ্যই মারাত্মক হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সৃষ্টি তাঁর বজ্রমাণিক থেকে হীরের জ্যোতি আমাদের চোখে পড়েনি। এমনি অন্ধকারে অন্তরীণ থাকতেন কানেত্তি হয়ত

চিরজীবন কিন্তু সম্প্রতি, ১৯৮১-তে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় আলোচনার বিষয় হয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে অনেক সময়ে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন, নোবেল পুরস্কার, অনেক সময়েই অবহেলিত প্রতিভা-কে জনমানসে উদ্ধার করে আনে। কোনো কোনো অক্ষম সাহিত্যকার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই বা তার আগে পরে প্রতিভাধর সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কারের আওতার বাইরে থেকে গেছেন— কিপলিং নোবেল লরিয়েট অথচ টমাস হার্ডি এই পুরস্কারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, এরকম সব ব্যাপার সত্ত্বেও কিংবা অনেক ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের প্রাপক নির্ধারণে সাহিত্যের চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচারবিবেচনায় এই পুরস্কারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হলেও, সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুরস্কারের এটাই সবচেয়ে বড় অবদান যে অনেক সময়ে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টির রথের চক্র-নির্ঘোষ যখন আমাদের কানে এসে পেঁছয় না তখন নোবেল পুরস্কারের ভেঁপু বাজলে সাহিত্যের স্রষ্টা সম্বন্ধে সচকিত হয়ে উঠি। অন্তত আমাদের দেশে নোবেল পুরস্কারের এই ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে এখনো পর্যন্ত এ কথা সত্য।

কানেত্তি আমাদের কাছে অপরিচিত। তাই তাঁর কিছু প্রাথমিক পরিচয় প্রয়োজন। আর তাঁর পরিচিতি রচনা বেশ সহজতর কাজ কারণ তাঁর নিজস্ব জীবন অনেকাংশেই তাঁর লেখক পরিচিতি। এমন কি তাঁর মুখাবয়বও তাঁর লেখক চরিত্রের কিছুটা পরিচয় বহন করে। কথাটা অর্থহীন মনে হবে না যদি কনফুশিয়াসের একটি উক্তি অগ্রাহ্যের বস্তু না হয়। কনফুশিয়াস একবার বলেছিলেন যে কোনো একজন মানুষ যতই রূপবান হোক না কেন সে যদি প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্যও চিন্তনে মননে নিরত না থাকে তো তাকে বড় কুৎসিত দেখায়। অর্থাৎ, অন্যভাবে, মননশীল মানুষের মুখে একটা বিশেষ রূপ সৃষ্টি হয়—তা সে মানুষের দৈহিকরূপ যেমনই হোক না কেন, সুন্দর অথবা অসুন্দর। অবশ্য কনফুশিয়াস যে রূপসৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন তা একটু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যাপার। তাই কানেত্তির মুখের দিকে তাকালে আমাদের চিন্তাহীন চোখে তাঁর আসল পরিচয় হয়ত উদ্ঘাটিত হবে না, হয়ত শুধুই আশ্চর্য হব যে ছিয়াত্তর বছরের একজন মানুষের মুখ কোন রহস্যে এমন দৃঢ় চোয়ালে আঁটসাট রাগী জোয়ান হয়? বস্তুত একজন মানুষ কয়েক দশক ধরে নিরন্তর পড়াশোনা ও মননচিন্তনের কঠোর শ্রমে বদরাগীর চেহারা নিতে পারেন গড় মানুষের চোখে যার মনে কোনো পলি জমে নি, কিন্তু অনুশীলিত মানুষ জানেন ওই বদরাগের চেহারা আসলে এক রহস্যময় মুখোশ যাকে কনফুশিয়াস ঠিক চিনতে পারতেন কষ্টার্জিত বৈদগ্ধ্যের কান্তিরূপ। শুধু অ্যাকাডেমি ব্যক্তিত্বের বৈভবই নয় তাঁর যে অনমনীয় চোখ দুটি দেখে মনে হয় তিনি বুঝিবা কোনো এক কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি, বস্তুত সেই চোখে আছে এক সুগভীর কাল-চেতনা, যে কালচেতনায় সৃষ্টি হয় ঐশ্বর্যময় এক অন্ধত্ব—অতি প্রখর দৃষ্টির অন্তরালে

আছে জীবন উপলব্ধির মৌলিক অন্ধত্ব, তাঁর নিজের কথায় : "Blindness is a weapon against time and space ; our being is one vast blindness, save only for that little circle which our mean intelligence—mean in its nature as in its scope...can illumine. The dominating principle of the universe is blindness. It makes possible juxtapositions which would be impossible if the objects could see each other. It permits the turncation of time when time is unendurable. Time is a continuum whence there is one escape only. By closing the eyes to it from time to time......" স্বভাবতঃই সাহিত্যে চিরাচরিত চিন্তাভাবনার চৌহদ্দিতে এমন মানুষ বড় অস্বস্তিকরভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবার পর একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই আমাদের মনে হয় শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কারই নয়, অনেক নোবেল পুরস্কার-প্রাপকের কপালে যা জোটেনি, আমাদের বিশেষ মনোযোগই এঁর চূড়ান্ত প্রাপ্যবস্তু। কানেত্তি-র সাহিত্যে যে বিচিত্র ঐশ্বর্য তার বাস্তব ভিত্তি হচ্ছে তাঁর জীবনের বৈচিত্র্য। বুলগেরিয়ায় ১৯০৫ সালে তাঁর জন্ম। পিতামাতার সূত্রে স্পেনীয়। জন্মগত ভাষা স্প্যানিশ কিন্তু তাঁর ছয় বছর বয়সের সময়ে তার পিতামাতা চলে আসেন ইংলন্ডে, সেখানে ইংরেজি ভাষা-পরিবেশে কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর পিতার অকালমৃত্যুতে তাঁরা চলে আসেন ভিয়েনায় এবং সেই থেকে তাঁর জীবন-বিকাশের ভাষা হয় জার্মান এবং জার্মান ভাষাতেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। ইউরোপীয় সংস্কৃতি তাঁর মানসে এইভাবে প্রবাহিত হয় স্প্যানিশ-ইংরেজি-জার্মান ভাষার ত্রিস্রোতায়। তাঁর বিদ্যালয় জীবন কাটে জুরিখে (সম্ভবত) এবং ফ্রাংকফুর্টে। ১৯২৪ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবন শুরু হয়, ১৯২৯ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে ডক্টরেট লাভ করেন। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালে আরম্ভ হয় তাঁর সাহিত্যজীবন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লেখক কানেত্তি প্রধানত ভিয়েনাবাসী। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ফ্রাংকফুর্টে, ভিয়েনায় সামাজিক জীবনে যে চাপ সৃষ্টি হয়, যে-সব গণআন্দোলনের তরঙ্গ ওঠে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করেন গণমনের চরিত্র। ১৯৩৮ সালে ইংলন্ডে অভিবাসিত হয়ে সেই থেকে তিনি ইংলন্ডের নাগরিক। কানেত্তি লেখাপড়া করেন ও মৌখিকভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেন জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান ও ইংরেজিতে। তাঁর আগ্রহের পরিসরও একটু বেশি বিস্তৃত। তবে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র মূলত নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অনিবার্যভাবে দর্শন। তিনি নিজেই বলেছেন যে এতরকম বিষয়ে আগ্রহী হওয়া হয়ত বেমানান ব্যাপার কিন্তু তাঁর কাছে ওই বিষয়-গুলির সব কয়টিই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সমস্ত বিষয়ের পিছনে বছরের পর বছর কঠোর শ্রম নিয়োগ করে তিনি কয়েক দশক ব্যয় করে ফেলেছেন। কানেত্তি হয়ত

সৌজন্যবশতই বলেননি যে কোনো নিষ্ঠাবান চিন্তাবিদের পক্ষে জ্ঞানের অবিভাজ্যতার নিয়মে এই রকমের অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক ব্যাপার। তথাকথিত সাহিত্য স্রষ্টারা চিন্তার দায়মুক্ত, তাই তাঁদের জীবনও অধ্যয়নের ভার মুক্ত। আর তথাকথিত চিন্তাবিদরা ছদ্ম-পণ্ডিত বলে পল্লবগ্রাহী জীবন বেশ আরামেই কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কানেত্তি এঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যবোধের মানুষ তাই বিদ্যার জন্য আজীবন কঠোর শ্রমই তাঁর বিধিলিপি।

১৯৩৫ সালে কানেত্তি রচনা করেন একটি উপন্যাস, Die Blendung The Deception / বঞ্চনা। গণমনের প্রকৃতি ও মানব সংস্কৃতি এই দুইয়ের অনুসন্ধানে বছরের পর বছর নিযুক্ত থেকে এই উপন্যাসের মধ্যে, তাদের পারস্পরিক সংঘাতের পুরো কাঠামোটা গড়ে তুললেন। স্রষ্টা পুরুষ তরুণ বয়সেই এমন এক সংকটের উদ্ঘাটন করেছেন যা মুক্ত চিন্তার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে দেয়। আর এই উপন্যাসেই আশ্চর্য একটা তথ্য আমরা পাই। এই উপন্যাসের একটি চরিত্র, জর্জ কিয়েন, যাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষমান রাখা হয়েছে। কানেত্তি নিজেও ১৯৪৬ সালে নিজেই নিজেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩৫ বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে নোবেল পুরস্কারের জন্য। ১৯৩০-এর দশকে তিনি একে একে তাঁর নাটকগুলিও গড়ে তুলতে থাকেন। তাঁর প্রথম নাটক, Hochzeit / The wedding / বিবাহ। এই নাটকেই কানেত্তি নাটকের এক অনাবিষ্কৃত শক্তির সন্ধান দিলেন। কয়েকটা সাধারণদর্শন মানুষ কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এক একটা দানব এক ধরনের উন্মত্ত তাণ্ডবে নিরত পরস্পরকে আত্মসাৎ করার জন্য। 'লোভ' যে কী জমাট নাট্যমূর্তি ধারণ করতে পারে এই নাটক তার এক আশ্চর্য উদাহরণ। এমন কি মানুষের যৌনসম্ভোগও লোভের থাবায় পণ্যবস্তু হয়ে গেছে। আবার চরিত্রগুলির আত্মধ্বংসের জন্য এমন অবিশ্বাস্য উন্মাদনা যে শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তি সম্ভব হল ভূমিকম্পের প্রসাদে। এই নাটক যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন তার ফলে সংঘটিত হল দাঙ্গা। বস্তুত কানেত্তি-র রচনা আমাদের সংসারে আচমকা এমন এক আঘাত যার ফলে রাস্তার রক্তারক্তি দাঙ্গা থেকে নানা প্রকার আধ্যাত্মিক রক্তক্ষরণ মোটেও অভাবিত নয়। তিনি তো এজন্য আমাদের যথেষ্ট সতর্ক করেও দিয়েছেন: "As a profession literature is destructive : one should have greater fear of words"—কানেত্তিই সম্ভবত সাহিত্যজগতের একমাত্র পুরুষ যিনি আমাদের অবহিত করলেন যে মানুষের জীবন ধ্বংসের জন্য উৎসর্গীকৃত নয় কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেই আমাদের জীবন চিহ্নিত হয়ে থাকে।

The conscience of words/শব্দের বিবেক কানেত্তির চিন্তাধারার আর এক সংহত ভাস্কর্য। এই প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি তাঁর নিজস্ব ইতিহাসচেতনায় কয়েকজন ব্যক্তির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন—টলস্টয়, কাফকা ইত্যাদির। সময়ের স্রোত ও ব্যক্তিত্ব এমনভাবে আর

কোনো প্রবন্ধকারের কাছে ভাস্কর্যের বিষয় হয়েছে কিনা বলা কঠিন। কানেত্তির সৃষ্টি ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিশাল ও মহৎ কিন্তু সম্ভবত এখনো অসমাপ্ত। এই সমাপ্তির ধারণা অবশ্য এখনি আমাদের নেই। এটাও সম্ভবত আগামী অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তার জন্য খুব একটা খেদের কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ যা তিনি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করেছেন তার তাৎপর্য নিয়ে আমরা এখনো বহু কাল কাটাতে পারি। সেই এক স্ববিরোধী চেতনা, যার নাম ইতিহাস, তার প্রকৃতি তিনি বড় কম উদ্ঘাটিত করেননি। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কালের যা সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা, ব্যক্তি জীবনে পারস্পরিক ছিন্নতা, তার মূল অনাবৃত করার ব্যাপারে তিনি অনেকখানি সাহায্য আমাদের করেছেন যার ফলে এই যন্ত্রণার অপনোদনের আশা আমাদের মনে জাগে। তাঁর উপন্যাসকে ভিত্তি করেই তো সাহিত্যের একটা নতুন স্কুল গড়ে উঠেছে যার লেখকদের মধ্যে রয়েছেন গুন্টার গ্রাস, গিসেলা আইসনার প্রভৃতি। অবশ্য এইসব ছোট খাটো কৃতিত্ব তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও চলে। কারণ তাঁর কৃতিত্বের কথা যদি বলতেই হয় তো সরাসরি এ কথা বলাই ভাল যে সার্ত্র-কে বাদ দিলে ইউরোপে সাহিত্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে সাম্প্রতিক কালে কেই-বা তাঁর তুল্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। সার্ত্রের দার্শনিক কাঠামো তাঁর চেয়ে পূর্ণতর হলেও সম্ভবত বৈজ্ঞানিক বিন্যাসে নয়। আগামী দশকগুলিতে সাহিত্যের দর্শনের পাশাপাশি দর্শনের সাহিত্যের নতুন মডেলের চাহিদা আমাদের জীবনে খুবই জরুরি হয়ে উঠবে। এই ব্যাপারে কানেত্তি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবেন বলেই মনে হয়। □

পত্রিকার পরিকল্পনা পর্যায়ে প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন গুরু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত এই লেখকের বর্তমান নিবন্ধটি এক দশক আগে 'চতুর্দিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলখানা আর জেলখানার অন্যেরা

কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলখানার ভেতরের জীবনসংক্রান্ত সব কিছুই ছিল নাগরিক সমাজের চৌহদ্দির বাইরে। 'অপরাধ', 'সংশোধন' অথবা প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদি কয়েকটা শব্দের মধ্যেই জেলসংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা ঘোরাফেরা করত। জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় অবশ্য মাঝে মাঝে দুর্দশাগ্রস্ত জেলবন্দীদের ছবি ছাপা হত। জেলের ভেতরকার পাগলাগারদের পাগলদের চরম দুরবস্থার রিপোর্ট পড়ে নাগরিকেরা বিচলিত হতেন, এই পর্যন্ত। সমাজবিজ্ঞানী বা অপরাধবিজ্ঞানীদের কয়েকজন অবশ্য ভারতের জেলব্যবস্থার সমাজতত্ত্বে উৎসাহ দেখিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতার মধ্যে ঘোরাফেরা করা এই সমস্ত গবেষণা কিন্তু জেলপ্রশাসন, এর উপযোগিতা এবং তার ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনার মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকত। এমনটাই এতদিন চলে আসছিল। কিন্তু সত্তরের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনকে দমন করার রাষ্ট্রীয় প্রয়াস জেল সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতার অবসান ঘটাল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্যতম ক্ষেত্র জেলখানার অভ্যন্তরে অন্য অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ পেল। পরবর্তীকালে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীরা অনেকেই তাঁদের জেলজীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন, বিবৃত করলেন রাষ্ট্রীয় নির্মম নিপীড়নের পাশাপাশি তাঁদের সক্রিয় প্রতিরোধ, বিদ্রোহের কথা। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দীমুক্তি আন্দোলনও শুরু হয়। নাগরিক সমাজের একাংশ এই আন্দোলনে সামিলও হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়, এই দাবি মেনে নিতে। সরকার বাহবা পায়, নাগরিকরাও নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু এরও বাইরে থাকে এক বৃহত্তর জগত, যে জগতের মানুষের বাস আমাদের পরিচিত চৌহদ্দির বাইরে, 'অন্ধকারে'। যারা এই সমাজের মধ্যেই কোনোরকমে টিঁকে থাকতে চেয়ে বা থাকতে না পেরে কোনো অপরাধ করে, যারা বার বার জেলে ফিরে আসে, কে লেখে তাদের কথা? জয়া মিত্রের 'হন্যমান' তাদের নিয়েই। সত্তরের বিপ্লবী রাজনীতির শরিক হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন তিনি। তাঁর জেল-জীবনের স্মৃতি-চারণে এসেছে সাধারণ অপরাধীদের কথা, 'সামাজিক সুস্বাস্থ্য' বজায় রাখতে রাষ্ট্র যাদের জেলবন্দী করে তাদের নিজের মুখে বলা কাহিনীতে ফুটে ওঠে অন্য আরেক জগতের ছবি। এদের অধিকাংশই আসে সমাজের নিচু স্তর থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরে তাদের স্থান, অ্যাকাডেমিক জগতের চট-জলদি ব্যাখ্যার সঙ্গে সে জগত

মেলে না। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, বিশ্বাস, প্রতিরোধের নিয়মও অন্য রকম। 'হন্যমান' সেই অচেনা জগতের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করায়, চমকিত করে। নাগরিক মহলে প্রচলিত রাজনৈতিক বন্দী—আর সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে বিভাজন রেখা টানার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যেসে লাগে ভাঁটার টান। আর এইখানেই জয়া মিত্রের 'হন্যমান' সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত অন্যান্য জেল বৃত্তান্ত থেকে আলাদা হয়ে যায়।

আসলে 'হন্যমান' বইটি নিয়ে যেকোনো আলোচনাকেই অন্তত দুটি দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে বইয়ে বর্ণিত টুকরো টুকরো ঘটনা, মন্তব্য ইত্যাদি সহযোগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্যতম ক্ষেত্র জেলখানাকে বোঝা। তার মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতার নানা দিকের কথা আসবে, আসবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নযন্ত্রের পাশাপাশি তার সহায়ক অন্যান্য ক্ষমতার বাস্তব চেহারার কথা। আর দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে আসতে হবে মহিলা সহবন্দীদের কথা যা লেখিকা নিবিড় মমতার সঙ্গে বলেছেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে, আসে অবিরত অচেনামুখ যাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে ধরাবাঁধা রাজনৈতিক তত্ত্ব খেই হারিয়ে ফেলে। এ যেন এক অনাবিষ্কৃত জগত, যার নিয়মকানুন হিসেব সবই আলাদা।

জেলখানা এবং রাষ্ট্র

লেখিকা সত্তরের বিপ্লবী রাজনীতির শরিক। দীর্ঘদিন জেলজীবন কাটিয়েছেন। অথচ সারা 'হন্যমান' জুড়ে তিনি নিজেকে আড়ালে রাখছেন, আর সামনে নিয়ে আসছেন তাঁর অন্য সহবন্দিনীদের যারা দৈনন্দিন জীবনে কোনোরকমে বেঁচেবর্তে থাকার তাগিদে বা নিতান্ত সহায়সম্বলহীন জীবনে একান্ত নিজস্ব কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরার অদম্য ইচ্ছের চাপে কোন অপরাধ করে। রাষ্ট্রের চোখে তারা অপরাধী, তাই সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে সংশোধনের জন্য তাদের জেলে বন্দী করা হয়। 'প্রমাণিত অপরাধীদের পাশাপাশি থাকে অন্যান্য বন্দীরা, থাকে পাগল, ভবঘুরে আর স্বামী-পরিবার-সমাজ-পরিত্যক্তা মেয়েরা।' 'কীভাবে থাকে সেই মানুষেরা'? লেখিকা তার বর্ণনা দিচ্ছেন। আর এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে ভারতীয় জেলব্যবস্থার এক অন্যরকম ছবি যার সঙ্গে জেল সম্পর্কে ভদ্রসমাজের যে ধারণা তার কোন মিলই নেই।

সরকারি প্রতিবেদনে, সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণাপত্রে বা নাগরিক মননে জেলখানা বলতেই সংশোধনাগার বোঝায়। সামাজিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে জেলখানা অপরিহার্য। রাষ্ট্র আর সমাজের চোখে অপরাধ একধরনের অস্বাভাবিক রোগ। সুস্থ সমাজের ওপর এক ধরনের উৎপাত। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে, এই রোগের কারণ খুঁজে বার করা আর তার প্রতিষেধকের বন্দোবস্ত করা। তাই অপরাধীকে বন্দী করে আলাদা রাখা হয়, নানা 'মানবিক' বন্দোবস্তের আওতায় রেখে তার পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়। সাধারণ

অপরাধী ছাড়াও জেলখানায় থাকে নানা ঝরতি-পড়তি মানুষজন, ভবঘুরে ভিখারি, অনাথ, বেশ্যা আর পাগল। ধর্ষিতা, স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েদেরও স্থান এখানে, সরকারি ভাষায় 'সেফ কাস্টডি'। উজ্জ্বল, সুস্থ এবং ভদ্রসমাজের কাছে যা কিছু উৎপাতসূচক তাকেই রাষ্ট্র, পুলিশ জেল-জরিমানার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে, শাস্তি দেয়। পুলিশ আর জেলখানার উপযোগিতায় বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার যাবতীয় বন্দোবস্ত, যার মধ্যে জেল হচ্ছে অন্যতম, সেই জেলখানা হয়ে ওঠে অস্বাভাবিকতা শোধরাবার জায়গা। তাই সেখানে থাকে হাসপাতাল, রুটিনমাফিক জীবন, থাকে ভোকেশনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা যাতে বন্দীরা শ্রমের মর্যাদা কী তা বুঝতে শেখে। বন্দী-দের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে থাকে ঢালাও খাবারদাবারের বন্দোবস্ত। এইভাবে বন্দীরা শারীরিকভাবে তো বটেই মানসিকভাবেও উন্নতি লাভ করে। থাকে 'গুড কনডাক্ট' রেমিশনের ব্যবস্থা। এতকিছু ভাল ভাল বন্দোবস্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বাইরের ভদ্র-সমাজের মনোমত গড়ে-পিটে নেওয়া হয়। সরকারি তথ্যদপ্তর প্রকাশিত বার্ষিক খতিয়ানে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ কত ভালভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ করে তার হিসেব বেরোয়। ভদ্রসমাজ অব্যাহত রাখতে সরকারি দায়বদ্ধতার কথা সোৎসাহে বলা হয়।

এতসব মানবিক বন্দোবস্ত অথচ 'হন্যমানের' পাঠক অস্বস্তিতে পড়ে। দেখে যে এই সমস্ত কিছুই বিকৃত হয়ে অস্বাভাবিক আর এক পাল্টা বন্দোবস্তে পরিণত হচ্ছে। লেখিকা দৈনন্দিন জেল জীবনে নিঃসীম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অহরহ দাপটের চেহারা তুলে ধরেন। অন্তহীন এই সন্ত্রাসের প্রকাশ ঘটে বন্দী মেয়েদের ওপর দৈহিক নির্যাতন আর অত্যাচারের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য বন্দীদের অসহায়ত্ব ও ক্লীবত্ব বজায় রাখা আর রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করা। প্রয়োজনে তাদের শেকলে বেঁধে রাখা হয়, অবাধ্য হলে মেরামত করা হয়, মেয়েদের ওপর নামিয়ে আনা হয় নানা পুরুষালি অত্যাচার। 'হন্যমানের' ছত্রে ছত্রে এই সন্ত্রাসের বিবরণ সচকিত করবে। কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধি বা সংবিধানের কোথাও বন্দীদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের কথা বলা নেই। সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক অধিকারের কথা সোচ্চারে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে হেবিয়াস কর্পাসের কথা, যার বলে বন্দী তার নিজের শরীরের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অপরাধ নিবৃত্তির জন্য বা অপরাধীকে দমন করতে, তার শরীরের ওপর আঘাত হানা বা ক্ষত সৃষ্টি করার কোনো অধিকার জেল কর্তৃপক্ষকে দেয়নি। বরং অন্যতম মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতীয় রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে জেলবন্দীদের সুস্থ নাগরিক সমাজে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। বন্দীদের প্রতি সংযমী ব্যবহারই হচ্ছে আধুনিক নিয়ম। ভদ্রলোকেরা অবশ্য 'হন্যমানে' বর্ণিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে বলবেন সাময়িক বিচ্যুতি, অথবা বড় জোর বেআইনি। ভারতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক অধিকার ভঙ্গের উপর এক বিখ্যাত বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে পরিচিত সমালোচকও একই পথে হাঁটেন, বলেন এত কিছু সুস্থ ভাল বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রাষ্ট্রের ওপর যেন ক্ষণে ক্ষণে এক ধরনের

বায়ুগ্রস্ততা ভর করে। এরই বশবর্তী হয়ে সে মাঝে মাঝে জনগণের উপর নামিয়ে আনে নিঃসীম দমনপীড়ন। আর এর শিকার হয় অসহায় কিছু লোক আর বন্দীরা।[১] প্রশাসন সংক্রান্ত আধুনিক মানবিক বন্দোবস্ত গড়ে তোলার কথা সোচ্চারে বলা হলেও তা আসলে স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের আইনি ধারা চালু হবার পাশাপাশি জনগণের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতে রাষ্ট্র দমনপীড়নের ব্যাপক বন্দোবস্ত করে। অধীনস্ত জনগণের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণকে নিশ্ছিদ্র করতে গড়ে তোলা হয় নিপীড়ন যন্ত্রের নানা ধরন। উদ্দেশ্য জনগণের বশ্যতা আদায় করা। আধুনিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার পাশাপাশি সাবেক শাসনপদ্ধতিও কমবেশি টিকে থাকে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সারমর্ম আইন-আদালত বা কাগজে প্রশাসনের চত্বরে ধরা পড়ে না। নিম্নবর্গের জনগণের জীবন প্রক্রিয়ার ওপর শাসকগোষ্ঠীর দাপটের চেহারা অন্যরকম। জীবনের সব ক্ষেত্রে তারা সরকার আর সহযোগী শক্তিগুলির ভীতিপ্রদ শরীরী অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়। কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রকে তারা ভয় পায় তাই ভক্তিও করে। 'আই. জি., প্রিজনস্ জেল পরিদর্শনে এলে বন্দী মেয়েদের দেওয়ালের ধার ঘেঁসে লম্বা লাইন, নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা, জড়োসড়ো ভঙ্গি, হাতে টিকিট। আমলার নিছক উপস্থিতিই তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে' (পৃ. ৪৩)। রাষ্ট্রকে তারা ভয় পায় তাই ভক্তিও করে। আর ভক্তির বিনিময়েই তারা বদান্যতা আর কৃপা আশা করবে। তাই চালু 'মার্কা' ব্যবস্থা, বন্দীর 'গুড কনডাক্ট'-এর ভিত্তিতে জেল কর্তৃপক্ষ তার সাজার মেয়াদ কমায়। তাই 'মার্কা—যার উল্লেখ মাত্রই উদ্ধততম বন্দীও ফণা নামিয়ে নেয়' (পৃ. ১৫)। সংবিধান বা সরকারি আইনকানুনের মধ্যে জেলের যে নিরবয়ব সংশোধনকারীর উদারনৈতিক ছবি ফুটে ওঠে তার বিপরীতে জেল কর্তাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেহারা বন্দীরা হাড়ে হাড়ে টের পায়। অথচ তত্ত্বগতভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নতুন উদারনৈতিক বিধিবন্দোবস্ত এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, অপরাধীদের দৈহিক নিপীড়নের মাধ্যমে শাস্তি দেবার পুরনো প্রথা বর্জন করে এসেছে তাদের মানসিক সংশোধনের ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য অপরাধীদের পুনর্বাসন। আসছে শাস্তিদানের 'মানবিক পদ্ধতি'। আপাতত দৃষ্টিতে ভারতীয় রাষ্ট্র এক মানবিক চরিত্র গ্রহণ করলেও তার ক্রিয়াকলাপ চিরাচরিত ভারতীয় ধারণার মধ্যেই বাঁধা পড়ে। 'চব্বিশে ফেব্রুয়ারী জেল কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে বিনা প্ররোচনায় সাতজনকে হত্যা করে।··· বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় তাদের' (পৃ. ৫৩)। আসলে যে কোনো অপরাধই হচ্ছে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবমাননা। তাই অবমাননাকারী অপরাধীর শরীরকে চরম নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অনিবার্যতা জাহির করা হয়। মনুসংহিতায় রাষ্ট্রের এই ধারণার কথা বারবার বলা হয়েছে। এই ধরনের কর্তৃত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজকর্তৃত্বের ভিত্তিই হচ্ছে রাজদণ্ড যার মাধ্যমে সার্বভৌম শক্তির প্রকাশ ঘটে। মনু এই রাজদণ্ডকে অভিহিত করছেন পুরুষ হিসেবে। এর বর্ণ হচ্ছে কৃষ্ণ এবং এর চক্ষু রক্তবর্ণের। ভয়ভীতি ও দুঃখ উদ্রেককারী এই দণ্ড সদাজাগ্রত থাকে বলেই

অধস্তন সকলে নিজ নিজ ধর্ম এবং কর্তব্যে অবিচল থাকে।[২] রাষ্ট্র কর্তৃত্বের এই কঠোর ধারণাই সর্বত্র বিরাজ করে, জেলখানাতেও। লেখিকা জেলবৃত্তান্তের মধ্যে নিয়ে আসেন তিমিরের কথা সেই তিমিরবরণ যে তালগাছের মত এ হেন রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়াবার অদম্য সাহস দেখায় আর দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্র রাষ্ট্রকর্তৃত্ব অবমাননাকারী তিমিরের শরীর ধ্বংস করে (পৃ. ৩৬)।

জেলকর্তৃত্বের পাশাপাশি তার সহায়ক আর এক স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের অস্তিত্বের প্রসঙ্গ লেখিকা নিয়ে আসছেন। এসেছে শিখা, লালমোতি, সরযূ, পুষ্প নেইয়া আর তাদের তাঁবেদারদের কথা। তারাও অপরাধী, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদের তফাত আছে। কর্তৃপক্ষের নীরব অনুমতিক্রমে বা যোগসাজশে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নযন্ত্রের পাশাপাশি তারা সমান্তরাল আরেক ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তোলে। সাধারণ অপরাধীদের ওপর তারা নামিয়ে আনে দৈনন্দিন হিংসা, 'জেলের চাকা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নাটবল্টু এরাই' (পৃ.৭৬)। এই ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত, বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ তাকে মদত দেয়। 'প্রেসিডেন্সীতে বন্দীদের অবস্থা যাই হোক, কোন জিনিসের কার্পণ্য নেই' (পৃ. ৭৬)। কিন্তু অধিকাংশই শিখা আর লালমোতিদের 'ঘাঘরার নীচে সেলাই হয়ে, কোমরের কাপড়ে আড়াল হয়ে বাইরে চলে যায়…আর টাকা হয়ে ফিরে আসে' (পৃ. ৭৬)। সহৃদয় সরকারের নির্বিকার দয়াদাক্ষিণ্যের এমত পরিণতির পেছনে প্রশাসনের নীচুতলায় দুর্নীতির প্রসঙ্গ অনেকেই নিয়ে আসবেন। লেখিকারও এই ধারণা ছিল, 'আমাদের অনেকদিন পর্যন্ত এই ভুল ধারণাটা ছিল যে খাবার চুরি, বাসন চুরি ইত্যাদির ব্যাপার সম্পর্কে জেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভাল করে জানেন না' (পৃ. ১০৪)। কিন্তু 'ওপরে ঘাঘরা চাদর চাপা দেওয়া থাকলেও ব্যাপারটা আসলে খোলাখুলি' (পৃ. ৭৬)। আসলে সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না থেকেও এই নতুন ক্ষমতাগোষ্ঠী একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এদের অধিকাংশই সাধারণ অপরাধী, 'জেলে বসে উপার্জিত টাকা থেকে তারা কোর্টের কলকব্জায় তেল দেয়, যাতে তাদের কেস কোর্টে না ওঠে' (পৃ. ৭৬)। জেলের মধ্যে এরাই কর্তৃপক্ষের হয়ে অন্যান্য অপরাধীদের ওপর নজর রাখে, দমনপীড়ন চালায়, জেলের চাকা চালু রাখে। যে কোন রাষ্ট্রশক্তির কাছে এই ধরনের গোষ্ঠীর উপযোগিতা অপরিসীম। এটাই জেলের ভেতরে বা বাইরে সাধারণের ওপর নজর রাখে, খবরাখবর রাষ্ট্রকে যোগায় গণবিক্ষোভ দমনে রাষ্ট্রকে সহায়তা করে। জেলখানা আর শাস্তির বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে নামজাদা ঐতিহাসিক এদের চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনীরই এক উপগোষ্ঠী হিসেবে। এরা সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ না হয়েও বেহিসেবি জনগণের গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। 'হনুমানে' বিবৃত এই দুই স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের বিচিত্র মেলবন্ধন নতুন ভাবনার সঞ্চার করে।

প্রতিরোধ

জেলের অভ্যন্তরে জেলবন্দীরা যে ভয়ংকর সন্ত্রাস এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় তার প্রতিবেদন অবশ্য বেসরকারি রিপোর্টে মেলে। খবরের কাগজে বেরনো জেলবন্দীদের দুর্দশার ছবি দেখে জেল অভ্যন্তরের নিদারুণ পরিস্থিতির আঁচ পাওয়া গেলেও দুর্দশাগ্রস্ত বন্দীদের প্রতিরোধের কোনো হদিশ কিন্তু মেলে না। এই সমস্ত রিপোর্ট থেকে মনে হতে পারে যে তারা যেন সরকারি দাক্ষিণ্য নির্ভর একদল অসহায় আর নির্বাক প্রাণী। কিন্তু, 'হন্যমানে' জেলবন্দীদের নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনবদ্য বিবরণ আছে। বস্তুত, প্রতিবাদ আর অবাধ্যতা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ, বাঁচার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের ধর্ম। নিশ্ছিদ্র সন্ত্রাসের মধ্যেও জেলে কর্তৃত্বের মোকাবিলা করার সাহস তারা দেখায়। দৈনন্দিন এই প্রতিরোধ কখনো একক কখনো যৌথ। নিয়মকানুন ভঙ্গ করা, কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করা, অত্যাচারের আশংকা থাকা সত্ত্বেও গুণতিতে বাধা দেওয়া দৈনন্দিন প্রতিরোধের অঙ্গ। সর্বোপরি থাকে জেলখানা থেকে পালাবার চেষ্টা। উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়ে বুধা প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষের চরম অবাধ্য, 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, নাম লেখানো, ওয়ার্ডের ভেতরে যাওয়া—প্রতিটি কাজে বাধা দিল আসুরিক ক্ষমতা নিয়ে' (পৃ. ৩৪)। অত্যাচার আর অনাহারে ক্লান্ত হয়েও সে পালাবার পথ খোঁজে। পলায়নে ব্যর্থ বুধা তেতলা সমান উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ দেয় নীচে চাতালের ওপর (পৃ. ৩৬) আর এই দৈনন্দিন প্রতিরোধের মধ্যেই বন্দী মেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে পারস্পরিক অদ্ভুত মমত্ববোধ, একে অন্যকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরার অনবদ্য স্পৃহা।

পাগলাগারদ

রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন জনজীবনকে নিস্তরঙ্গ করতে যত পাগলছন্ন আর ভবঘুরেদের পাগলাগারদে পাঠায়। এই ব্যাপারে এদেশে ব্রিটিশ শাসকরাই পথিকৃৎ। নিজ দেশের আইন-কানুনের বয়ান অনুযায়ীই তারা যে এদেশে অপরাধ আর তৎসম্পর্কিত যাবতীয় 'অস্বাভাবিকতার' নানা মাত্রা ঠিক করে দেবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আসলে ইউরোপে সতেরো শতাব্দী থেকেই পাগলদের বন্দী করে রাখা শুরু হয়, সাধারণ অপরাধী থেকে শুরু করে পাগল, ভবঘুরে, ভিখিরি, অর্থাৎ যাবতীয় উৎপাতকে জেলখানায় জমা করা হত। কারণ সদ্য গড়ে ওঠা নতুন আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা তার উদ্দেশ্য আর অর্থনৈতিক মূল্যবোধের কাছে এরা ছিল বিপজ্জনক। এই মানসিকতা থেকেই এদেশে আঠারো শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন জায়গায় পাগলাগারদ গড়ে ওঠে, 'স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার' থেকে বিচ্যুত পাগলছন্নদের জন্যে আধুনিক নিরাময়

ব্যবস্থাও করা হয়। অবশ্য প্রশাসন এদিকে যে খুব একটা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তাও নয়, তবে এদেশে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো ইউরোপীয় পাগল আর ভবঘুরেদের নিয়ে তাদের চিন্তার অন্ত ছিল না। কারণ, একেই এদেশে তারা শাসক, রাজার জাত, তার ওপর ইউরোপীয় সভ্যতা আর উন্নত মানের সংস্কৃতিরও তারা বাহক, আর তাদেরই জাতের লোকজন যদি এদেশের পথে ঘাটে খেপামি করে বেড়ায় তাহলে এদেশের জনগণের চোখে তারা হেয় প্রতিপন্ন হবে। ব্রিটিশ সভ্যতা, ভদ্রতা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলতে পারে। তাই প্রশাসন এই মর্মে নানা ব্যবস্থা নেয়।[৪] আর সাধারণভাবে এদেশীয় পাগলদের জন্যে পরবর্তীকালে কয়েকটা পাগলাগারদ গড়ে উঠলেও তা খুব একটা ইউরোপীয় কায়দায় সমস্ত পাগল আর ভবঘুরেদের ধরপাকড় করতে উৎসাহী হয়নি। এখনও নয়। তার কারণ মনে হয়, যে এদেশে পরিবার আর সমাজজীবনে চিরকালই পাগলদের প্রতি একধরনের সহানুভূতি আর ভালবাসার মনোভাব কাজ করেছে। তারা যেন উদাসীন কিছু পথিক, তাদের গতিবিধি অবাধ। যাবতীয় জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দের ঊর্ধ্বে তাদের স্থান, তারা একান্ত স্নেহের পাত্র। কেউ ভালবাসার কারণে পাগল, কেউ বা ঈশ্বর পাগল আবার কেউবা জ্ঞান পাগল অথবা অনেকে দুঃখ শোকে পাগল। প্রতি রাস্তা ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে আর তীর্থস্থানে তাদের চলাফেরা আর বসবাস। প্রাক-আধুনিক ইউরোপীয় সমাজজীবনের পাগলদের প্রতি সহনীয় মনোভাবের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য মিলবে। তবে সেখানে আধুনিক নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠার সময় থেকেই এই মনোভাবে আসে পরিবর্তন, পাগলদের বন্দী করে রাখা শুরু হয়। কারণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নতুন ধারণা ইতিমধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়ানো পাগলদের উন্মত্ততাকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[৫] সতেরো শতক থেকেই ইউরোপে সমস্ত পাগলদের জড়ো করে পাগলাগারদে পাঠানো শুরু হয়। আধুনিক সংযত আর ভদ্র সমাজের সামনে অবাধে চলে ফিরে বেড়ানো পাগল যেন এক কলঙ্ক, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝেঁটিয়ে পাগলাগারদে বেঁধে রাখা যায় ততই মঙ্গল। এরা যুক্তি, স্বাভাবিকতা হারিয়ে জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে চলে গেছে তাই ইউরোপের বিভিন্ন পাগলাগারদে এদের খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়। তাদের হাতে আর পায়ে বেড়ি, তাদের দেখতে নাগরিকরা ভীড়ও জমায়। হাউস অব কমন্সে ১৮১৫ সালে উত্থাপিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে বেথলেহেম হাসপাতালে প্রত্যেক রবিবার এক পেনি খরচা করলেই পাগলদের কাণ্ডকারখানা দেখা যেত। আর এখানে সারা বছর উৎসাহী নাগরিকদের ভিড় লেগেই থাকত। ফ্রান্সের এক পাগলাগারদের রক্ষীরা আবার শুধু চাবুক মারার ভয় দেখিয়েই বন্দী পাগলদের নাচাত। এ কাজে কয়েক জন রক্ষী আবার বিশেষ নামও কেনে। জন্তু-জানোয়ারের শামিল এই সমস্ত পাগলদের ঠাণ্ডা করার একমাত্র পন্থা ছিল তাদের শারীরিক নির্যাতন করা। নতুন সভ্যতা আর সংস্কৃতির কাছে বিপজ্জনক এই ধরনের যাবতীয় উৎপাত বন্ধ করার

দায়িত্ব বর্তায় পুলিশ বিভাগের ওপর। সমাজে আসে নিস্তব্ধতা, আসে শান্তি। আর তারপরের ইতিহাস তো ক্রমাগত প্রগতির ইতিহাস। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই পাগলদের ওপর থেকে শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা কমতে থাকে, নানা সংস্কার আর মানবিক বন্দোবস্তের আওতায় পাগলদের রাখা শুরু হয়। পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বন্দী পাগলরা এবার ডাক্তার আর মনস্তাত্ত্বিকদের দায়িত্বে আসে। শুরু হয় তাদের বিকৃত মস্তিস্ক সংশোধনের কাজ, যাতে তারা আবার সুস্থতায় ফিরতে পারে। উন্মাদদের প্রতি সামাজিক আচার-আচরণের ক্রমবিবরণ লিখতে গিয়ে—মিশেল ফুকো এই 'মানবিক পর্যায়ে'র পেছনের যে প্রশাসক গোষ্ঠীর গভীর অভিসন্ধি কাজ করে তার অনবদ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এর পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে বর্তমানের ইউরোপ। কিন্তু 'হন্যমানে' পাগলাগারদের যে ছবি আমরা পাই তাতে কিন্তু ইউরোপীয় পথে পা বাড়ানো ভারতীয় প্রশাসনের ওই 'মানবিক পর্যায়ে' উন্নীত হবার কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না। এখানে পাগলদের নিয়ম মাফিক হয়ত বন্দীও করা হয়, কিন্তু বড় বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ পাগলদের কেউ কেউ শেকলে বাঁধা, কেউ বা ছাড়া। 'বাইরে থেকে ভাত-তরকারী...ছুঁড়ে দেওয়া হয় মাটিতে।' কাড়াকাড়ি করে খায় তারা। যাদের কাড়াকাড়ি করে খাবার শক্তি নেই তারা না খেয়ে থাকে, দিনের পর দিন। মারাও যায় প্রতিবছর (পৃ. ১৩৭)। অথচ সরকারি হিসেব-নিকেশে পাগলাগারদ মানবতা আর আধুনিক সংশোধনাগারের চেহারা নেবে। আপাত অর্থে ভারতীয় রাষ্ট্র সংশোধনাগার হিসেবে পাগলাগারদকে গড়ে তোলার আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহ্য গ্রহণ করলেও কার্যত তা পাগলদের ওপর দমনপীড়ন নামিয়ে আনায় পর্যবসিত হয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্র আর জেলের অভ্যন্তরে তার সহায়ক শক্তিগুলির চোখে সাধারণ অপরাধী আর পাগল সমার্থক। তাই জন্তু-জানোয়ারের মতো তাদের খাঁচায় রাখা হয়। লেখিকার সহবন্দিনী এক নাম না জানা বয়স্ক পাগল মাসের পর মাস বেড়িতে বাঁধা থাকে, তার পায়ের চামড়া ফেটে-ফেটে ঘা হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সি জেলের পাগলবাড়িতে হা-হা করা শীতে ঠাণ্ডা লেগে আর না খেতে পেয়ে তারা মরে। সরকারি রিপোর্টে লেখা হয় 'Natural death' (পৃ. ১৩৬-১৩৭)। জেল প্রশাসনের নিঃসীম হিংস্রতার হাত থেকে এক পাগল আসন্ন প্রসবারও রেহাই নেই। ওয়ার্ডারের সঙ্গে অবাধ্য আচরণের দায়ে মেট্রন তার পায়ে বেড়ি বাঁধার হুকুম দেন। 'মাটিতে ফেলে বেড়ি লাগানো পা-টা মাটি থেকে ফুট খানেক উঁচুতে গরাদের গায়ে বাঁধা আছে। বাইরে আসতে পারছে না ওর শিশু। রাত্রির নিস্তব্ধতাই শুধু ভাঙে মায়ের মৃত্যু আর্তনাদে' (পৃ. ১২৯)। দৈনন্দিন দুঃখ, শোক আর আঘাতের অসহনীয় চাপে খেই হারিয়ে উন্মাদগ্রস্ত হলেও জেলগারদে তার রেহাই নেই, জেল প্রশাসন আর তার সহায়কদের কাছে পাগলামিও এক ধরনের অপরাধ। তাই তাদের ওপরেও চলে দৈহিক নিপীড়ন।

জেনানা জগত

জয়া মিত্র তাঁর লেখায় বিভিন্ন সহবন্দিনীদের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই সহবন্দিনীদের অধিকাংশই হচ্ছে নিম্নবর্গের। লেখিকার বর্ণনা থেকে তাদের পারিবারিক আর সামাজিক জীবনের এক অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে। উঠে আসে একের পর এক অজানা কিছু মেয়ের মুখ, আর তাদের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর। বিভিন্ন কণ্ঠস্বর থেকে এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্কেরও আভাস মিলবে। এসেছে গঙ্গার কথা, যার স্বামী তার সমক্ষেই অন্য নারীতে আসক্ত। অথচ সেই স্বামীই সমাজের মুখ পুড়িয়ে গঙ্গার জেলে আসার কারণে তাকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখায়। গঙ্গা আছড়ে পড়ে কাঁদে, সে জানে এ সমাজে স্বামী পরিত্যক্ত হবার মানে কী (পৃ. ১১)। আসে জোগাড়ে মেয়ে ইতোয়ারীর কথা। ইতোয়ারী এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। কিন্তু জাতে না মেলায় তার বাবা-কাকা জোর করে বিয়ে দেয় অন্য আরেক জনের সাথে। চারটে ছাগী আর চল্লিশ টাকায় কেনা স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসে যে ইতোয়ারীর হাতে মাথা ফাটায় (পৃ. ২১)। দুবার তালাক পাওয়া জায়দার প্রথম পক্ষের মেয়ের দিকে তৃতীয় বারের বিয়ে করা মানুষটি হাত বাড়ালে জায়দা তাকে দা দিয়ে কাটে, অতঃপর জেল (পৃ. ২৩)। কমলা মাসী পনেরো বছরে বিয়ে হয়ে সতেরোয় বিধবা। দুজনের খাবার জোগাড় করতে না পেরে তার মা বাধ্য হয় বড় কর্তার বাড়িতে মেয়েকে পাঠাতে। সেই বাড়িতে মেজ কর্তার পাল্লায় তার গর্ভসঞ্চার হলে, মেজ কর্তাই তাকে গঞ্জে গিয়ে ঘরভাড়া নিতে হুমকি দেয়। লোকলজ্জার ভয়ে জাত সন্তানকে মুখে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে কমলা। খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয় সে, আর মেজ কর্তা পৌরুষের অহংকার নিয়ে তাতে সাক্ষী দেন (পৃ. ৪৭-৪৮)। এরকম আরও অনেক মেয়ে বন্দীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ রয়েছে 'হন্যমানের' পাতায় পাতায়।

এরা সবাই প্রমাণিত অপরাধী, অন্তত রাষ্ট্রের আইনের চোখে। ইতোয়ারী, জায়দা, কমলাকে খুনী প্রমাণ করার মতো সাক্ষীসাবুদ আর আইনের সশব্দ উপস্থিতি এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে নির্দিষ্ট ছকে ফেলে তাকে তার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেয়। অবিলম্বে তারা জুডিসিয়াল রেকর্ডভুক্ত কিছু নীরস তথ্যে পরিণত হয়। বিমূর্ত আইনের দলিল দস্তাবেজ আর তার প্রতিষ্ঠানের নিচে চাপা পড়ে অস্ফুট কিছু নারীর কণ্ঠস্বর। এই সমস্ত কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে নিম্নবর্গের মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন। তাদের ওপর পুরুষতান্ত্রিক দাপটে আর তার বিরুদ্ধে মেয়েদের নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধেরও অনবদ্য ছবি পাচ্ছি 'হন্যমানে'। বাবাকাকার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া স্বামী চারটে ছাগী আর চল্লিশ টাকার বিনিময়ে অনিচ্ছুক ইতোয়ারীর শরীরের ওপর স্বামীত্ব ফলাতে এলে ইতোয়ারী তার মাথা ফাটায়। জায়দা তার সহায়সম্বলহীন জীবনে একান্ত আপনার মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে মেরে ফেলে। ছেলের বৌয়ের ঘরে জোর

করে ঢোকা মহাজনকে ছেলে খুন করলে বরদা বুড়ী ছেলেকে বাঁচাতে খুনের দায় নিজের ওপর চাপায়! অথচ …'বরদা বুড়ীর বলিচিহ্নিত গ্রাম্যমুখের সঙ্গে ম্যাডোনার কোনো মিল দেখতে পান না বিচারক…' (পৃ. ২৯)।

লেখিকার সহবন্দিনীদের অধিকাংশই হচ্ছে একেবারে নিচুতলার মেয়ে, চলতি কথায় 'গতর খাটিয়ে'। তাদের জীবনযাপনের নিস্তরঙ্গ কিছু ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ। প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্ব আর তার ছকে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি ঝরতি-পড়তি মেয়েদের জীবনে অবিরাম ঘটে চলা এই সমস্ত ঘটনার সামনে দিশেহারা বোধ করে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ঘটনা আর মালিক / শ্রমিক-কৃষক সর্বস্ব সাদাকালো অর্থনীতি তত্ত্বের চটজলদি ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত বিদগ্ধ মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদ রূপকাঁওয়ার হত্যার মতো বিখ্যাত ঘটনা ঘটলে এর পেছনে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার দাপট খুঁজে বের করেন, গ্রামীণ মাতব্বরদের দুরভিসন্ধিও তিনি ফাঁস করে দেন।[৬] মেজকর্তা আর কমলার ঘটনা হয়ত এখানে এইভাবে মিলে যাবে। কিন্তু গঙ্গা, ইতোয়ারী, জায়দাকে আমরা কীভাবে দেখব যেখানে তাদের বাপ, কাকা আর স্বামীরাই তাদের ওপর পুরুষালি দাপট চালায়। দাপটের মুখোমুখি ইতোয়ারী, জায়দা রুখে দাঁড়ায়, গঙ্গা স্বামী পরিত্যক্ত হবার ভয়ে কান্নাকাটি করে, কমলামাসী অপবাদের ভয়ে অবৈধ সন্তানকে মুখে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। আশেপাশের নিম্নবর্গের মেয়েদের বহমান জীবনযাপন আর সামাজিক অস্তিত্বের নানাবিধ সমস্যার সামনে অর্থনীতি সর্বস্ব বামপন্থা এক উটকো তত্ত্বে পরিণত হয়। তারা কৃষক-সংগঠন, ছাত্র-সংগঠন ইত্যাদির মতো মহিলা-সংগঠন গড়ে নিয়ম রক্ষাও করে। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চাপে মেয়েরা হারায় তাদের নিজস্ব জগৎ। নারী চেতনা বৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে পার্টি রিপোর্টে মহিলা কর্মীদের বিশ্বশান্তি রক্ষা, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়।[৭]

আসলে কমলামাসী, গঙ্গা, ইতোয়ারী, জায়দা ইত্যাদিরা পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। এই সমাজে মেয়েরা জন্ম থেকেই পুরুষের মুখাপেক্ষী, তাদের বাধ্য। মেয়েদের জীবনচর্চা, তাদের আচারবিধি এই সবেতেই এই পুরুষালি নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট। ভারতীয় সমাজে নানা প্রথা, পাপপুণ্য ইত্যাদি ধারণার মধ্য দিয়ে মেয়েদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। নানা শাস্ত্র আর অনুশাসন দিয়ে মেয়েদের নানা বিধি নিষেধের নিগড়ে বাঁধা হয়েছে। এখানে মেয়েদের সব কিছুকে নিঃশব্দে মেনে নেওয়াটাই দস্তুর। কুমারীর কুমারীত্ব, বিধবার পবিত্রতা আর স্ত্রীর স্বামীর প্রতি আনুগত্যই নিয়ম, যার এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। যে ভাবেই হোক মেয়েদের শরীরকে শুদ্ধ পবিত্র রাখতেই হবে। এই পবিত্র নারীর ওপর কুল আর পরিবারের মর্যাদা নির্ভর করে। এই ব্যাপারে তাদের ওপর পুরুষের সজাগ দৃষ্টি যে থাকে তা বলাই বাহুল্য। মেয়েরা তাদের নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করলেই সমাজে আসবে বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য।

মনুসংহিতায় এই বিশৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রীর ওপর পতির প্রভুত্ব থাকবে না আর মেয়েরা স্বাধীন হয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হবে।[৮] তাই পুরুষশাসিত সমাজ নিজেদের মনোমত জায়গায় মেয়েদের বেঁধে রাখতে বন্দোবস্ত করে নানা আয়োজন যাতে মেয়েরা নিঃসাড়ে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, যাকে বহিষ্কার অথবা প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা। কমলামাসীর অবৈধ সন্তান হলে 'সুচতুর' মেজকর্তা তাকে গঞ্জে গিয়ে ঘর বাঁধার কথা বলেন। লোকলজ্জার ভয়ে কমলা তার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, সমাজের ভয় তাকে অধোমুখ করে রাখে, শাস্তি মাথা পেতে নেয়। সামাজিক অনুশাসন নারীর 'বিচ্যুতির' ওপর যতটা কঠোর পুরুষের ওপর ততটা নয়। তাই মেজকর্তা পার পেয়ে যায়। পুরুষালি জুলুমের শিকার অন্য মেয়েদের অবস্থাও তথৈবচ। 'নূরজাহান, নমিতা, অনিতা, বীণা, সরলা, প্রীতি, নীরমায়া, টুসি··· প্রত্যেকেই ধর্ষিতা। সমাজে ধর্ষিতার স্থান নেই, লোকলজ্জার ভয়ে তাদের বাড়ির লোকও তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। তাই জেল হচ্ছে তাদের কাছে 'সেফ কাস্টডি' (পৃ. ১১৯—১২১)। এই ভাবে জেল হয়ে যাচ্ছে আর এক অন্য সমাজ যেখানে যাবতীয় বিচ্যুতরা জমছে। অথচ এই বিচ্যুতির সহায়ক পুরুষ নিজেরাই। এখানে জড়ো হচ্ছে যত ধর্ষিতা, স্বামী-প্রেমিক পরিত্যক্তা আর অনাথ মেয়েরা। এখানেও শেষ নয়। জেল প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে 'কাঁচা মাংসের ব্যবসার বিরাট' মালিকনরা (পৃ. ১১৯) এদের বার করে নিয়ে যায়, ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে।' বন্দীত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই সমস্ত মেয়েরা বাধ্য হয় এই জীবন বেছে নিতে। 'সংশোধনাগার' 'সেফ কাস্টডি' ইত্যাদি শব্দ খচিত জেলখানা আসলে অপরাধ আর অপরাধী আরও বেশি তৈরি করে, আভ্যন্তরীণ আর বাইরের ক্ষমতাশালীরা এর থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়।

ভারতীয় সমাজে জীবনের সব ক্ষেত্রে মেয়েদের এই পুরুষনির্ভর অনাড়ম্বর অস্তিত্বই যেন স্বাভাবিক। সাত চড়ে রা না কাড়া লক্ষ্মীমন্ত মেয়েদের ধারণাই এখানে বার বার শোনানো হয়। সারা জীবন ধরেই তারা পুরুষের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য দেখাবে, পুরুষের দুঃখেই একমাত্র সে দুঃখী, পুরুষের আনন্দেই সে আনন্দিত। পুরুষ নারীর কাছ থেকে একতরফা খালি গ্রহণই করে যাবে, এমনকি তার শরীরও। সেখানে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো স্থান নেই, কারণ তার শরীরের কোন স্বাতন্ত্র এমনকি কামও থাকতে নেই। নারীর প্রতি এই বিধান আর তাদের নির্দিষ্ট আচারবিধির এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে শাস্ত্র, ব্রতকথা আর ধর্মের মধ্যে দিয়ে বহন করা হয়েছে। নানা আখ্যান, যেমন কৃষ্ণলীলায় গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। এই আখ্যানে গোপীরা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, যাদের নিজস্ব কোনো কামাবেগ নেই। শুধুমাত্র কৃষ্ণই এখানে সব, তিনি তাদের প্রলুব্ধ করেন, তাদের নিয়ে যথেচ্ছাচার করেন, আবার তাদের ছেড়ে ইচ্ছে মতো চলেও যান। এখানে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নিছক খেলার বস্তু, কৃষ্ণের আনন্দে তাদেরই আনন্দ। মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে এমত ধারণা সমাজের সব স্তরে বিরাজ করে। নিম্নবর্গের পুরুষদের মধ্যেও। প্রতিবাদী লৌকিক গৌণ ধর্মাচারী

মযহারুলের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গবেষক ফকির আর বাউলতন্ত্রে চালু নারীদেহকে ঘিরে আলাদা আর এক অচেনা জগতের হদিস পান। সেখানে মার্গীয় ধর্ম আর সংস্কৃতি নারীদেহের অশুদ্ধতা সম্পর্কে বার বার বিধান দেয়, তার থেকে দূরে থাকতে বলে, তার বিরুদ্ধে ফকির আর বাউলতন্ত্র গড়ে তোলে ধর্মের নিম্নবর্গীয় এক প্রতিবিন্যাস। এখানে ধর্মাচারণে নারী শরীরের অপরিহার্যতা স্বীকার করেই চালু হয় 'চারি চাঁদের' সাধন। অথচ সেই প্রতিবাদী ধর্মের শরিক হয়েও মযহারুলের বিশ্বাস, 'মূলে তাদের দেহের কামনা থাকে না। তারা কামনা করে শূন্য।'[৯] পুরুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী মেয়েরা নিজেদের গড়ে-পিটে নিলে আর চিন্তা থাকে না, পতিব্রতা নারীর অপরিসীম সহনীয়তাই হয়ে দাঁড়ায় তার ভূষণ। কিন্তু এত আয়োজন থাকতেও কিছু কিছু অযাচিত ঘটনা পরিবার আর সমাজজীবনে নিয়ে আসে বিশৃঙ্খলা, গোপিনী কুব্জা আত্মবোধে উদ্দীপিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলারঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে উদ্যত হলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।[১০] কারণ এই ব্যাপারে একমাত্র কৃষ্ণেরই একচেটিয়া অধিকার।

ভারতীয় সমাজে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখার একাধিক বন্দোবস্ত; পঞ্চায়েত, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। সমাজ সব সময় তাদের ওপর নজর রাখে। পুরুষ শাসিত সমাজের নিয়মকানুনের চাপে মেয়েরা বাধ্য হয় 'আদর্শনারী' হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে, পুরুষের ধারণা হয়ে যায় তার নিজের ধারণা। সত্য, পরিমার্জিত ভদ্র সমাজের ন্যায়-নীতি আত্মস্থ করে 'নারীত্বের' সীমালঙ্ঘনকারী 'খারাপ মেয়েদের' সম্পর্কে বিষোদ্গার করেন বামপন্থী নেত্রী।[১১] ছন্নছাড়া, অশালীন এই সমস্ত মেয়েদের স্থান সমাজের বাইরে, বে-আইনি ঝুপড়ি আর নিষিদ্ধ পল্লীতে। আর জেলখানায় তাদের আসা-যাওয়া তো প্রতিনিয়ত। ভদ্রসমাজে তাদের প্রবেশ নিষেধ। ফুলিয়া স্কুলে ভর্তি হতে গেলে 'হেডমাষ্টার ওকে চিনে নিলেন। তিনি ওর মায়ের 'গ্রাহক' ভর্তি হওয়া হল না। ইস্কুলে ভাল বাচ্চারা পড়ে যে।' (পৃ. ১৩২)।

'হনুমানের' পাতায় পাতায় আসা অন্য মেয়েদের কথা ভদ্রসমাজের যাবতীয় নিশ্চিন্ততাকে ওলটপালট করে দেয়। নাগরিক সমাজে প্রচলিত বিধিব্যবস্থা আর ধারণায় আসে সন্দেহ। জেলখানা আর তার বাইরের এই 'অন্যেরা' আর কতক্ষণ ক্ষমতার দাপট নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে তার বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্র, ভদ্র-সমাজ আর তার যাবতীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার বন্দোবস্ত নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। □

গ্রন্থসূত্র :

'হনুমান' থেকে উদ্ধৃত লাইনের সঙ্গে পাতার নম্বর দেওয়া হয়েছে। 'হনুমানের' প্রকাশক : অন্তধারা, কলকাতা। প্রকাশিত হয়েছে নভেম্বর ১৯৮৯।

১. দীপঙ্কর গুপ্ত, 'ইল্লেজিটিমেট' পলিটিকস অফ দি ইণ্ডিয়ান স্টেট, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, জানুয়ারী ২৩, ১৯৮৮, বোম্বাই, পৃ. পৃ. ১৪০-১৪২।

২. মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য, কলকাতা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৮।

৩. মিশেল ফুকো, ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড পানিশ: 'দি বার্থ অফ দি প্রিজন', ভিন্টেজ বুকস, ১৯৭৯, পৃ. ২৮০।

৪. ওয়ালট্রড আর্নস্ট, দি ইউরোপীয়ান ইনসেন ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া..., ইম্পিরিয়াল মেডিসিন অ্যাণ্ড ইণ্ডিজেনাস সোসাইটি, ডেভিড আর্নল্ড (সম্পাদিত) দিল্লী ১৯৮৯, পৃ. পৃ. ২৭-৪৪।

৫. মিশেল ফুকো, ম্যাডনেস অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন, ভিন্টেজ বুকস, ১৯৭৩, পৃ. পৃ. ৫৮-৬৪।

৬. অশোক মিত্র, প্রতিদিনের কথা, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ. পৃ. ৩৩-৩৬।

৭. ছায়া বেরা, উইমেন অ্যাণ্ড দি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৯০ পৃ. পৃ. ২৪-২৫।

৮. মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য, কলকাতা, পৃ. ৬৩৭।

৯. সুধীর চক্রবর্তী, আপন ঘরে পরের আমি, গভীর নির্জন পথে, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. পৃ. ১৫৮-২০১।

১০. রণজিত গুহ, ডমিন্যান্স উইদাউট হেজিমনি অ্যাণ্ড ইটস হিস্টরিওগ্রাফি, 'সাব অলটার্ন স্টাডিস ৬ষ্ঠ খণ্ড, রণজিত গুহ (সম্পাদিত) দিল্লী ১৯৭২, পৃ. পৃ. ২১০-৩০৯।

১১. শ্যামলী গুপ্ত, বিরাট অ্যাণ্ড দি বুর্জোয়া প্রেস, পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি, নিউ দিল্লী, জুলাই ২৯, ১৯৯০

সুবিমল মিশ্র

প্রেমের গল্প

সে দ্যাখে নেতা ধোপানী নিজের ছেলেকে মেরে রেখে কাপড় কাচছে। কাজ সারা হলে মরা ছেলেকে ফের বাঁচিয়ে তুলে বাড়ি নিয়ে যাবে। এই মেয়েরা দরকার মতো বাঁচিয়ে রাখে, দরকার মতো মেরে ফ্যালে।

আসতে পারবে ?
বোধহয় না···কেন ?
ধ্যেৎ, যদি কিছু বুঝতে পার খুলে না বললে···
তবে খুলেই বল।
সব কথা বুঝি খুলে বলা যায়···
বলতে বলতেই সে তার পেটে চিমটি কেটে দেয় আর ভালবাসা চিমটির জ্বালায় আহা উঁহু করতে করতে গড়াতে থাকে।

ছেলেটা গাছের তলায় বসেছিল। পরনে একটা সাদামাটা প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট। চুলগুলো একটু কায়দা করে আঁচড়ানো। মেয়েটি পরে আছে সালোয়ার কামিজ। শ্যাম্পু করা চুল হাওয়ায় উড়ছে। কোলের ওপর খাতা। ছেলেটির নাম কাশীনাথ, মেয়েটি তাকে আড়ালে ভালবাসা বলে ডাকে। মেয়েটির নাম আশা। আশা বলছে ভালবাসাকে, ভালবাসা তুমি ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাচ্ছো তো ? আর বলো না আশা— বাবা তো এরই মধ্যে খানদুয়েক চিঠি দিয়েছেন। যেতে তো হবেই। ভেবেছিলাম এই ছুটির কটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাবো। কাশীনাথের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল আশা। তারপর বললো : ভালবাসা তুমি ইর্নাজনিয়ারিংয়ের ছাত্র হলে কি হবে এখনো তেমনি গাঁইয়াই রয়ে গেলে। বলে ভালবাসার কোলে হাত রাখল। বিকেলের মিষ্টি রোদে শীতের আমেজ। আশা বাঁ হাত দিয়ে ভালবাসাকে কাছে টেনে নিয়ে নিজেই ওর

গালে একটা চুমু খেয়ে বসল। হাসল হি হি করে। কাশীনাথ শিউরে উঠলো : এ্যাই—করছোটা কি— লোকজন ঘোরাফেরা করছে চাদ্দিকে— খেয়াল নেই··· । আশা এবার ফোঁস করল কপট রাগে : থাক লোকজন। আমি আমার লাভারকে চুমু খাচ্ছি তাতে কার কি···তুমি না সত্যি এখনো সেই গেঁইয়াই রয়ে গেলে। যাও বরং বাড়ি গিয়ে বাবার জমিজমা দেখাশোনা কর। কাশীনাথ মৃদু হেসে বললো : জানো তো তুমি, আড়াল না হলে আমার কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। গতকালই তো রেস্টুরেন্টে এতক্ষণ ধরে··· । সে তো আমি বললাম বলে— তাই···আশা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, আর বলতে বলতে তার কনুইতে একটা মোক্ষম চিমটি কেটে দেয়। ভালবাসা চিমটির জ্বালায় আহা উঁহু করতে করতে গড়াতে থাকে। আশাই আবার শুরু করে : শোনো, ছুটিতে তুমি বরং দেশেই যাও। আমি তো থাকছি না। কোথায় যাচ্ছো ? আশা এবার বলে : কেন তোমাকে বলিনি আমার মামার বাড়ি দিল্লিতে। ক'দিন কাটিয়ে আসবো ওখানে। ওখানে পরিমলদার সঙ্গে সময় কাটাতে দারুণ লাগে। খুব স্মার্ট ছেলে। জিনস আর গেঞ্জি পরে বাইকে করে যখন আসে না কি হ্যান্ডসাম লাগে কি বলবো। ক'দিন খুব আনন্দে কাটবে। কাশীনাথ এবার গম্ভীর হয়ে গেল, বললো : পরিমলদা কে আশা ? ও— তোমাকে বলিনি। পরিমলদা আমার মামাতো ভাই কল্লোলের বন্ধু। খুব ইনটারেস্টিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে আড্ডা দিতে পারে— একটুও বোর লাগে না। খুব খোলা মেলা। দেখা-শোনায়ও ভালো— দিল্লি ইউনিভার্সিটির স্কলার। কাশীনাথ এবার ঢোক গিললো, তারপর বললো : ও···

ভালবাসা

সব সময়েই চোখে অন্ধকার দেখতাম। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চারপাশে কেউ নেই— একটা বিশাল কালো গর্তের ভেতরে পড়ে যাচ্ছি— এরকম একটা অনুভূতি প্রায়ই হতো। নেশা ছেড়ে দিয়ে কাজেকর্মে মন দিতে সবাই বলতো কিন্তু ওসব কথা কিছুই আমার মাথায় ঢুকতো না। মনে হতো একটা পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। একপাশে গভীর খাদ, কে যেন আলতো ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিচ্ছে। পড়ে যেতে যেতে আমি ভয়ে নীল হয়ে যাচ্ছি, ঘুমের ঘোরেও বুঝতে পারতাম একবার নীচে আছড়ে পড়লে আমার হাড়গোড় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রচণ্ড আতঙ্কে ঘুমের ভেতর চেঁচিয়ে উঠতাম। আর ঠিক তখনই দেখতাম মা যেন হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে, দু হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিচ্ছেন, তাঁর মুখে হাসি। মার মুখের সঙ্গে আশার মুখ একদম মিলে যেতো। আর মুখখানা এমন করুণ যে দেখে আমার নিজেরই কান্না আসতো। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শাসন করতেন, যেমন করতেন ছোটবেলায়। আমি একা— বড্ড একা···এভাবে বিপথে গিয়ে তুই কেন আমার মনে দুঃখ দিচ্ছিস ! বললে লোকে

বিশ্বাস করবে না আমি স্বপ্নের ভেতর স্পষ্ট দেখতে পেতাম মার দুচোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে আমার মাথায়, মুখে। মা তখন আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন। তাঁর মুখের চারপাশে কেমন এক অদ্ভুত হাল্কা আলো দেখতে পেতাম, স্বপ্নের ভেতর মাকে দেবীর মতো লাগতো, তারপরই একজোড়া ফর্সা হাতের ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভেঙে যেতো. দেখতাম ঘরের আলো জ্বলছে, আশা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ানো ! সত্যিই ওই সময়টা আমি অধঃপাতে চলে গেছিলাম।

আশা

গায়ে চিমটি কাটলো। দু হাত দিয়ে চোখ রগড়ালো। না তো, সে জেগেই আছে। এ তো স্বপ্ন নয়। সারা ঘরময় একটা মৃদু গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। গন্ধটা তার খুব চেনা। তার ভালবাসা মাঝে মাঝে খায়। ওই তো ভালবাসা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে— তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তারপর দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। একটু একটু করে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে সে। দরজা বন্ধ। তবু কি করে এই পুরুষটি তার ঘরে এলো। সে বলতে গেল : আপনি এখানে এসে ভাল করেন নি। আমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। হাসিমুখে যুবকটি বললো : একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। একথা বলতে বলতেই তার ভালবাসা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেকি স্বপ্ন দেখছে ? সারা ঘরে আবছা অন্ধকার। একটা জিরো পাওয়ারের লাইট জ্বলছে শুধু। আবার একটু একটু করে অন্ধকারের ভেতর থেকেই যেন যুবকটি এগিয়ে এলো তার দিকে। আমাকে দেখে তুমি খুশি হও নি ? আরো কাছে এগিয়ে এলো সে। আপনি আমার জীবনটা নষ্ট করবেন কেন ? আমি কি দোষ করেছি ? আমার স্বামী আছে, সংসার আছে। ভালবাসা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ কথা কাউকে কি বলা যায় ? তার শরীরটা গলে গলে পড়ছে, ঠিক যেন একটা মোমের পুতুল। সে হাত বাড়ালো না। চিৎকার করলো না। পাশেই তো পরিমল শুয়ে আছে। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ডাকবে ? তা হলে ঘরে কে এলো, কে ? ভালবাসা ? কিভাবে এলো ?

মেয়েরা অনেকেই আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। একদিন কলেজ ছুটির পর সে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ পেছন থেকে একজন ডাকলো। ঘুরে দাঁড়ালো সে। শুনুন আপনার কাছে পি.ডি-র কালকের নোটটা আছে ? সে বুঝতে পারছিল মেয়েটি এই সুযোগে তার সাথে আলাপ করতে চায়। আমি তো কাল আসিনি ! তবে

কে যে বললো আপনি কাল এসেছিলেন। মহুয়ার পাশে বসেছিলেন। না— গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে। মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল: সব সময় নিজের মুখটা ওরকম জাম্বুমানের মতো করে রাখেন কেন? জাম্বুমান— সে অবাক। মেয়েটি মৃদু হেসে: সত্যিই আপনি একটা জাম্বুমান— বলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গিয়েছিল। আর তখনই কাশীনাথের কথায় খিলখিল করে বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে উঠল আশা। তারপর বললো: ভালবাসা, তুমি না একটা যাচ্ছেতাই। বলে, একটা ছোট মতন চিমটি কেটে নিয়ে কাশীনাথের হাতে একটা হাত রেখে শুরু করলো: ভালবাসা, কাল আমাদের বাড়িতে কেউ থাকছে না। তুমি দুপুরবেলা চলে এসো। কেন কোথায় যাবে সব? জিজ্ঞাসা করল কাশীনাথ। আশা বললো: বাপি মাকে নিয়ে সল্টলেকে এক মাসির বাড়ি যাবে। ফিরবে একেবারে রাতে খেয়েদেয়ে। আর দাদা তো দুদিন ধরে কলকাতায় নেই। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় গেছে। বাড়ি একদম ফাঁকা। চাকরটাকে দশটা টাকা দিয়ে সিনেমায় পাঠিয়ে দিলেই···। এখন সে ক্যামাক স্ট্রিটের বাইশতলা হাই-রাইজের ষোড়শতলায় গড়ে ওঠা জয়েন্টে সপ্তাহে দু-তিনদিন যায়। এখানে এলেবেলে লোকেরা আসে না। তবে উঠতি পয়সাওয়ালারা মাঝে মধ্যে এক-আধজন এসে পড়ে। মেয়েটি বলল: এখানে আপনি আমার ক্লায়েন্ট। আমি আপনার এন্টার-টেনার। এর বেশি আর কিছু না। মেয়েটি হাতে জ্বলন্ত সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে থাকে। এরপর এক সময়ে ঘরের জিরো পাওয়ার সবুজ আলোটা জ্বলে উঠবে, মেয়েটি তার বাপের বয়সী মদ্যপ লোকটার ট্রাউজারের চেনটা দুটো অভ্যস্ত আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে টেনে নামিয়ে দেবে, দিতে থাকবে। কি ব্যাপার কাকাবাবু, কেমন আছেন? বাবা, তুমি তো অনেক দিন হল এসেছো একবার আমাদের বাড়িতে এলে না কেন? ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছে। ভদ্রলোক একটু কেশে: বাবা, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। বলুন কাকাবাবু। তোমাকে আর কি বলবো বাবা, তুমি আমার ঘরের ছেলের মতো। আমার ছোট মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে। তুমি যদি ওকে দেখিয়ে টেখিয়ে দাও তো খুব ভালো হয়। ও-ই তোমার কথা বলছিল। না, কোনো কিন্তু নয় বাবা। তার পরের দিনই আশা পড়তে এলো তার কাছে। হাতে বই, মুখে হাসি। দরজায় দাঁড়িয়ে বললো: আসবো। এসো। সে মুখ তুলে দেখলো। এর আগে কোনো মেয়েকে সে সেইভাবে মুখ তুলে দেখেনি। গম্ভীর আর লাজুক স্বভাবের জন্য গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা তাকে এড়িয়ে চলে। বসবো। বসো। বইপত্র রেখে বসলো আশা। মুখোমুখি চেয়ারে সে। মাঝখানে পড়ার টেবিল। মাধ্যমিক দেবে এবার? হ্যাঁ, মাথা নীচু করে আশা জানালো। তুমি কোন্ সাবজেক্ট পড়তে চাও? যা পড়াবেন। সে সোজা মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। আশা চোখ নামিয়ে নিল! ছেলেটি আমার মুখোমুখি এসে জিজ্ঞাসা করলো যদি আপনি কিছু মনে না করেন তা হলে আপনার নামটা জানতে পারি? সেই মুহূর্তে বাবার কঠোর শাসনের কথা ভুলে

গিয়ে আমি ওকে নাম বললাম। বাঃ বেশ সুন্দর নাম তো আপনার। ততক্ষণে আমিও একটু সাহস ফিরে পেয়েছি। আমি পাল্টা ওকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনার নামটা বললেন না তো। ছেলেটি হেসে ফেলল : আপনি আমার নাম আদৌ জিজ্ঞাসা করেছেন নাকি? আমি বললাম : এবার তো জিজ্ঞাসা করলাম। ছেলেটি তার নাম বলল : কাশীনাথ। আমি বললাম : কি বুড়ো বুড়ো নাম রে বাবা—যাচ্ছেতাই। আপনার নামের সঙ্গে আপনার চেহারার কোনো মিল নেই। আপনাকে আমি ভালবাসা বলে ডাকবো—কেমন? আমার কথা শুনে কাশীনাথ হেসে উঠলো। তার হাসিতে আমিও হাসলাম। সে হাসতে হাসতে বললো : আপনি হাসলে ঠিক আমার মায়ের মতো লাগে। আমি অবাক হলাম : ভালবাসা, তুমি এ কি বলছো? তখন ছুটতে ছুটতে শংকর এসে ওর পাশে দাঁড়ালো! একটু আড়চোখে তাকিয়ে বললো : কি গুরু এসব কি শুনছি? কি ব্যাপার বলতো শংকর? তুমি তো ভালো ছেলে। কিছু মনে করো না। বলছি যে আমার লাভারের সঙ্গে ইয়ে টিয়ে করো না মাইরি। সে গম্ভীর হয়ে বললো : আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, কি বলছো যা তা? ···দ্যাখো গুরু, বেশি ভ্যানতারা করো না। কি বলতে চাইছি তুমি ঠিক বুঝতে পারছো। সাফ সাফ বলছি গুরু আশার সঙ্গে আশনাই করলে আমি কিন্তু সহ্য করবো না। সে এবার রীতিমত রেগে গেল : এসব কি বলছো তুমি —আমি ওকে পড়াই। ওকে আমি আমার বোনের মতো দেখি। সে আর দাঁড়ালো না। সোজা হাঁটতে শুরু করলো। শংকর পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলতে থাকলো : সেটাই বজায় রাখার চেষ্টা করো দোস্ত। তা না হলে···। একা একা বাড়ি ফেরার সময় আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম যেখান থেকে বাসে উঠি সেখানে প্রতিদিন একটা ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমাকে দ্যাখে। ছেলেটাকে দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম আর ভালো ঘরের বলেই মনে হতো। ওর চোখ দুটো ছিল ভারি সুন্দর। ওই চোখ জোড়া আমাকে মুহূর্তের মধ্যে সম্মোহিত করে তুলতো। ওর প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। তাই ছেলেটি যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসতো আমিও হেসে তার প্রত্যুত্তর দিতাম। ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য মনটা ছটফট করতো। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে পড়ে যেতো বাবার কঠোর শাসনের কথা। আমাকে দেখেই বাবা বলল : কি ব্যাপার আশা, ফিরতে এতো দেরি হল কেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম : দুটোর পর একটু লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। সেখানে নোট নিতে নিতে দেরি হয়ে গেল। বাবা বললেন : আশা, তুমি এখন বড় হয়েছো, নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছো। আশা করি তুমি এমন কোনো কাজ করবে না যাতে আমাদের সম্মানহানি হয়। আমি চুপচাপ মাথা নীচু করে বাবার কথা শুনে গেলাম। পড়তে এসে সে মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি যেন ভাবে। এটা টের পাবার পরের দিন আশাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলো সে : তুমি মাঝে মাঝে কি ভাবো। অন্যমনস্ক হয়ে যাও পড়তে পড়তে। না না, ও কিছু নয়—আপনি পড়ান। আশা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা

করে। তার মনে হয় ও যেন কিছু একটা চেপে যাচ্ছে। আবার জিজ্ঞেস করে : তুমি কিছু চেপে যাচ্ছো আশা। আমাকে খুলে বলো। প্রথমটা চুপ করে থাকে সে। তারপর মৃদু স্বরে বলে : শংকরদা সব সময় আমার পেছনে লাগে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দল বেঁধে। ওদের আমার ভয় করে। গম্ভীর হয়ে যায় সে। কিছু না ভেবেই বলে ফ্যালে : পড়ার পর আজ আমি তোমাকে এগিয়ে দেবো। না না —আঁতকে ওঠে আশা —আমি একাই যেতে পারবো। শংকরের বন্ধুরা সব ভয়ংকর টাইপের। কোনো খারাপ কাজ করতে ওদের হাত কাঁপে না। আপনার ওপরেও···। ঠিক আছে সে আমি বুঝবো। খুব একটা সাহস দেখালো সে। যে সব কথা বলে ফেলেছে তারপর আর ফিরে আসা অসম্ভব। তারপর কিছুটা ইতস্তত করে বললো : আচ্ছা ঠিক আছে, কাল থেকে আর তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই যাবো পড়াতে। তারপর একসময় সে কানের কাছে মুখটা এনে আদুরে গলায় বললো : চলো না আশা, এবার কোথাও চলে যাই দুজনে মিলে। সে কি —কোথায় যাবো? দুজনে মিলে আলাদা কোথাও ঘর বাঁধবো। সুখে সংসার করবো। সে আবার কখনো হয় নাকি —আমি এই ঘর সংসার ফেলে যাবো কোথায়? কেন আপত্তি কিসের —ওই লোকটা তো তোমাকে সন্দেহ করে। তারচেয়ে শুধু তুমি আর আমি মিলে গড়ে তুলবো নতুন সংসার। সে এক সময় বলে : তা হলে আমি কাকে নিয়ে থাকবো? কেন এই তো আমি আছি। সে তো মাঝে মাঝে, লুকিয়ে চুরিয়ে। পুরোটা পেলে তো দুদিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। রোজ রোজ একই জিনিস বেশিদিন ভালো লাগবে না। তোমাকে তো আমি চিনি। বলতে বলতে সে আমার গালে চিমটি কেটে দিল। বেশ জোরে। গালটায় জ্বালা করছিল। সেদিন সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। বৃষ্টি হলে আমার ঠিক ঘুম হয় না। হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। তখন রাত প্রায় বারোটা। চুপচাপ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি। মায়ের কথা মনে পড়ছে। খাওয়া দাওয়ার পর গড়িয়ে নেওয়ার ফাঁকে মা একটু কথামৃত পড়তেন। তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। সেই মা এখন কোথায়! কেন মায়ের বদলে তো আশা এসেছে —আসেনি? পাশের ঘর বন্ধ, নিস্তব্ধ। বন্ধুবান্ধব কারো আজ দেখা নেই। এই দুর্যোগের রাতে কেই বা বেরোবে। রাত যত বাড়তে লাগল, ততই বৃষ্টির চাপ বাড়তে থাকল। একটা পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়েছিলাম। হঠাৎ দরজায় খুট খুট শব্দ। কড়া নাড়াচ্ছে না অথচ শব্দ করছে। কান পেতে থাকলাম। আবার শব্দ। এই দুর্যোগের রাতে কে আমাকে ডাকতে এলো। বিছানা থেকে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর তখনি আবার খুট খুট শব্দ। জিজ্ঞেস করলাম কে? বাইরে থেকে নারী কণ্ঠের চাপা শব্দ : আমি, দরজা খোলো। আশা—স্পষ্ট শুনলাম আশার গলা। আশা! এত রাত্রে! কিছু ভাবার আগেই আবার চাপা অথচ তীব্র কণ্ঠে তাড়া লাগালো : শিগগির খোলো—ভিজে যাচ্ছি। বাইরে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে এই ডাক কারোর পক্ষে শোনা সম্ভব

নয়। দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্রই ঘরে ঢুকে এল সে। আপাদমস্তক বর্ষাতি মুড়ি দেওয়া, মুখে রহস্যময় হাসি। ঢুকেই বললো : দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও, শীত করছে। ইতস্তত করছিলাম। ও চোখের দিকে তাকিয়ে বললো : বলছি, আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও। খুব ঠান্ডা লাগছে আমার। দরজা বন্ধ করে বললাম : এত রাত্রে আমার ঘরে— এভাবে! বলল : যা বৃষ্টি—একা একা ঘুম আসছিল না। ওর তো নাইট ডিউটি তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে লুডো খেলে সময়টা কাটিয়ে দিই। সাপলুডো আছে না তোমার? সাপলুডো খেলতে আমার দারুণ মজা লাগে। তারপর একটু থেমে স্পষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে : কিছু মনে করলে না তো? তখন চেঁচিয়ে তাকে ডাকল শংকর : আরে দোস্ত চললে কোথায়? সে গম্ভীর হল। বললো : শংকর, তুমি যা করছো ভালো হচ্ছে না। আরে আর জ্ঞান দিও না গুরু। ওসব আমার জানা আছে। আমার সঙ্গে তোমার দিলচিসপি করাটা ঠিক হচ্ছে না ইয়ার। আমি কিন্তু লাইন ক্লিয়ার করে নেবো। দুদিন চারদিন··ব্যাস। ঠিক আছে দেখা যাবে। সাহসে ভর করে আস্ফালন দেখালো সে। তারপর দ্রুত সরে গেল সেখান থেকে। মাসখানেক বাদে আবার সেদিন সন্ধ্যায় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে আসছে সে। ক্লান্ত। শংকর এসে সামনে দাঁড়ালো। সঙ্গে আরো তিনজন। তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। হেসে শংকর বললো : আরে কি খবর বলো। সেদিন রেগেমেগেই কেটে পড়লে ইয়ার···। সে যথারীতি গম্ভীর। তবু মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে : খবর তো ভালোই। হঠাৎ শংকরের দোস্তটি, গুন্ডা মতন দেখতে যে, বুকখোলা সার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুকের লোম চুলকোতে চুলকোতে : এখনো কি গুরু ভাইবোন চলছে না লায়লা মজনুতে এসে পৌঁচেছে? সে একবার দেখলো ওকে। একেবারেই লোফার ধরনের। তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। সে কিছু উত্তর না দেওয়াতে আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করলো : আমাদের একটা করে ওরকম বহিন জুটিয়ে দাওনা মাইরি···। এবার আর মাথা ঠিক রাখতে পারলো না সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাটে ছেলেটার গালে একটা থাপ্পড় মারলো। মেরেই বুঝতে পারলো ঠিক করেনি। নাঃ, এত সাহস তার নেই, ঝোঁকের মাথায় যাই করে ফেলুক শংকরদের গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তারা তৈরি হয়েই ছিল। ছেলেটা ততক্ষণে সাইকেলের চেন বের করে ফেলেছে, শংকর তেড়ে এসে চেপে ধরেছে হাত, পেছন দিকে মুড়ে ধরে খিস্তি দিচ্ছে : শালা ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির···। দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয় নি ···কিছু খাবে? না থাক। আচ্ছা ভালবাসা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো? কি কথা? তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো? সে কি কথা! আগে বলো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো কিনা। কিন্তু তুমি কোথায়? জানি না। সত্যি করে বলো তুমি কোথায়। হারিয়ে গেছি। কি নিয়ে বাঁচবো আমি? যা নিয়ে এতদিন বেঁচে ছিলে। সে তো হারিয়ে গেছে। না তা আমি বিশ্বাস করি না। দুঃখ করো না ভালবাসা, যা হবার হয়েছে। তোমাকে তো

বাঁচতে হবে। অন্ধকার। গভীর অন্ধকার। চোখ মেলে দ্যাখে আশা অসভ্যের মতো শুয়ে আছে। গায়ের চাদরটা তুলে আশার সারা শরীর ঢেকে দেয় ভালবাসা। তারপর স্কুটারটা দাঁড় করিয়েই সোজা চলে এল আশার সামনে। কি খবর? অনেকদিন পরে দেখলাম। স্বামী-সংসার নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। কেমন আছেন বলুন? আশ্চর্য ভালবাসার গলায় এখন আর কোনো জড়তা নেই। অথচ আগে কথা বলতে গেলে আটকে যেতো। আশা থ। তার ভেতরটা কেমন যেন করছে। কোনরকমে বললো: ভালো। নিজেই বুঝতে পারলো এ তার কণ্ঠস্বর নয়। এমন কি জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল আপনি কেমন আছেন। ভালবাসা হঠাৎ করেই তুমিতে চলে আসে। জিজ্ঞেস করলে না আমি কেমন আছি। বলো কেমন আছো? বল দেখি কেমন আছি—দেখে কি মনে হয় তোমার? বলতে বলতে ভালবাসা তার চোখে চোখ রাখে। আশা চোখ নামিয়ে নেয়। হ্যাঁ, মজার ব্যাপার ঐ সময়ে সত্যিই অনেক ঘটেছে। একবার পরিমল বেড়াতে এসেছে আশাকে নিয়ে। হঠাৎ মাথাটা বন বন করতে লাগলো, তাকে দরজার পেছনে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগলাম, তারপর সবার অলক্ষে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ঢুকে পড়লাম বাথরুমের ভেতরে। আশা চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু আমার শরীরে তখন অসুরের শক্তি ভর করেছে। ভাগ্য ভালো বাথরুমের দরজাটায় ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিইনি! একটু পরেই দরজা খুলে গেল, বাড়ির লোকেরা ভিতরে ঢুকে আমার হাত থেকে আশাকে উদ্ধার করলো। টানতে টানতে আমায় নিয়ে গেল কলের কাছে, মাথাটা বেসিনের ওপর চেপে ধরে কল খুলে দিল। এত কাণ্ডের পরেও পরিমল নিজের গাড়ি করে আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়েছিল। আমি গাড়ির পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে পড়েছিলাম। আমার আবছাভাবে মায়ের মুখ মনে পড়ছিল। মা খাওয়া দাওয়ার পর কথামৃত খুলে বসেছেন। কানে আসছিল সবাই আমার জন্য দুঃখ করছে। বন্ধুরা বার বার বলছিল মা মারা যাবার পরেই নাকি আমি বখে গিয়েছি। পরে আশাদের বাড়িতে গিয়ে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। সে হাসি মুখে মুখ তুলে তাকালে আমি চমকে উঠেছিলাম। আশার মুখের সঙ্গে মায়ের মুখটা এত গুলিয়ে যায় কেন আমার। মাথা ঘুরে গিয়েছিল, দরজার পাল্লাটা ধরে ফেললাম। আশা হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললো: কিছু খাবে? না গো, সেদিন আমি কিছু মনে করিনি। অফারটা এসেছিল ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো। মধ্যবয়সী এম. ডি-টি বড়ই নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গ দিতে হবে। তবেই চাকরিটা হতে পারে। ও পাড়ারই একটি মেয়ে টোপটা তাকে দিয়েছিল ক্যাজুয়েলি। বলেছিল: জীবনটা সহজভাবে নে, ওরকম হামেশাই হচ্ছে আজকাল। ব্যাপারটা যতটা সামান্য ভেবেছিলাম কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই হলো। নির্দিষ্ট দিনে সেজেগুজে সেই বন্ধুর সঙ্গে হাজির হলাম লোকটার ফ্ল্যাটে। মধ্য কলকাতার পশ এলাকায় ওয়েল-ডেকোরেটেড ফ্ল্যাট। ঘরের মধ্যে এম ডি-র সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে নিতে বলে তার প্রিয় বন্ধুটি তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে

চলে গেল—বললো : একটু বাদে ঘুরে আসছি। নারীর স্বভাবসুলভ অনুভূতি বিপদের গন্ধ পেয়েছিল এর পরে পরেই। নিজের নিঃসঙ্গতা নিয়ে নাকী-কান্না কেঁদে, কখনো কথার মোহ ছড়িয়ে সেই ভদ্রলোকটি যখন সরাসরি ড্রিংকস অফার করলো তাকে, তখনও ততটা ঘাবড়ে যায়নি সে। এরপর ক্রমশ কমে এসেছিল সৌজন্যবোধের দূরত্ব। এয়ার-কন্ডিশন্ড ঘরে বসেও তার সারা শরীর জবজব করছিল ঘামে। কিন্তু বাঁচতে তাকে হবেই। কারো কাছে সে হাত পাতবে না। এমন কি ভালবাসার কাছেও নয়। ভীষণ নাটকীয় সুরে বাবার বয়সী সেই এম.ডি-টির গলা পেঁচিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে কানের কাছে মুখ নিয়ে হিসহিসে গলায় বলেছিল : এ্যাই-প্লিজ আজ না…আজ আমার আবার… কামিং সাটারডে তোমার জন্য —শুধু তোমার জন্য —কেমন…। তবুও এত সহজে মেটেনি লোকটার চাহিদা। কিছুটা স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছিল তাকে, তবু সে মোটামুটি একটা বাঁচতে পেরেছিল সেদিন। বাঁচতেও হবে, আবার ভদ্রতা বজায় রাখতেও হবে। আর একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল আশারই ফ্ল্যাটে, তার জন্মদিনে। কে যেন আমার লাইটারটা সরিয়ে রেখেছিল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখি পকেটে লাইটার নেই। আশা তখন রান্না ঘরে নিজের হাতে একটা বিশেষ চিকেন প্রিপারেশন বানাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম রান্না ঘরে গেলে নিশ্চয়ই ম্যাচিস পাওয়া যাবে। রান্না ঘরে ঢুকে কিন্তু কাউকে পেলাম না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কেমন যেন সব এলোমেলো লাগছে। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো : এখানে কি হচ্ছে শুনি…। চমকে পেছন ফিরে দেখি আশা দাঁড়িয়ে, তার পাশে তার বন্ধুরা। সবাই চুপ করে আমার কাণ্ড দেখছে। বললাম দেশলাই খুঁজতে এসেছিলাম, আমার লাইটারটা হারিয়ে ফেলেছি। দেশলাই খুঁজতে —আশা চোখ পাকিয়ে বললো —তাই বলে তুমি না বলে আমার বেডরুমে ঢুকবে ? জানো না, অনুমতি না নিয়ে মহিলাদের শোবার ঘরে ঢুকতে নেই। শোবার ঘরে কি দেশলাই পাওয়া যায় ? সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশ হল। দেখলাম রান্নাঘর ভেবে আমি ভুল করে শোবার ঘরেই ঢুকে পড়েছি। অনেকেই ততক্ষণে মুখ টিপে হাসতে শুরু করেছে। আশা তারপর একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে হাতের মুঠো থেকে আমার লাইটারটা বের করে বললো : এই নাও তোমার লাইটার। তুমি যখন ড্রিংক করছিলে তখনই আমি এটা তোমার পকেট থেকে তুলে নিই হাঁদারাম। বলে আমার ঘাড়ে আলতো করে একটা চিমটি কাটল সে। আমি বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। □

□

With Best Compliments From :

EASTERN FRUIT PRODUCTS PVT. LTD.

96 MADHUSUDAN BANERJEE ROAD

CALCUTTA 700 051

□

With Best Compliments From :

EMR POLYTEX LTD.

2A NEELAMBER

28B SHAKESPEARE SARANI

CALCUTTA 700 017

Tel. : 47 0209 / 47 6166

□

উদয়ন ঘোষ

শান্তনুর গ্রহরত্ন

শান্তনুর দিনকাল আর ভালো যাচ্ছিল না। সত্তর দশকের শুরুর কিছু পর থেকেই এই ব্যাপার। আর সবাই তবু যাহোক গুছিয়ে টুছিয়ে নিচ্ছিল, সে কিছুতেই কিছু করতে পারছিল না। যে রেটে জিনিসের দাম বাড়ছে কুলোচ্ছে না, প্রাইভেটে ছাত্র পড়িয়ে যে কিছু রোজগার করবে, তারও আশা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। এখন কেউ আর তেমন পড়তে আসে না। দরকার হয় না। পরীক্ষার হলে টোকাটুকি বেড়ে যাওয়ার পর থেকেই এই কাণ্ড। তাছাড়া প্রাইভেট টিউটর হিসেবে শান্তনুর তো তেমন নাম নেই, সে যত শেখাতে পারে, তত পরীক্ষায় পাশ করাতে পারে না। এটা একটা এমন ঘটনা, কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হওয়া উচিত। তার ইচ্ছাও হয় লিখতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। তার তো ওই দোষ, কথা বলতে পারে ভালো, তার চেয়েও ভালো পারে ভাবতে, কিন্তু লিখতে বসলেই গায়ে জ্বর আসে। ভাগ্যিস, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই, না হলে ওই চিঠি লেখা নিয়েই একটা কিছু হয়ে যেত। গৌরী এসব ভালো পারে। এই যেমন চিঠি লেখা, কোনো কিছু টুকে রাখা, দরকারি কাগজ-পত্র ফাইলে রাখা। সে যে এককালে বন্ধু-বান্ধবের কবিতার বইয়ের পিছনের মলাটে দু-চারলাইন লিখত, সেটা এখন যাদু বলে মনে হয়।

মাঝে হঠাৎ গৌরী বেঁকে বসল, প্রতিদিনের খরচার হিসেব লিখতে হবে। কেননা মাসের ২০ তারিখেই টাকা ফুরিয়ে যাবে কেন? আর সবাই ধার না করে সংসার চালায়, তারাই বা পারবে না কেন? নিশ্চয় অপচয় হয় বা শান্তনু টাকা হারিয়ে ফেলে। তাই হিসেব হবে।

এজন্য গৌরী তাকে এমন এক সুন্দর নোটবুক কিনে দিয়েছিল যার সঙ্গে একটি ছোট্ট পেনসিল চমৎকার বাঁধা থাকত। তবু পারেনি শান্তনু। ২/৪ দিন চলেছিল, তারপর যে-কে সেই।

শুধু তো এই নয় এর পরেও আছে। গৌরীর এক মাসতুতো ভাই এখানে, এই আসানসোলে ধাদ্‌কা পলিটেকনিকে পড়ত। গৌরীর এই মাসী প্রায় কুবের বলা যায়। কিন্তু ছেলেটি মোটেই ভালো না। এক ছেলে বা একমাত্র সন্তান বলেই হয়ত বাপ-মায়ের সে-ই সবেধন নীলমণি হওয়ায় সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। তাই সাতঘাটের জল খেয়ে ও পড়ে তার এই পলিটেকনিকে পড়তে আসা, বাস্তবিক টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরে দুলাল দেখার মতো মজা পেয়েছিল শান্তনু। বোধকরি সেটা তিন বছরের কোনো ডিপ্লোমা কোর্স ছিল; ঊনসত্তরে ভর্তি হয়েছিল। ভর্তি হবার সময় ওই কুবের মাসী মেসো খুবই ঘটা করে এসেছিল। সত্যি বলতে কী, সে সময়ে তার খুব খারাপ লাগেনি বরং দুহাতে খরচ করার ইমেজ রেখে তারা চলে গেলে, মনে আছে ভালো, শান্তনুর

উৎসব শেষ হলে যেমন হয় তেমন ফাঁকা লেগেছিল। অবশ্য সে উৎসব যে নিষ্কণ্টক কোনো ফেস্টিভ্যাল, এটা ভাবলে ভুল হবে, কেননা তাতে কাঁটা ছিল। বিলক্ষণ কাঁটা ছিল। কেননা এর তো রিটার্ন দিতে হবে। সে না দিক গৌরী তো দেবেই। তার এই ফাঁকা পকেটে সেই রিটার্ন দেওয়া হবে আরেক বোঝা, শুধু শাক ভাত খাওয়ালেও, সে শাকের আঁটি বোঝার উপর তাকে বিপদে ফেলবে। হ'লও তাই। সপ্তাহে প্রতি শনিবার ধাদ্‌কায় ফোন ওই দুলালকে। রবিবার এসো। যার অর্থ চর্ব-চোষ্য খাও। ফাটা পকেট ফুটো করে দাও। কিন্তু ভাগ্য ভালো, সব রবিবার সেই দুলাল আসত না। কেননা রবিবারে কোন দুলাল আর এ বাড়িতে আসতে চায়! এ বাড়িতে রবিবারে অ্যাডভান্স কেনা সিনেমার টিকিট থাকে না, রেডিও থাকলেও, তাতে সিলোন থাকে না। কাগজ থাকলেও স্পোর্টস বা মুভির কোনো ম্যাগাজিন থাকে না। কেন আসবে প্রতি রোববার শুধু খেতে? যা সে, দুলাল, জীবনভোর বিস্তর খেয়েছে। কিন্তু ওই ঘন ঘন না আসা যে একদিন এভাবে পুষিয়ে নেবে দুলাল, কে জানত?

তখন ১৯৭০। দেশজুড়ে নকশালবাড়ি থেকে বিপ্লবের দাবানল একদিন শান্তনুকে বিপদে ফেলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। হায় সেই সময়, যখন জিনিসের দাম বাড়ছে, যখন তার পকেটে পয়সা নেই, যখন তার হাতে টিউশনি নেই তখন সেই মহা আকালে এরকম দাবানল শান্তনুকে দগ্ধ করল। সে এ. বি. টি. এ.-র মেম্বার হয়ে সি. পি. এম.-এর কাছাকাছি ছিল বলে এরকম ভাবছে তা না। তবে হ'ল কী, সেই দুলাল দাবানলের ভয়ে কেঁচো হয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিল তার বাড়িতে। শুরু হল শান্তনুর সমস্যা। সে কি কেবল একধরনের? নানা ধরনের সমস্যা। ক্রমে এই সমস্যা হায়ড্রার মাথার মতো বহুমুখী হ'ল। এক. ওই দুলাল তাদের বাড়িতে পাকাপাকি থাকতে লাগল। তার সকালে ডিমসেদ্ধ চাই, পাউরুটি-মাখন তো চাই-ই। সন্ধ্যায় তার আবার স্নান করা চাই। এই জলকষ্টের আসানসোলে যে সে কী বিলাস, এ ভুক্তভোগী ছাড়া, খরায় আক্রান্ত অঞ্চল ছাড়া, গোবি-সাহারা ছাড়া আর কে বুঝবে! তার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে প্রত্যহ বেরিয়ে রাত ১০টায় ফেরা ও ফিরেই গরম গরম ডিনার, একি চাট্টিখানি কথা? শান্তনুর ফাঁকা পকেট ফুটো হওয়া দূরের কথা, বলা উচিত তার পকেট থাকাই বাহুল্য হয়ে গেল। কেননা মাসের দশ বারোদিন পর তার পকেটে কিছু থাকতো না। আগে তবু ২০/২২ তারিখ অব্দি থাকত। দুই. সব সময় গৌরীর এই দুলালের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত ভাব তার অসহ্য লাগত। সে মাথা ঠিক রাখতে পারত না। গৌরীর সঙ্গে ক্রমে তার কথা কাটাকাটি শুরু হ'ল। তিন. তাদের বাড়িতে আসলে একটিই ঘর যা শোবার ঘরের মতো মাপে কিছু বড়। বাকি আছে ভাঁড়ার ঘর, যা খুবই ছোট। সে ঘরে একজন শোবার মতো একটি চৌকি ছাড়া দুটি আলমারি মাত্র রাখা যায়, তারপর আর জায়গা থাকে না। ওইখানেই এক আলমারির উপর কেরোসিন স্টোভ আছে, যেখানে চা ও

এমার্জেন্সি রান্না হয়। যে কারণে ঘরটির ছাদ ও একদিককার দেয়াল কিছু কালচে। এই ঘরে একা গৌরী শুত। যার জন্য টুইনস্ আনন্দ পেতে শান্তনুকে নানা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে হ'ত। যা সর্বদাই নিশ্চিন্তের ও সুখের হ'ত না। বড় ঘরে দুটি সিঙ্গল খাট, যা এতকাল জোড়া থাকত, ওই দুলালের সৌজন্যে আলাদা করা হ'ল। তার একটাতে সে ও অপরটাতে ওই দুলাল শুত। এ বড় অসহ্য, এই যুবক নিয়ে শোয়া যে আবার মাঝরাত্রে মশারির বাইরে গিয়ে জানলার ধারে বসে সিগারেট খেত, যা একপ্রকার তার নিদ্রাকে অজুহাত করলেও তার জাগ্রত তন্দ্রাকে অসম্মানই করত বলা যায়। **চার**• যদিও এই দুলাল নকশালদের খতম অভিযানে ভয় পেয়ে ও নিজেকে বাস্তবিক প্রতিক্রিয়াশীল বুঝে তার আদুরে পিঠের চামড়া বাঁচাতে ধাদ্‌কা ছেড়ে তার ঘাঁটিগলির ফ্ল্যাটে এসেছিল, তবু সে যে আবার তলে তলে ওই নিজেকে বাঁচাতেই নকশালদের তোষামোদ করত, এটা শান্তনু প্রথম প্রথম আদৌ বুঝতে পারত না। একদিন হ'ল কী, রাত্রি ১০টায় আড্ডা-ফাড্ডা মেরে ওই দুলাল এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এল। জানাল, বন্ধু এখানে থাকবে ও খাবে। বন্ধুর ছিমছাম চেহারা, দামি জামা-কাপড় দেখে গৌরী দূরে থাক শান্তনুরও আদপে কোনো সন্দেহ জাগেনি। গৌরীর কথামতো দুই বন্ধুকে তাদের একমাত্র শোবার ঘর ছেড়ে সে ও গৌরী সহজেই দুজনে ভাঁড়ার ঘরের সিঙ্গল চৌকিতে কষ্টে-সৃষ্টে শুল। কষ্টে-সৃষ্টে বললে একান্তই ভুল বলা হবে, কেননা ওইদিন শান্তনু গৌরীকে নিয়ে আনন্দ করেছিল। কিন্তু এই আনন্দেরও শেষটা সেদিন তেমন জমেনি। গৌরী এসবের পরে ভালোই ঘুমোতে পারে কিন্তু শান্তনু সেরকম ঘুমোতে পারে না। উপরন্তু দু-বন্ধু সেদিন সারারাত জেগে গল্প করে তাকে খুব ডিসটার্ব করেছিল। সেদিনও শান্তনু কিছু বোঝেনি, কেননা তাদের কথাবার্তা এ ঘর থেকে আক্ষরিক বুঝতে পারেনি সে। বোঝা যায়ও না। বুঝেছিল, অল্পদিন পরে এবং বলা বাহুল্য আরেক রকমের বিপদে পড়েছিল। সেদিন কী একটা ব্যাপার ছিল। স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। বেলা প্রায় বারোটা হবে, শান্তনু ফিরছিল ছুটির মেজাজে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পাড়ার পিওন তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একটি প্যাকেট। সাদা কাগজে চমৎকার প্যাক। তাতে প্রায় মঙ্গোলীয় হস্তাক্ষরে দুলালের ঠিকানা লেখা। প্রেরকের কোনো ঠিকানা নেই। সেখানে আবছা রবার স্ট্যাম্পে মুদ্রিত আছে নেপালের বিরাটনগরের ইল্লিজিব্‌ল্ কোনো এক পুস্তক ভাণ্ডারের ছাপ। যা দেখে বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই প্যাকেটে বই আছে। এই একটা ব্যাপার অর্থাৎ বই যা শান্তনুকে কখনও চিন্তিত করে না, যেজন্য নিতান্ত সাদামাটা বাহক হয়েই প্যাকেটটি গৌরীর হাতে তুলে দেবার সময় সে স্বয়ং শান্তনু-সুলভ রসিকতা করে বলেছিল, এই নাও শালার বই। গৌরীর দিকে সে সচরাচর তাকায় না। কিন্তু রসিকতার জন্যই হোক বা অকারণেই হোক সে সেদিন মুখের দিকে কেন যেন তাকিয়েছিল। দেখেছিল যে গৌরী প্যাকেটটি নেবার সময় অযথা তাড়াহুড়ো

করল ও অসম্ভব সন্ত্রস্ত লাগল তার মুখ। কিন্তু ওইটুকু হ'লেও না হয় কথা ছিল। ভাবা যেত, দুলালের প্রতি তার এলার্জি বলে গৌরী দুলাল সংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারে কমপ্লেক্সে পড়ে। কিন্তু গৌরী আরও কিছু করল, বলল,

—তুমি কোথায় পেলে এই প্যাকেট ? কে দিল ?

—কেন পিওন, যার দেবার কথা ?

—ও, পিওন, তাই বল !

বুঝতে বাকি থাকেনি শান্তনুর, গৌরী শেষ অব্দি ভালোই সামলে নিল। সন্দেহের কাঁটা অনেক আগের থেকেই তার কপাল পয়েন্ট করে এগুচ্ছিল, এখন প্রকৃত বিদ্ধ হ'ল। অবশ্য সে বোকার মতো তখন অন্তত ভেবেছিল, এসব সিনেমা-টিনেমার কাগজ হবে, যা সে পছন্দ করে না। ব্যাপারটা তাই হ'লেই বোধহয় ভালো ছিল, অন্তত শান্তনু তো বিপদে পড়ত না। কিন্তু ব্যাপারটা তা হ'ল না। তা হ'তে পারেও না। কেননা সে নেহাতই বোকা, আগে বোঝেনি যে নেপালের বিরাটনগর থেকে ওই সত্তরে সিনেমা সংক্রান্ত কাগজ আসতে পারে না, অন্য কোনরকমও কাগজ আসতে পারে না, একমাত্র আসতে পারে পিকিঙে ছাপা, হয় পিকিঙ রিভিউ, নয় সি. পি. সি. বা চেয়ারম্যান মাও-এর বুলেটিন বা ডকুমেন্ট। আর সেগুলি কিছুদিন পড়ে থাকত তাদের সবচেয়ে নোংরা জায়গা বাথরুমের পাশে, যেখানে তাদের এক চিলতে প্যাসেজের শেষ ও যেখানে কয়লা-ঘুঁটে রাখা হ'ত, রাখা হ'ত সংসারে যা রাখা যায় না অথচ যা তৎকালে ফেলাও যায় না, যেমন শিশি-বোতল, ফুটো ড্রাম বা বালতি, পুরনো জুতো যা কোনো কারণে বেখাপ্পা অথচ অটুট, কিছু বই কাগজ যেমন পুরনো 'দেশ', যা থাকত একটি ডালাভাঙা টিনের স্যুটকেসে। সেখানে একদিন ওই প্যাকেট ওই টিনের স্যুটকেসেই, হায়, পুরনো 'দেশ'গুলির ভিড়ে পড়ে থাকতে দেখল। এই সেই পুরনো 'দেশ' পত্রিকা, যা নিয়ে শান্তনুর সেই অবিস্মরণীয় ঠাট্টা, একদিন এই 'দেশে'র সাপ্তাহিক ভিড়ে আমাদের স্নেহের মিডল্‌ক্লাস ঢাকা পড়ে যাবে ; কেননা মাটির দেশ তবু ছাড়তে পারে এই মিডল্‌ক্লাস কিন্তু কাগজের 'দেশ' প্রাণ ধরে ছাড়তে, বেচতে বা পোড়াতে পারে না কেউ। অন্তত গৌরী তো পারে না। সে 'দেশ' বাঁধাবে বলে, সংখ্যার পর সংখ্যা সাজিয়ে রাখে। যখন ঘর উপচে পড়ে এই 'দেশে', তখন কপাল কুঁচকে, 'এইসব বাঁধাতে তোমার কীসের যে আপত্তি, বুঝি না ! আমার কোনো শখই তুমি মেটালে না' বলতে বলতে ২০/২৫টা 'দেশ' এক সঙ্গে কাগজে, বলার দরকার নেই যে আনন্দবাজারেই প্যাক করে, গৌরী রেখে দিত সেই আলগা-বাক্সে। আর সেখানেই একদিন, গৌরী ও দুলাল যেদিন বাড়ি নেই, কী একটা দুলালীয় সামগ্রী কিনতে ভাই-বোনে বাজারে, তখন অকারণই, একটি বই খুঁজতে যা নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার বই, যে বই-এর প্রয়োজন বহুকাল আগে একবার হয়েছিল, খুঁজে পায়নি তখন, এখন প্রয়োজন নেই তবু সেই স্মৃতির কারণে, দেখা যাক বইটা বাড়িতে কিনা, এভাবেই খুঁজতে গিয়ে সে পেয়েছিল ওই ধরনের আরেকটি

প্যাকেট ; দেখে ভূত দেখার মতো চমকে গিয়েছিল। সে সেদিন সেই প্যাকেট খুলে, কী আছে ভেতরে, এই কৌতূহলে, খুবই ক্ষিপ্র হ'তে পেরেছিল, দেখেছিল, পিকিঙ রিভিউ-এর তিনটি সংখ্যা, সঙ্গে মাও-এর
"Interview with Three correspondents— From The Central News Agency, The Sao Tang Pao and the Hsiu Min Pao", "Present-day Colonial, Semi-Colonial and Semi-Feudal Society", "Statement of the Spokesman of the Revolutionary Military Commission of the Central Committee of the Chinese Communist Party to the correspondent of the Hsinhua News Agency", "Everything, through the United front is wrong", প্রমুখ চারটি প্যাম্পলেট। তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ; এইসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলিল, আহা এভাবে পড়ে! আজও প্যাক খোলা হয়নি, অথচ দুলালের নামে তারই প্রযত্নে আসছে সুদূর পিকিঙ থেকে নেপাল হয়ে, কিন্তু কেন ? তার মনে পড়ে গেল, ১৯৫১'র কলকাতার ট্রাম-মুভমেন্টের কথা, যা ছিল এক পয়সার লড়াই, ট্রামের একপয়সা ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে যখন কলকাতার মানুষ ফেটে পড়েছিল প্যারি কমিউনের মতো উৎসাহে ও হিংস্রতায়। আঃ— সে সব দিন ভুলবার না। সবে তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বি. পি. এস্. এফের সে নতুন সক্রিয় সদস্য। রাত-বেরাতে গেরিলা কায়দায় তখন হয় ট্রাম-লাইন তোলা, নয় রাস্তায় অবরোধ। ভাবাই যায় না তখন শান্তনুও রাস্তায় নেমেছিল। এও ভাবা যায় না যে, তারই প্রফেসরকে সে স্বচক্ষে দেখেছিল গভীর রাত্রে ট্রামের লাইন ওপড়াতে। কিন্তু প্রসঙ্গ তা নয়— সেই সময় অন্ধ কমিউনিস্ট পার্টির এক ফ্যাকশন, ফিফটিওয়ান ফ্যাকশন নামে যাদের প্রসিদ্ধি, তাদের কিছু দলিল তার নামে আসত কিন্তু নিয়ে যেত সেই প্রসিদ্ধ হোলটাইমার, এখন সি. পি. আই করে। এই ব্যবস্থা সে মানতে বাধ্য হয়েছিল, কেননা সেই হোলটাইমারের কাছে সে ছিল কৃতজ্ঞ। তার বাবা মারা যাবার পর সে তাদের জন্য অনেক কিছু করেছিল। মা এই একমাত্র কমিউনিস্টকে সহ্য করতে পারতেন। কমিউনিস্টরা ছিল মার দুচোখের বিষ। পার্টির এই হোলটাইমার যদিও ছিল কসবার এল.সি-র সেক্রেটারি কিন্তু তার এই গোপন উপদলীয় কারুকার্য সে একদম বুঝত না। সে জানত মাত্র, এই গোপন দলিল তাদের বাড়ির ঠিকানায় আসবে এবং এলেই সময়-সুযোগ মতো সেই হোলটাইমারের কাছে পেঁছে দিতে হবে, কেউ যেন টের না পায়। এরকম গোপন কাজ করতে সে-বয়সে, খুবই থ্রিল লাগত তার। এরকম থ্রিল পেতে তাদের এই দুলাল তারই মতো মাত্র বেয়ারারের কাজ করছে না তো ? এবং এই কাজে দুলালের দিদিও পার্টনার। এমন পার্টনার যে শান্তনুর কাছেও অপ্রকাশ্য, যদিও তার সেই পার্টনার, বলার নেই যে, তারই স্ত্রী, গৌরী। কিন্তু তখনই যে সে বিপদে পড়বে ভেবেছিল, তা নয়। তবে এ. বি. টি. এ.

কাম সি. পি. এমের কাছাকাছি থেকে এই অতিবাম ঝোঁক অর্থাৎ এই নকশালী দলিলাদি যে মোটেই বরাভয়ের ব্যাপার না বরং উৎকণ্ঠারই ব্যাপার যদিও এসব তথাকথিত মার্কসীয় সাহিত্যই. কিন্তু হলে হবে কী, ততদিনে যে কমিউনিস্ট দুনিয়া দ্বিধাবিভক্ত, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার ইস্পাতকঠিন ঐক্যে তখন ফাটল ধরেছে। সুতরাং তখনও বিপদে না পড়লেও শান্তনুর উৎকণ্ঠা বেড়েছিল। তারই বাড়িতে তাকে ঘুণাক্ষরে কিছু না জানিয়ে এমন গোপন ব্যাপার-স্যাপারে সে অভিমানী না হয়ে পারল না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলল না কাউকেও। চুপচাপ দেখে যেতে থাকল। ইতিমধ্যে দুলালের সেই বন্ধু আবার একদিন এল। তার কেমন সন্দেহ হ'ল। সে ঠিক করল, এই বন্ধুকে কিছু ওয়াচ করতে হবে। এদিন শান্তনু প্ল্যান করে রাত গভীরে, গৌরী যথারীতি ঘুমিয়ে পড়লে, ঘর ছেড়ে, বাইরে তাদের সেই এক চিলতে প্যাসেজের বাথরুম যাবার পথে, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছিল, নিজেরই শোবার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে। হ্যাঁ, আড়ি পেতে সব শোনার জন্যই সে, শান্তনু, স্বয়ং তাদেরই শোবার ঘরের বন্ধ দরজার পাল্লায় কান রাখছে— এককথায় খুব অদ্ভুত যদিও, তবু সে করেছিল এবং শুনেছিল যা, তা বড় ভয়ানক। তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এই বন্ধুটি প্রায় সেই হোলটাইমার, যে কিনা ওই প্যাকেটগুলি নিতে আসে। শুনেছিল, অনেক কথার মধ্যে এই কথাগুলো যা প্রকৃতই ভয়ানক, "তাহলে ওই কথাই রইল, প্যাকেট যখন একবার খোলা অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন সন্দেহ করতে হবে তোর রিভিসনিস্ট জামাইবাবুকেই। তাছাড়া এ. বি. টি. এ. করা সি. পি. এম. মার্কা টিচারগুলো দু-মুখো সাপ, আমাদের প্রকৃত শ্রেণীশত্রু। দরকার হ'লে খতম করতে হবে। মনে রাখতে হবে ওই প্যাকেটেই ছিল সেই ইম্‌পরট্যান্ট ডকুমেন্ট, চেয়ারম্যানের 'এভরিথিং থ্রু দি ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট ইজ রং', যে দলিলে চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন, ইন্ শর্ট, নাইদার শুড উই ব্রেক আপ দি ইউনাইটেড ফ্রন্ট নর শুড উই বাইন্ড আওয়ার-শেলভস্ হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট ; হেন্স দি শ্লোগান অব এভরিথিং থ্রু দি ইউনাইটেড ফ্রন্ট শুড নট বি পুট ফরোয়ার্ড। ইফ্ 'সাবমিশন টু দা ইউনাইটেড ফ্রন্ট ইন এভরিথিং' ইজ ইনটারপ্রেটেড অ্যাজ 'সাবমিশন ইন এভরিথিং', দেন দ্যাট টু ইজ রং। এই ইউনাইটেড লেফট্ ফ্রন্ট, যা বাংলা কংগ্রেস, তথা কংগ্রেসকে নিয়েই, যারা আসলে কুয়োমিনটাঙ। যার নেতা অজয় মুকুজ্জে হল চিয়াংকাইশেকের কার্বন কপি, সেখানে সি. পি. এম. নিজেদের সাবমিট করছে ও সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের পেটাচ্ছে তাদের বা ওই ইউনাইটেড ফ্রন্টকে কখনো ক্ষমা নয়। মনে থাকবে তো ? এই জামাইবাবুর যতই তুমি খাও আর পর, আমাদের সঙ্গে যখন হাত মেলাতে চাও তখন ওই সব রিলেশন মাথা থেকে ঝেড়ে বাদ দাও, দরকার হলে এই জামাইবাবুকেই খতম করতে হবে, যদি সে বাড়াবাড়ি করে, কিংবা খোচোর হয় ; কী, মনে থাকবে ? মনে আছে তো, সি. এম.-এর সেই শ্লোগান : প্রতিক্রিয়াশীলদের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হবে।..." উত্তেজিত কথা শেষ হলে ভিন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল, ও. কে।

না, আর না, এসব শোনার পর করণীয় একটিই থাকে, অন্য কিছু না, গৌরীকে ডেকে শোনানো। সেদিনই পারেনি শান্তনু, কেননা সেদিন তারা আরো অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছিল শুয়ে শুয়ে। শান্তনু না শুনে পারেনি। প্রায় থ্রিলার পড়ার সাসপেন্সে সে আসানসোলের মধ্যরাত্রির অসম্ভব মশা সহ্য করে সব শুনে গিয়েছিল। শুনতে শুনতে রাত ভোর করেছিল। সে সব কথার কিছুই ভোলেনি সে। শুনেছিল··· "তাহলে সি. পি. এম. আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ছেলে বিয়ে করে পর হয়ে গেলে মা-বাবার কাছে সে-ছেলে যেমন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, না ঠিক তেমন নয়; পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ির যে সম্পর্ক, প্রায় সেই সম্পর্ক। ওরা আমাদের পেটাবার জন্য এদেশের জনস্বার্থবিরোধী সংবিধানের সাহায্য নেয়। পুলিশ-সি. আর পি.-মিলিটারি ডাকে। বামফ্রন্টের ধুয়া তুলে দক্ষিণপন্থী ঝোঁকওয়ালা পার্টিগুলির সঙ্গে বসে আমাদের খতম করার পরিকল্পনা করে। সি. পি. এমের কে বেশি আত্মীয় হ'তে পারত, আমরা না বাংলা কংগ্রেস? আমরা না সংবিধান?···

···"তুমি যদি রাজনীতি শিখতে চাও তাহলে ঘটনা-সন্ধানী বৈঠকে যোগ দাও। ঘটনা-সন্ধানী বৈঠক কী? ঘটনা-সন্ধানী বৈঠক হল, একটি লোকালয়ের এগিয়ে-থাকা, মধ্যবর্তী ও পশ্চাৎপদ মানুষের সঙ্গে সেই লোকালয়ের উৎপাদন ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কৃতির সম্পর্ক খোঁজা এবং সেই সূত্রে সেই লোকালয়ের চরিত্র বোঝা। এভাবে অনেকগুলি লোকালয়ের চরিত্র বুঝলে আমরা এদেশের রাষ্ট্র চরিত্র বুঝতে পারব। রাষ্ট্র চরিত্র না বুঝলে জনগণের দুঃখকষ্টের মূল কারণ ও দুঃখকষ্ট দূর করার সঠিক রাস্তা পাওয়া যায় না। আমরা একটি ঘটনা-সন্ধানী বৈঠক করে বর্ধমানের একটি গ্রামের সম্পর্কে জানতে পারলাম যে এই গ্রামের শতকরা ৪০ ভাগ জমি রয়েছে ভূস্বামীদের মালিকানায়, শতকরা ৩০ ভাগ জমি ধনীকৃষকদের মালিকানায় এবং ১০ ভাগ ভূস্বামী ও ধনীকৃষকদের মালিকানায় বংশানুক্রমিক দেবোত্তর সম্পত্তি। সবটা মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে জমির ৮০ ভাগ রয়েছে ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের মালিকানায় আর মাত্র শতকরা ২০ ভাগ রয়েছে মধ্য ও গরিব কৃষকদের মালিকানায়। অথচ ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসখ্যার ১ ভাগের বেশি নয় এবং ধনী-কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের বেশি নয়— যেখানে দরিদ্র ও মধ্য কৃষক মিলিয়ে ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ। একদিকে জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৬ ভাগ লোক মালিকানা ভোগ করছিল শতকরা ৮০ ভাগ জমির উপর, অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোক মালিকানা ভোগ করছিল মাত্র ২০ ভাগ জমির উপর। এ অবস্থা চলতে পারে না। এ অবস্থা বদলানো দরকার। দরকার, জনসংখ্যার পনেরো আনা লোক জমির পনেরো আনা মালিকানা পাবে। কিন্তু দেশের সংবিধান ও আইন বৈধভাবে এই অবস্থা আনতে দেবে না। অর্থাৎ বৈধ পথে আমাদের দেশের ৮০ জনের জন্য দেশের ৮০ ভাগ জমির বিলি-ব্যবস্থা করা যাবে না। কেননা সংবিধান বলছে, ক্লজ নাইনটিনে: অল সিটিজেন শ্যাল হ্যাভ দা রাইট টু অ্যাকোয়ার, হোল্ড, অ্যান্ড ডিসপোজ অব

প্রপার্টি। লক্ষ কর, রাইট টু অ্যাকোয়ার, নট দা রাইট টু সিজ দা প্রপার্টি। তবু যদি অ্যাকোয়ারের ভুল ব্যাখ্যা করে, এজন্য সংবিধান থার্টিওয়ান ক্লজে বলছে, নো পার্সন শ্যাল বি ডিপ্রাইভড অব হিজ প্রপার্টি সেভ বাই অথরিটি অব ল। এখন বোঝ! বৈধ পথে কী সম্ভব? ওই এইট্টি পারসেন্ট পিপলের জন্য ল্যান্ড সিজ করা বা অন্তত ওই অ্যাকোয়ার করাও কি সম্ভব বৈধ পথে? বল! কেমন করে সংবিধান পিপলের ভাত মারছে, বোঝ, এমনিতে নো পার্সন শ্যাল বি ডিপ্রাইভড অব হিজ প্রপার্টি— মন দিয়ে শোন্ প্রপার্টি সেভ বাই ল! অথচ ওই এইট্টি পার্সেন্ট ল্যান্ড মাত্র— সিক্স পার্সেন্ট পিপলের দখলে, হোল্ড করা। কাজে কাজেই অবৈধ পথে সংবিধানের বাইরে গিয়ে, তোর জামাইবাবু মার্কা সি. পি. এম.-দের পার্লামেন্টারি পথের বাইরে গিয়ে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পথ ধরেই শতকরা ৮০ ভাগ লোকের জন্য জমি দখল করতে হবে এবং এই দখল হবে আসলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কেননা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মধ্য দিয়েই মাত্র সংবিধানকে দখল করে তাকে জনস্বার্থে পাল্টে নেয়া যায়। এছাড়া আর কোনো পথ সামনে খোলা নেই।··· সর্বদাই মনে রাখতে হবে আমাদের পথে ফুল ছড়ানো নেই, বিশেষত তোর জামাইবাবুর দল তো কাঁটা ছড়াতেই আছে। ওরা হল ধনতন্ত্রের লেজুড়, সংশোধনবাদী কুত্তা।"··· এইসব শুনতে শুনতে শান্তনু রাত ভোর করেছিল। তাদের বাড়ির চড়ুই পাখিগুলি মৃদু অথচ মোনোলিথিক ঐক্যে ডাকতে শুরু করেছিল। কাছে পিঠে কোথাও কাক ডেকেছিল। জি. টি. রোডে মাঝে-মধ্যে শুধু ট্রাকের শব্দ আসছিল কিন্তু ওই দিন শেষ রাত্রে সে জীবনে প্রথম কোনো এক্সপ্রেস বাসের শব্দ যেন শুনেছিল। ট্রেনের দারুণ শব্দে ভরে গিয়েছিল শেষ রাত। হয়ত বা কালকা মেলের শব্দ ছিল সেদিন। শান্তনু ফিরে গিয়েছিল স্বশয্যায়। না, গৌরী কিছু বোঝেনি। অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। সর্বদা শাড়ি টেনেটুনে আপাদমস্তক রাখা-ঢাকা গৌরী হাঁটু অব্দি শাড়ি তুলে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সেদিন। তার খোলা দুই পা ওই রাতভোরেও স্পষ্ট আরেক কথা বলছিল। শান্তনু শোনেনি। তার মাথায় তখন আগুন জ্বলছিল। যেন এখুনি কিছু করা দরকার এমন অস্থিরতায় সে চোখ পর্যন্ত বুজতে পারেনি সেদিন। আশ্চর্য, তারই বাড়িতে, তারই খেয়ে পরে, তাকেই খতম করার ষড়যন্ত্র, উঃ! ভাবতে পারছিল না শান্তনু, গৌরীও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। হয়তো বা জানেনা সব, তবু তো অংশীদার! না, এর বিহিত করতেই হবে। এই ভেবে সেদিন শান্তনু চেষ্টা করে মাথা ঠাণ্ডা রাখছিল। সব কথা সুধীর, গোপীদা, বামাপদদা বা বিজয়দাকে বলা উচিত হবে কিনা ভেবে পাচ্ছিল না সেদিন। অবশ্য বিজয়দাকে বলা যায়, তাঁর সঙ্গেই শান্তনুর যা কিছু সম্পর্ক আর তিনিই তো এখানকার প্রবীণতম কমিউনিস্ট নেতা। কিন্তু যতদূর জানে শান্তনু, বিজয়দা খুবই অসুস্থ। আর বামাপদদা বড় ভালো লোক তাকে এসব বললে, তিনি হেসে বলবেন, 'রাজনৈতিক স্তরে এর মোকাবিলা করা দরকার।' কিন্তু তা যে কী রাজনীতি ও কেমনভাবে, তা বলবেন না;

কেননা তাঁর বিশ্বাস, স্থানীয় কমরেডদের সাহায্যে অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।··· এবং ততদিনে শান্তনু বেঁচে থাকবে কিনা ঠিক নেই। তবু কারুর কাছে তো যেতেই হবে। একা একা সে ওই গণফৌজের সঙ্গে তো আর লড়তে পারে না! এরকমই ভেবেছিল শান্তনু কিন্তু ঘটনা সেরকম হয়নি।

সেদিনই স্কুলে গিয়ে শুনেছিল, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গোপালচন্দ্র সেনকে নকশালরা খতম করেছে এবং এভাবেই নাকি তারা শিক্ষক-সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষকদের খতম করবে। স্কুলে এ নিয়ে খুব টেনশন দেখা দিয়েছিল সেদিন। এ.বি.টি.এ.-র টিচাররা শোকসভা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। হেডমাস্টার রাজি হননি। শান্তনু সেদিন বড় চুপচাপ ছিল। সর্বদাই তার পিঠ শিরশির করছিল। সে কিছু আগেভাগেই বাড়ি ফিরেছিল এবং গৌরীকে একা পেয়ে সবিস্তারে গোপালচন্দ্র সেনের নিহত হবার খবর দিয়েছিল। কিছু কাজ হয়নি। গৌরী বলেছিল, গোপালচন্দ্র সেন নাকি আমেরিকার দালাল, সিয়ার এজেন্ট। ভাবাই যায় না, গৌরী এরকম মন্তব্য করবে।··· সিয়ার এজেন্ট ধরা অতো সোজা না। তাছাড়া জনগণকে আরো জি.সি. সেন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানাতে হবে। তখন যদি জনতার রোষ ফেটে পড়ে, সে কথা আলাদা। খতম করে তারপর জানানো হ'ল লোকটা খারাপ, সিয়ার এজেন্ট; কিংবা পিঠের চামড়া তুলে তারপর জানানো হ'ল লোকটা প্রতিক্রিয়াশীল, এ হ'তে পারে না। ···কিন্তু এসব কথা গৌরীকে জানানো বৃথা। সে ধরে বসেই ছিল, যদি সত্যি সত্যি নকশালরা খুন করে তাহলে বুঝতে হবে ওই নেপাল হয়ে আসা চীনের ডকুমেন্টারি প্যাকেট খোলা স্বেচ্ছাকৃত বিপ্লববিরোধী জনস্বার্থবিরোধী কাজ অর্থাৎ আমি আমার বাড়ির মধ্যকার আরেকটি সম্পর্ক না জেনে যদি সেই সম্পর্কের কোনো গোপন ব্যাপার টের পাই তাহলে আমি খারাপ। বাঃ।

না, এসব কথা সেদিন বলেনি সে। গৌরী টের পেয়ে যেত, ওরাও টের পেয়ে যেত, তাহলে কি আর তিষ্ঠতে পারত সে? তবু এত করেও বা কিছুই না করেও একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। একদিন দুপুরে শান্তনু যথারীতি স্কুলে গিয়েছিল। ক্লাস হয়নি। কেননা তাদের স্কুলের মূল্যবান ল্যাবরেটারির দরজা ভেঙে কারা যেন তছনছ করে গেছে সব। দেয়ালে লিখে গেছে, "সত্তর দশক মুক্তির দশক"··· "স্কুল কলেজ বন্ধ রাখো, কৃষি বিপ্লবের পথ ধরো"··· ইত্যাদি। শান্তনুর বুঝতে বাকি থাকেনি সেদিন কারা এইসব করল। তারা তাহলে সক্রিয় অর্থাৎ শান্তনুকে সাবধান হ'তে হবে। সে বাড়ি ফিরে এসেছিল সাত-তাড়াতাড়ি। ভেবেছিল, বাড়ি ফেরার পথে একবার বিষ্ণুপদর কাছে যাবে, সেই একমাত্র সি.পি.এম.-ঘেঁষা যুবক, যার কোনো ভয়ডর ছিল না। সে-সময় বিষ্ণুপদ তাকে খুব মান্য করত। শুধু মাস্টারমশাই বলে না, তাকে একবার রিভিসনিজম্ বুঝিয়েছিল শান্তনু। একদা হাতে 'এগেইনস্ট রিভিসনিজম্' নিয়ে সে বুঝতে এসেছিল সি.পি.আই. কেন

খারাপ। সে বোঝাতে পেরেছিল। সেই কৃতজ্ঞতায় সে প্রায় ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করত। কিন্তু সেদিন শান্তনু তাকে বাড়িতে না পেয়ে নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছিল। সদরের কাছে এসে তার কেন যেন মনে হয়েছিল ভেতরে কিছু চলছে। ভাই-বোনে কথা। চাপা অথচ উত্তেজিত।

—কতবার বলব, কেউ খেয়ে গেলে আপত্তি হবে কেন? বিশেষ করে যখন বলছ, সে তিনদিন কিছু খায়নি। কিন্তু এভাবে টেবিলের নীচে দু-দুটো প্লেট রেখে দেওয়া, এ কি ভালো দেখায়? তাছাড়া জানোই তো জামাইবাবু মাছের হিসেব করেন। হয় তোমার, না হয় তার মাছ খাওয়া উচিত হয়নি। তাহলে হিসেব ঠিক থাকত। আমি বলব তোমারই মাছ খাওয়া ঠিক হয়নি। সে না হয় আমি মাছ না খেয়ে হিসেব ঠিক রাখব কিন্তু প্লেটটা ধুয়ে রাখা ভালো ছিল, যাতে কেউ টের না পায়যে, কেউ এসে খেয়ে গেল। দেখছ না, দিনকাল!

—ও অবশ্য প্লেটটা ক্লিন করতে চেয়েছিল, আমি দিইনি, আমি তো ভাবিনি, তুমি এত দেরি করবে? গিয়েছিলে কোথায়?

—বলছি তো, সেটা বড় কথা না, যাব আবার কোথায়? বললামই তো নমিতাদের ফ্ল্যাটে। বড় কথা হ'ল, ধরো, এখুনি যদি তোমার জামাইবাবু এসে পড়েন। টেবিলের তলায় দুটো প্লেট দেখে ভাববেন, আমাদের দুজনের খাওয়া হয়ে গেছে। তার মানে আমাকে অনাহারে থাকতে হবে যতক্ষণ তোমার জামাইবাবু বাড়িতে থাকবেন। এটা আর কোরো না। কে এসেছিল?

—এসেছিল।

—আমাকে নাম বলতে কী হয়েছে! আমি কী তোমার জামাইবাবু?

—আসল নাম আমি জানিনা। সবাই বড়খোকা বলে।

—এত গোপনতা অথচ প্লেট না ধুয়ে রেখে দিলে!

—আমি ধুয়ে দিচ্ছি।

—তুমি এখনও বুঝলে না। যাক আমি যখন এসেই পড়েছি, আমিই ধুয়ে দিচ্ছি। তুমি নিজে ভালো করে খেয়েছো তো?

—হ্যাঁ।

শান্তনু আর দাঁড়াল না। সেদিন পাকেচক্রে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল রাস্তায়।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ঘটেছিল সন্ধ্যায়। সেই বিষ্ণুপদ ৪/৫ জন যুবকসহ এসেছিল। প্রায় হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো আনন্দে শান্তনু তাদের দেখে উৎফুল্ল হয়েছিল; কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেনি, কেননা বিষ্ণুপদদের মুখ অসম্ভব গম্ভীর ছিল। বিষ্ণুপদ যেমন দেখা হলেই একগাল হেসে মাস্টারমশাই বলে, সেরকম না। একেবারে অন্যরকম হয়ে সকলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল বাড়িতে। ঢুকেই বিষ্ণুপদ সদর বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্ধ

করে মুহূর্ত দেরি করেনি। ভিন্ন গলায়, আমরা কিছু কথা বলব, কোথায় বসব আমরা, আপনার সেই পলিটেকনিকের শালা কৈ ?

—কী ব্যাপার ?

— বলছি, বলুন কোন ঘরে বসব ?

—আমার আর ঘর কৈ ? চলো শোয়ার ঘরেই বসি।

শোয়ার ঘরেই বসেছিল সকলে। যেখানে সেই দুলাল তার খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল আগের থেকেই। তার দিকে প্রথমে না তাকিয়ে শান্তনুকেই লক্ষ করে বিষ্ণুপদ বলেছিল, আপনি কি জানেন, আপনার বাড়িতে অনেক কিছু চলছে, এই বাড়ি নকশালদের ডেন হয়েছে, আমরা এপাড়ায় এসব হতে দেব না। শান্তনু বলতে যাচ্ছিল, আরে এজন্যই তো আজ দুপুরে তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ না ডাকতেও ঠিক সে-সময় গৌরী ঘরে ঢোকায় সে সামলে নিয়েছিল, পারেনি কিছু বলতে।

গৌরীকে দেখে প্রায় আদেশের সুরে বিষ্ণুপদ বলেছিল, আপনি যান বৌদি, আপনি এখানে কেন ? আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে।

—কেন আমি থাকলে কী হয় ! আমি থাকব।

—না আপনি থাকবেন না।

বলতে বলতে বিষ্ণুপদ উঠে এমনভাবে গৌরীর দিকে এগিয়েছিল যে শান্তনু বলতে যাচ্ছিল, কেন ও থাকনা, কিন্তু বলা হয়নি সে কথা কেননা বিষ্ণুপদ কিছু মারমুখী ছিল বুঝে সে বরং বলল, থাক গৌরী, তুমি যাও, তুমি এখানে থেক না ! ভয় পাচ্ছ কেন ? বিষ্ণুপদ তো আছে। গৌরী চলে যেতেই বিষ্ণুপদ শোবার ঘরেরও দরজা বন্ধ করল। তারপর ঘুরে দুলালকে লক্ষ করে বলেছিল, এই যে চাঁদ, আর ঘাপটি মেরে পড়ে থেক না, এবার ওঠো, চটপট কয়েকটা কথার জবাব দাও তো।

কথা শেষ হবার আগেই বিষ্ণুপদর একজন সঙ্গী এক হ্যাঁচকা টানে দুলালকে শোওয়া থেকে বসতে বাধ্য করেছিল।

—আজ দুপুরে কোন চাঁদ এসেছিল তোমার কাছে ? উল্টোপাল্টা উত্তর দিয়েছ কি মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে দেব।

—আমার বন্ধু।

—সে তো জানি, কিন্তু কে ?

—আমি তার নাম জানি না।

—ঠিক আছে তোমাদের অ্যাকশন নামই বলো তো এবার।

—জানি না।

—মাস্টারমশাই, তাহলে শুনুন, আপনার জানা উচিত, অবশ্য আপনিও ওদের লেজুড় হয়েছেন কিনা জানিনা, তবে শুনুন, আজ দুপুরে আপনার বাড়িতে যে এসেছিল, সে আমাদের একজন সিনসিয়ার কমরেডকে খতম করেছে—আমরা আপনার শালাকে ছাড়ব

না যতক্ষণ না তাকে পাই, আমরা ওকে আটকে রাখব। আপনি বাধা দিলে শুনব না। অবশ্য এ খবরও আমাদের আছে, আপনি দুপুরে একবার বাড়ি এসেছিলেন, তখন অবশ্য পাখি পালিয়েছে, কিন্তু আপনি এসে বাড়ি ঢোকেননি। ফিরে আবার কোথাও চলে গিয়েছিলেন।

—তোমরা যা বলছ, বিষ্ণু, এতো আমার ধারণার বাইরে। দেখছি, সবাই সবকিছু জানে, আর আমিই কিছু জানি না। ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

—আপনাকে সব কথা খুলে বলা যাবে না, আমাদের উপর নির্দেশ আছে, আপনাকে না ঘাঁটিয়ে ওই দালালকে বেমালুম তুলে নিয়ে যাওয়া।

—দাঁড়াও, আমারও দায়িত্ব আছে, আমাকে সব বুঝতে দাও।

—আপনাকে সব বোঝানো বৃথা, কেননা আপনি কোনো দায়িত্ব পালন করেননি, আপনার বাড়িতে এসব হতে দিয়েছেন। প্রায়ই নানা ধরনের ছেলে আসে আপনাদের বাড়িতে—রাত্রেও আসে, থাকে— আপনি যদি এখন ন্যাকা সাজেন আমাদের কিছু করার নেই, আমরা ওকে ছাড়ব না।

বিষ্ণুপদ প্রথম থেকেই তার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছিল না কিন্তু তা যে এই পর্যায়ে যাবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। আহা, সে যদি আগে বিষ্ণুপদর সঙ্গে দেখা করত, তাহলে ঘটনা এরকম হ'ত না। তবু সে শেষ চেষ্টা করল, বলল, তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি আশা করিনি, বিষ্ণু!

—আমরাও আশা করিনি, আপনার উপস্থিতিতে এই বাড়ি নকশালদের ডেন হয়ে যাবে।

—আমাকে কিছু সময় দাও, আমাকে সব বুঝতে দাও, আমি কথা দিচ্ছি, কে এসেছিল আজ আমার বাড়ি দুপুরে, এ আমি খুঁজে বার করব।

—সে আপনার কম্ম নয়। আমরাই এত ওয়াচ রেখে ফেল করলাম, আর আপনি পারবেন! বরং আমাদের হাতে আপনার শালাকে ছেড়ে দিন আমরা বুঝে নেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন. আপনার উপর কোনো হামলা করব না। কিন্তু যদি বাধা দেন তাহলে আপনাকেও আমরা ছাড়ব না। ঠিক সেই সময় গৌরী অসম্ভব নার্ভাস হয়ে বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিয়েছিল। তার কথাগুলোও স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল, 'দরজা খোলো, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।'

টোনে যাই থাক অন্তত বিষ্ণুপদ এগিয়ে গিয়েছিল দরজা খুলতে। খুলেও ছিল। গৌরী ঘরে ঢুকে আবার বলেছিল, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।'

—বলুন।

—তোমরা যদি মনে করে থাক, ওকে আটকে তোমরা তাকে পাবে, তাহলে ভুল করবে। আমার ভাই সম্পর্কে আমার যা ধারণা তা তোমাদের এখন বলে কিছু লাভ নেই। পরে এ বিষয়ে বলা যাবে, তোমরাও সব বুঝবে।

—আপনি এখুনি বলুন, আমরা এখুনি বুঝব।

—এখন বললে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?… ও আমার মাসতুতো ভাই। আমার এই মেসোমশাই বম্বেতে থাকেন। বম্বের এক টেক্সটাইল ফার্মের তিনি পার্সোনেল ম্যানেজার। ও তাঁর একমাত্র ছেলে। বড় আদুরে। যে জন্য ও গোল্লায় গেছে। ও এর আগে কানপুর আই. আই. টিতে পড়ত। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে পড়াশুনো শিকেয় তুলেছিল। তার আগে ও পিলানীতে পড়ত। সেখানে তো এঞ্জিনীয়ারিং ছেড়ে ম্যাথস, ম্যাথস ছেড়ে ফিজিক্স পড়ছিল। তারপর ওরা আর ওকে রাখেনি। সাতঘাটের জল খেয়ে এখানে এসেছে। আর ওর যা স্বভাব, আবার সেই বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা। নকশালরা ওকে ঘৃণা করে। ধাদ্কা থেকে নকশালরাই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে আমরা ওকে রেখেছি, আমরা তো ওকে ফেলে দিতে পারি না। হ্যাঁ, সত্যি, ওর বন্ধু-বান্ধব যখন-তখন আসে, আমাদের এই ছোট্ট সংসারে খুবই অসুবিধে হয়। আজ যে বন্ধু এসেছিল, তাকে দেখিনি। ও নিজেও আমাকে বলেছে, ও এই বন্ধুর নাম পর্যন্ত জানে না। থাকতে এসেছিল। আমরা কেউ তখন বাড়ি ছিলাম না। ও বলেছিল, সকলে আসুক, তারপর থাকার কথা ভাবা যাবে। কিন্তু সে-বন্ধু বেশিক্ষণ থাকেনি। আমি পাশের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, আমিও পর্যন্ত তাকে দেখিনি। আমার মনে হয় না ও নকশালদের সঙ্গে জড়িত। তাহলে তোমাদের মাস্টারমশাই না জানতে পারুন, আমি অন্তত জানতাম।…তা ছাড়া একটা কথা ভেবে দেখ, আমি যতদূর আনন্দবাজার পড়ে জেনেছি, এই নকশালরা বড় ভয়ংকর। ওদের পাপপুণ্য বোধ নেই। ওরা বড় রেকলেস। ওরা কি এ পাড়ায় নেই ভাবো? এখন ওরা সর্বত্র আছে। ওকে ধরে নিয়ে গেলে ওরা জানতে পারবে। আর নিশ্চয় আরো বেশি গা ঢাকা দেবে। এখন যদি তোমরা ওকে মেরে ফেলতে চাও তাহলে কি ওরা ওর প্রাণ বাঁচাতে তোমাদের হাতে নিজেদের ধরা দেবে ভাবো? কক্ষণো না। বরং আমার ভাই-এর প্রাণ ওদের কাছে কোন ফ্যাকটারই না। তার চেয়ে শোনো, আজ খুব গোপনে ওকে বম্বে পাঠিয়ে দাও।…তোমরা ওয়াচ রাখো, আমিও ওয়াচ রাখব। ওদেরকে জানতে দেব না, আমার ভাই এখানে নেই। সুতরাং ওরা আসবে। যদি অবশ্য তোমাদের কথামতো ওরা নকশালই হয়। আমি জানি না। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে ভালো জানো।…

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যায়। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। শান্তনু মনে মনে গৌরীর বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনি। সে তার কথার অনেক কিছুই কনট্রাডিকট করতে পারত, করেনি সেদিন।

অবশেষে বিষ্ণুপদদের সম্পূর্ণ গ্রিপে এনে গৌরী ছেড়েছিল সেই মোক্ষম অস্ত্র যা ভুলবার নয়। বলেছিল, 'আমি টাকা দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কেউ ওর সঙ্গে যাও, অন্তত তেমন কেউ, যাকে তোমাদের পার্টির লোক বলে লোকে কম জানে, বা জানেই না।'

ধরা দিয়েছিল বিষ্ণুপদরা। মুহূর্ত দেরি হয়নি গৌরীর গ্রিপে যেতে। শুধু ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল ৫/১০ সেকেন্ড। তারপর বিষ্ণুপদ মুখ খুলেছিল।

'প্রস্তাবটা ভালো। কিন্তু কথা, আপনার ভাইয়ের যে কোনো বন্ধু এলে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আমরা ফাইন্যালি কিছুক্ষণের মধ্যে যা বলার বলে যাচ্ছি। কে সঙ্গে যাবে, তাও বলে যাচ্ছি।···মাস্টারমশাই আপনাকে যদি কিছু খারাপ কথা বলে থাকি ক্ষমা করবেন। আমরা কিন্তু এখন থেকেই এ বাড়ি ওয়াচ রাখব।' আসলে বলতে গেলে মাপ চেয়ে প্রকারান্তরেই ভয়ই দেখানো।

চলে যেতে যেতে শান্তনু স্পষ্ট শুনেছিল, কে যেন ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমি যাব সঙ্গে, আমি জন্মে বম্বে দেখিনি।'

শুনতে শুনতে শান্তনু ভাবছিল, অত টাকা গৌরী দেবে কোত্থেকে। কিন্তু এ ব্যাপারে শান্তনু ভালোই জানে, গৌরী তার মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে না, নিশ্চয় দুলালের টাকা আছে। টাকা তার থাকে, ভালো মতনই থাকে। তাই দিয়েই সব হবে।

যাই হোক, রাত ঠিক সাড়ে সাতটায় বিষ্ণুপদ সঙ্গে একজন পরিচ্ছন্ন বাবু-যুবক এনে বলেছিল, ওই প্রস্তাব তারা মানছে এবং সঙ্গীকে দেখিয়ে আরও বলেছিল, 'এই ছেলেটি সঙ্গে যাবে। এর যাওয়া-আসা ও বম্বেতে থাকার খরচ দিতে হবে।'

সেদিন দুলালের কথা ভেবে গৌরী যখন বলেছিল, 'বার্থ রিজার্ভের কী হবে?' উত্তরে বিষ্ণুপদ রাজার মতো বলেছিল, 'ওসব ঠিক আছে, আমরা একটা ভি. আই. পি. সিট পেয়ে গেছি, ওতেই ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

শান্তনু তখনকার মতো বিপদ কেটে গেল ভেবে খুব উল্লাস বোধ করেছিল। এমন কি অতি উৎসাহে, বলা যায়, প্রায় পকেট খালি করে, দুলালের জন্য শেষ চিকেন কিনতে গিয়েছিল ওই রাত্রে, বলা ভালো, ওই সাড়ে সাতটার পর। তখন তার মনে টগবগ করছিল দুটি ব্যাপার। এক, আপাতত বিপদ কেটে গেল আর দুই হল, এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো দুলালকে বাড়ি ছাড়া করা গেল। মনে আছে ভালো, সেদিন মুর্গি কিনে বস্তিনবাজারে তার ছাল ছাড়াবার সময় যখন মুর্গির সাদা মাংস জ্যোৎস্না দিচ্ছিল খুব, তখন সে না ভেবে পারেনি, অনেকদিন পর গৌরীর সঙ্গে আনন্দ করা যাবে। হায়, মানুষ কতরকম অবস্থার মধ্যেও এসব ভাবতে পারে!

কিন্তু হয়নি, কিছুই হয়নি। বিপদও কাটেনি, আর গৌরীর সঙ্গে আনন্দও করা হয়নি। কেননা ভাত-মাংস খেয়ে রাত্রি ১০টার পর সে যখন শোবার ঘরে মরার মতো পড়েছিল, তখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার অত্যুজ্জ্বল সময়ে সে তাদের ভাঁড়ার ঘরে ফিস-ফিস শব্দ শুনে না উঠে পারেনি। উঠে স্পষ্ট দেখেছিল, তাদের ভাঁড়ার ঘরে, গৌরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে, দুলালকে জড়িয়ে ধরে, নিজের বুকের কাছে এনে, শান্তনু উঠে ভাঁড়ার ঘরের কাছাকাছি যাবার পরও, বলেছিল, 'তুই আমাকে ভুল বুঝিস না রে!

এসবই তোর ও তোদের জন্য করা। ভয় নেই রে, তোকে বা তোদেরকে বিপদে ফেলব না, দেখিস। আমার ছেলে নেই, এ কথা ভুলিস না কখনও।' শান্তনু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পা টিপে টিপে শোবার ঘরে এসে পুনরায় মরার মতো শুয়ে পড়েছিল।

তারপর যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে দশটায় সেই পরিচ্ছন্ন বাবু-যুবক যখন দুলালকে নিতে এসেছিল, তখন দুলালের অসহায় মুখ···আঃ, শান্তনু মরে যাবে, তবু কখনো ভুলবে না তার সেই চোখ! হ্যাঁ, শান্তনুও সেদিন গৌরীর মতো কেঁদেছিল। সদর বন্ধ করতে করতে কিছু উচ্চস্বরেই কেঁদেছিল শান্তনু। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়া গৌরীকে নিয়ে শোবার ঘরে এসে যখন আশ্রয় দেবার মতো আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিল গৌরীকে, তখনি, হায়, গৌরীর নরম বুক ও তার হাঁটুর উপরকার উষ্ণ কোমল অঙ্গ তাকে কামনার দিকে না ঠেলে পারেনি। তার সেই ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে সত্তরের সেই রুদ্র-সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গৌরীকে।

সে, গৌরী, তার বাঁধন থেকে প্রায় ছিটকে গিয়ে বলেছিল,

—বিষ্ণুপদদের কে খবর দিল, তুমি?···একবার নাকি দুপুরে তুমি বাড়ি এসেছিলে?··· ঢোকোনি কেন?··· কিছু কি দেখেছিলে? এত নীচ, এত ছোট তুমি!

এর কোনো জবাব দেওয়া যায় না। শুধু গৌরীকে ভাঁড়ার ঘরে শুতে দেবার অধিকার দিয়ে নিজে ভুল করে দুলালের খাটে শুয়ে, ভুল বুঝেও সেখানেই প্রায় বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়।

পরের দিন থেকেই শুরু হয়েছিল বিপদ।

কতদিন মনে পড়ে না, তবে মনে হয়, আসানসোল ছাড়ার আগের দিন পর্যন্ত শান্তনুর বড় দুঃসময় গিয়েছিল। গৌরী পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলেনি। সেই যেমন থাকার অর্থাৎ রাত্রে ভাঁড়ার ঘরে আগের মতোই শুয়ে, তাকে ঠেলে দিয়েছিল শোবার ঘরে।

এর মধ্যে একবার জনডিস, একবার হাম, আর দু-বার কোলাইটিসে কষ্ট পেলেও এর কোনো হেরফের হয়নি। কেননা দুলাল, দুলালের বন্ধুরা, এমন কি গৌরীও এই ১৯৭০-এও ফিরে গিয়েছিল, এ দেশেরই সেই উন্মত্ত স্বাদেশিকতার ১৯১৫-তে, যখন বিলিতি কাপড় পোড়াবার ঝোঁকে তারাও এমন খতম অভিযান চালিয়েছিল। তাই তখনকার সন্দীপের মতো ওরাও এখন বলে,

"—যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে, সেটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি, সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল জগতের শিক্ষা। দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব, সেই দিনই দেশ আমার হবে।···লাভ করার

স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না, তাকেই আমরা বলি নীতি বা বৈধ পথ, এজন্যেই নীতি বা বৈধ পথ বা সংবিধানকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।…যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা একদল লোক আছে— নীতি, বৈধ পথ, সংবিধান, সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক।”

কিন্তু এত কথার পরেও শান্তনু সান্ত্বনা পায়নি। তার ঘুম নষ্ট হয়েছে। চোয়াল বসে গেছে। সে কতদিন দাড়ি কামায়নি। দিনে একবার ছাড়া চুল আঁচড়ায়নি। তবু শান্তনু বিপদে পড়েছে। ঘরে বাইরে। গৌরী তার কাছে শোয়নি। বিষ্ণুপদর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে মুখ ঘুরিয়ে চলেছে, কেননা দুলালের বন্ধুরা আর এ পাড়া বা তাদের বাড়ির পথ মাড়ায়নি।

কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে, দুলালের বন্ধুরা কোত্থেকে যে টের পেল সব! তাদের জানার কথাই না। যেভাবে বিষ্ণুপদর দল দুলালকে নিয়ে গেছে স্টেশনে সে শুধু হিচককের মাথাতেই আসতে পারে। তারপর যেভাবে সেই পরিচ্ছন্ন বাবু-যুবক, শোনা যায়, বহুকাল বম্বেতে দুলালকে ওয়াচ রাখত, যাতে সে ফোনে, চিঠি বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো খবর না দিতে পারে। এ ব্যাপারে শোনা যায়, বিষ্ণুপদরা সি. বি. আই. পর্যন্ত গিয়েছিল। অবশ্য শোনা কথা, শান্তনু এ ব্যাপারে মোটেই সিওর নয়।

বিপদ হল এই, বিষ্ণুপদর দল দুলালের উপর ওই যুবক মারফত বা কিংবদন্তীর সেই সি. বি. আই.-এর মাধ্যমে যেভাবে নজর রাখত, তা গৌরীর কানে আসত, নানাভাবে, তার মাসীর চিঠির মারফত হয়তো বা। আর তাতেই গৌরী মনে করত, এ সবকিছুর পেছনে শান্তনু আছে। তাই আর সে শান্তনুর দিকে সহজে তাকাতে, কথা বলতে বা ভাত বেড়ে দিতেও পারত না। অন্যদিকে বিষ্ণুপদরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল, আমরাই, যেভাবে হোক, দুলালের বন্ধুদের খবর দিয়েছি। যত দিন যাচ্ছিল, তত তাদের সন্দেহ বাড়ছিল।

সন্দেহ তাদের শান্তনুকেই বেশি।

সুতরাং একদিন অবধারিত হ'ল দুটি বাক্য :

এক. গৌরী থেকে : তুমিই বিষ্ণুপদদের আমার পিছনে লাগিয়েছ। আমি তো ঘরের বাইরে যাই-ই না, তবু যদি যাই, ওরা ছায়ার মতো আমার পিছনে থাকে। আর তুমি যতক্ষণ স্কুলে থাক, ওরা আমাদের সদরের কাছে সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করে। এ অসহ্য!

দুই. বিষ্ণুপদ থেকে : আপনি বেশি কথা বলবেন না, মাস্টারমশাই, আমাদের এখন

গভীর সন্দেহ, আপনি ওদের অ্যালার্ট করে দিয়েছেন। আমাদেরই ভুল, আপনাকে বিশ্বাস করে, প্রথম প্রথম আপনার উপর তেমন ওয়াচ রাখা হয়নি। আপনার স্ত্রীকেই আমাদের বেশি সন্দেহ ছিল, তাই আমাদের ফুলফোর্স আপনার স্ত্রীর পেছনে ছিল।...না, আপনার কোনো কথাই আমরা শুনব না।

এই হচ্ছে সেই শান্তনু, যাকে দুজনেই কান ধরে টানছে।

আসলে মজা এই, খুব উঁচু চেয়ারে বসে প্রকৃত শত্রুপক্ষ, যিনি এই সবকিছুর মালিক, তিনি জবর এক চোট হেসে নিচ্ছেন, কেননা তারই চোখের সামনে, দুই বাম জবরদস্ত হেনস্থা করছে শান্তনুকে, হায়, মালিক নিজে কোথায় তাকে হেনস্থা করবে, তার আগেই গৌরী বা বিষ্ণুপদরা তাকে হেনস্থা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ কি মালিকেরই জাল পাতা ?

সে তো দেখছে, তার জন্য ছুরি শানাচ্ছে বিষ্ণুপদরা আর সন্দেহের কাঁটা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে গৌরী।

একদিন গৌরীকে বলতেই হল, আর তো পারা যায় না। যথেষ্ট হল, আর না। এবার এসো আমরা আলাদা হই। এ শান্তনুকে বলতেই হল একদিন। কেননা সন্দেহ এমন এক সম্পর্ক যা শুধু এলিয়েনেশনের দিকেই যায় না, উপরন্তু এমন এক ধরনের আক্রোশের দিকে যায়, যেখানে মানুষের নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। নতুবা গৌরী স্বয়ং একা ভাঁড়ার-ঘরে শুয়ে বলতে পারে কি, 'আজকাল তোমার বোধ করি ঘেন্না হয় আমাকে, আমার শরীরকেও ? আমি ছটফট করছি কিনা, ঘুমুচ্ছি কিনা, একবার এসে দেখ ?'

হায়, কে কাকে কী বলছে ? কার কথা কে বলছে ? কে যাবে ভাঁড়ার-ঘরে ? যে দুচোখ দিয়ে দেখছে অন্যজনের সর্বদাই কুঞ্চিত কপাল, ভারি মুখ, একবারও তার দিকে না তাকানো শুকনো চোখ ? সে কি পারে ? ফলে আরও ভাবতে হয়, ছেড়ে দাও, ওকে দাও ছেড়ে, ও বোধহয় অনুপস্থিত দুলালের ভূমিকা পালন করতে চায়, ওকে দাও ছেড়ে।

সত্যি তখন শান্তনুর সঙ্গে গৌরীর প্রকৃত সেপারেশন হবার অবস্থা। আর এই অবস্থার সঙ্গে ঘরে-বাইরের নিখিলেশের সঙ্গে তার এই জন্যই এত মিল যে সেও একদা লিখেছিল "আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব বা সিকিউরিটি চাই কিম্বা পুলিশকে ভয় করি ; পুলিশ ভাবছে ভিতরে আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।"

শান্তনু এভাবেই চলতে চলতে একদিন তাদের স্কুলের অংকের টিচার বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নজরে পড়ে গিয়েছিল।

কিছুটা মায়ের মতো, নাকি সবটা বন্ধুর মতো টোনে তিনি বলেছিলেন,
—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার ?
শুনে শান্তনুর কান্না এসে গিয়েছিল। তার মনে পড়ে গিয়েছিল, কতদিন গৌরী স্কুলে আসার আগে তাকে ভাত বেড়ে, বাটিতে বাটিতে ডাল-তরকারি-মাছ সাজিয়ে রান্নাঘরে চলে যেত। মুহূর্ত দাঁড়াত না। আর সে শান্তনু চোখের জলে ভাত খেয়ে উঠত। মায়ের চিতার আগুনে চোখ লাল করত। সে যে শ্মশানে মায়ের বুকে ঘি-মধু মাখাবার সময় মায়ের স্তন দেখে একদা বুঝতেই পারেনি, একদিন ঐ বুকে মুখ গুঁজে সে বড় হয়ে উঠেছিল, সে-সব মনে করে তার সাধের মাছের টুকরো না খেয়ে সেটা কোনো অনাহূত কাককে ছুঁড়ে দিয়ে সে প্রত্যহ স্কুলে আসত। কোনোদিন এর অন্যথা হত না।
—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার ? এ বাক্যে সেই স্বর্গীয়া মা-ও ছিলেন। শান্তনু মাথা নিচু করেছিল ভাগ্যিস, স্টাফ-রুমে কেউ ছিলেন না সেদিন। তখন ছুটির ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস তখন কেবল তারা দুজনেই খাতা দেখছিল। ভাগ্যিশ তার চোখ দিয়ে কখনো জল পড়ে না।
আর একটি কথা না। চুপচাপ কিছুক্ষণ থাকার পর বিনয়বাবু নিজের খাতাগুলো জায়গা মতো রেখে, তার খাতাগুলো টেনে গুছিয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে, স্বস্থানে রেখে শান্তনুকে নিয়ে উঠে পড়েছিলেন। বাইরে বেরিয়ে রিক্সা চেপে সোজা এসেছিলেন তাঁর জি. টি. রোডের চেম্বারে, যেখানে তিনি জ্যোতিষার্ণব বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
চেম্বারে বসে একজন মহিমকে ডেকে আটটা রাজভোগ আনিয়েছিলেন রাহালেনের বিখ্যাত চাচীর দোকান থেকে। চারটে নিজে গোগ্রাসে খেয়ে বাকি চারটে শান্তনুকে জোর করে খাইয়ে তিনি হাত-মুখ মুছে একটি বড় মাপের আতস কাঁচ হাতে নিয়ে বলেছিলেন, দেখি আপনার হাত।
বিনা বাক্য ব্যয়ে অন্তত ১৫ মিনিট দেখেছিলেন। তারপর জানতে চেয়েছিলেন, তার ডেট অব বার্থ। সব মোটামুটি জানালে তিনি কাটাকুটি খেলার মতো ছক কেটে আরও ১৫ মিনিট কাটিয়ে বলেছিলেন, রাহুর দশা। খানিক চুপচাপ থেকে প্রায় ডি. আই. বি. ইনস্‌পেকটরের মতো তার অতীত নির্ভুল বলে গিয়ে— তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ১৯৮০ থেকে আপনার সময় ভালো যাবে। এখন রাহুর দশা চলছে।
রাহু কী বা কে, এ প্রশ্ন জাগার আগেই তিনি বলতে শুরু করেছিলেন, এ হল জ্যোতির্বিজ্ঞান, লোকে অবশ্য জ্যোতিষশাস্ত্র বলে। আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এটা সত্য। আপনার সাম্প্রতিক গোলমালের কারণ এই রাহু— এঁর স্বভাবই হল গ্রাস করা। ১৯৭৯ পর্যন্ত এঁর দশা চলবে।·· তারপর প্রায় মুখস্থ বলার মতো শুদ্ধ বাংলায় বলে গেলেন, 'রাহু আসলে এক দানব। বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে যখন দেবগণের মধ্যে সুধা ভাগ করে দিচ্ছিলেন, সেই

সময় এই রাহু দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করবার জন্য এক সঙ্গে বসেন। এঁর গলা পর্যন্ত অমৃত গেলে চন্দ্র ও সূর্য এঁকে চিনতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বিষ্ণুর কাছে এঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন বিষ্ণু নিজের সুদর্শন চক্র দিয়ে এঁর মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত গলা পর্যন্ত পান করার ফলে রাহুর মৃত্যু হল না। এঁর মস্তকভাগ রাহু ও দেহভাগ কেতু নামে খ্যাত হল। তখন থেকেই চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরশত্রুতার সূত্রপাত। রাহু তাই এঁদের গ্রাস করে ফেলেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্রগ্রহণ হয় ও সূর্যকে গ্রাস করলে সূর্যগ্রহণ। ...রাহু নবগ্রহের একতম ও নৈঋত কোণের অধিপতি।...রাহুর রথ ধূসর বর্ণ। এই রথ আটটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব কর্তৃক বাহিত হয়। এই অশ্বরা একবার মাত্র রথে যুক্ত হয়ে সবসময় রথ বহন করছে। অর্থাৎ রাহুর রথ ছুটছে তো ছুটছেই। নন্‌স্টপ ছুটছে। ভাবুন, আপনি সেই বিরামহীন রাহুর প্রকোপে পড়েছেন, যে থামতে জানে না।

সহসাই এই জায়গায় শান্তনুর মনে পড়েছিল ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবির কথা। সেখানে একটি সাদামাটা কিশোর একটি স্থির অটো পেয়ে তার পাইলট হয়ে স্টার্ট দিয়েছিল সেই গাড়ি আর স্টপ করতে পারেনি কেননা সে ব্রেক কষতে জানত না। তার সকরুণ 'থামাতে পারছি না' বহুকালাবধি বুকে বেজেছিল শান্তনুর; পুনরায় বেজে উঠল সেদিন।

সেদিন ওই বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে ফিরে অকারণ, বিনা প্ল্যানে সে ঢুকে পড়েছিল এক পাঞ্জাবী হোটেলে। যার দো-তলায় দিশি মদ বিক্রি হয়। অনেকদিন আগে মাঝে মাঝেই এখানে আসত শান্তনু। তখনো মনে হত, তার বড় দুঃসময় চলছে। কিন্তু এই এখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে, বাস্তবিক সে সময়টা বড় সুখের মনে হয়। হারমন হেস ঠিকই বলেন, কেউ যদি আমার দুঃখের দিনগুলি নিতে চায়, বদলে দিতে চায় তার সুখের দিনগুলি, আমি অন্তত রাজি হব না। আসলে দুঃখের দিনগুলির সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে মানুষ, তাদের কারুর কারুর সঙ্গে জড়িয়ে যায় ভালোবাসা। মানুষ সব পারে কিন্তু ওই ভালোবাসার স্বাদ একবার পেলে তাকে কিছুতে ছাড়তে পারে না। শান্তনু এক পোয়া, অর্থাৎ ১০০ মিলিলিটার দিশি মদ চেয়েছিল। পেয়ে চুমুক দিতে যাবার আগে, ওঃ, কী গন্ধ, যেন পৃথিবীর প্রথম ক্ষেত থেকে তোলা আদিতম ধান এতদিন বৃষ্টিতে ভিজছিল, সেরকম নষ্ট, পচা, গন্ধ— শান্তনুর পেট গুলিয়ে বমি এসেছিল। বহুদিন পর বলেই হয়তো কিংবা এই স্টাফটাই খারাপ, শান্তনু আর দ্বিতীয় চুমুক দিতে সাহস পাচ্ছিল না। একজন হোটেল-বয়কে দেখে সে একটি কোকাকোলা চেয়েছিল। তারপর আর কষ্ট হয়নি। কোকাকোলা মিশিয়ে খেতে প্রায় হুইস্কি খাওয়ার টেস্ট পেয়েছিল শান্তনু। যেখানে বসেছিল সে, সেটা অনেকটা কেবিনের মতো, সেখানে ক্রমে অন্ধকার করে আসছিল। একে অল্প আলো, তার উপর শান্তনুর চোখ ঝাপসা

হয়ে যায় পেটে মদ পড়লেই। তার জিভে এক ধরনের জড়তা আসছিল, যা স্বাদু হয়ে উঠেছিল অল্প কিছু পরেই। চতুর্দিক থেকে কালো মেঘ জমে উঠেছিল। এক সময় মাথার ভিতর সপ্রতিভ ঝোড়ো হাওয়ায় সেই মেঘ আক্রোশে আটখানা হয়ে যেতে থাকল। ঘোড়ার খুরের শব্দে ভরে গিয়েছিল স্মৃতি। আশ্চর্য, কী করে পারা যায়, শুধু মাত্র জন্ম সময়, তারিখ, জন্ম সন ও ডেট অব বার্থ জেনে অতীতের কথা প্রায় হুবহু বলতে? তবে কি সে আগামীকাল কী করবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে পূর্বেই? তাইতো থাকার কথা কেননা ক্যারাকটারই তো ডেস্টিনি। এই যে সে বিপদের মধ্যে আছে, এতো তারই ক্যারাকটার। সে পক্ষেও নেই, বিপক্ষেও নেই — অথচ পক্ষ যখন তার ডান কান ধরে টানে বা বিপক্ষ যখন তার বাম কান ধরে টানে সে তো সাড়া দেয়। কখনো মনে হতে পারে সে দক্ষিণপন্থী, কখনো মনে হতে পারে সে বামপন্থী। সে মানুষ বলেই এটা স্বাভাবিক। কেন প্লেখানভ বা কাউটস্কিও তো তাই। এমনকি লুই ফিসার, আঁদ্রে জিদ আর এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি? বি. টি. রোডের ধারের জনমানব ছেড়ে আমরা সবাই তো বিবরে যাই। কিংবা উল্টোটা, বিবর থেকে উঠে আসি কোনো সূর্যোদয়ে এবং বেলাবেলি চলে যাই বি. টি. রোডের ধারের জনমানবের কাছে। তবে কেন গৌরীরা বোঝে না, কেনইবা বিষ্ণুপদরা ভুল করে? একি তার ক্যারাকটার? ডেস্টিনি? হেরিডিটি!···আঃ, মা, আমাকে তুই আনলি কেন! আমি তো জন্মাতে চাইনি।

সেদিন, যা হয় না সচরাচর, তাই হয়েছিল। শান্তনু গান গেয়ে উঠেছিল। প্রথমে মনে মনে, তারপর বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে মেঘ ডেকেছিল। এক অসম্ভব দুঃখ পাক খেয়ে উঠেছিল পেট খালি করে গলায়, আর তখনি, কীসের থেকে কী, সে নিজের দু'হাত ও দু'পায়ের পাতা ঘামিয়ে গেয়ে উঠেছিল: দুঃখের তিমিরে— যদি জ্বলে— তব মঙ্গলালোক— তবে তাই হোক— তবে তাই হো—ক তবে তা— ই হোক।

না, শান্তনুর চোখ দিয়ে কখনো জল পড়ে না।

যদিও আট ঘোড়ার এক ধূসর রথ বার বার তার মাথার উপর দিয়ে ঘর্ঘর করে যাচ্ছিল আর যাচ্ছিল। কখনো তার চুল স্পর্শ করছিল, কখনো করছিল না। এক সময় সেই রথের পিছনে তার চুল সমেত সে যেন আটকে গিয়েছিল। কত পরে বুঝেছিল শান্তনু, রাহু তার চুল ধরে আছে। তার মাথা কেবল চুল সুবাদেই রাহুর হাতে ধরা আর দেহভাগ পড়ে ছিল পথে। ক্রমে রথের বেগ বেড়েছিল। তাকে ক্ষতবিক্ষত করে কখনো পাথর কখনো বরফের উপর তার ওই মাতৃস্নেহধন্য দেহভাগ শাস্তি পাচ্ছিল। সমস্ত আকাশ গুম গুম করে রাহুর মুখসর্বস্ব ছিন্নকণ্ঠ থেকে দৈববাণী হচ্ছিল, 'কেন তুই জন্মেছিলি ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫-এ?'

—কেন আপনি বিষ্ণুপদদের খবর দিলেন?

শান্তনু এই দৈববাণী শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু পরিষ্কার হয়ে বলতে গিয়েছিল,

—আমি, আমি কী করব? আমি কি তার জন্য দায়ী?

—কেন আপনি বিষ্ণুপদদের খবর দিলেন ?
—কে, কে তুমি ?
—যেই হই, আপনি এই এলাকায় আমাদের এনট্রি বন্ধ করে দিয়েছেন। বিষ্ণুদের সঙ্গে আপনার দহরম-মহরম, আপনি তাদের পা চাটতে চান। আবার জ্যোতিষ-কেন্দ্রে ঢুকেছেন। বসে বসে যে মদ গিলছেন, সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।··· আপনি জানুন, আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই, আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের পিঠের চামড়া তুলে নেব।
—ইয়ার্কি পেয়েছ ? আমি এখুনি লোক ডাকব।
—ডাকুন !
বলতে বলতে সে, কে যেন, তাকে একটি খাকি রঙের খাপে পোরা ভোজালি দেখিয়েছিল। শান্তনুর মুখে আর সেদিন কথা সরেনি।
—আপনি সাবধান থাকবেন। মনে রাখবেন, আপনার জন্য আমাকে মেয়েমানুষ পর্যন্ত সাজতে হয়েছিল।
বলে সে, কে যেন, অদৃশ্য হয়েছিল।
ওঃ, তাহলে গৌরী এভাবেই ওদের সতর্ক করার সুযোগ পেয়েছিল, ওই কে যেন এক মেয়েমানুষের সাহায্যে ! সে আরেক পোয়া মদ চেয়েছিল, কেননা তখনো কোকাকোলা থেকে গিয়েছিল ও বিপদ বাড়ছিল।

বিনয়বাবু বলেছিলেন, আজকেই সময় প্রশস্ত ছিল, অন্তত ৫ রতির গোমেদ যদি ধারণ করতেন, যাকে আপনারা টোপাজ বলেন, তাহলে কিছুটা রিলিফ পেতেন। এই আসানসোলের প্রচণ্ড গরমে, রোদে, ছাতা যেমন, সানগ্লাস যেমন কাজ করে তেমনি রিলিফ।
না, তা কী করে হয় ? গোমেদ ধারণ করবে ! রাহুর জন্য গোমেদ ! রিলিফ ? গোমেদ তাকে রিলিফ দেবে ? তার কী ক্ষমতা ? এক রত্তি পাথর পারবে কী করে তার সমস্যা মেটাতে। এতো কিছু সহজ সমস্যা নয় বা দৈব সমস্যাও নয়। এ সমস্যা মূলত রাজনৈতিক হলেও, এ সমস্যা তাকেও বিব্রত করছে। কোনো ঘটনা কোনো কিছু বা কেউ তো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার চেহারা রাজনৈতিক থেকে পারিবারিক হয় মাত্র। এ সমস্যা মেটাতে হলে এ দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মেটাতে হয়। খুনোখুনি রাজনীতির ফয়সালা করতে হয়। দ্রব্যমূল্য কমাতে হয়। অল্প ভাড়ায় অন্তত দুখানা শোবার ঘর পেতে হয়। মানুষের মন থেকে সন্দেহের কাঁটা উপড়ে ফেলতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর করতে হয়। এত সব পারবে কী করে ওই এক রত্তি পাথর ?···

পারল। সেদিন পুনরায় তার মাথার উপর দিয়ে আটঘোড়ার রথ ঘর্ঘর করে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল আর যেতে লাগল। তাকে হিড় হিড় করে টানতে লাগল খরখরে পথের উপর, উঁচু-নিচু জি. টি. রোডের উপর তাকে মুহুর্মুহু ট্রাফিকের ফাঁকে-ফাঁকে এঁকে-বেঁকে প্রায় আছড়াতে লাগল, আশ্চর্য, মাথার পিছন ছাড়া তার যেন আর সব অক্ষত থাকছিল। একবার সে দেখছিল বিষ্ণুপদকে, আরেকবার সে দেখছিল গৌরীকে। সবার মুখ অসম্ভব গম্ভীর ও কেউ তার দিকে তাকাচ্ছিল না। শুধু একবার বিষ্ণুপদ যেন কোথা থেকে ঝড়ের মতো ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।···

—এ কী মাস্টারমশাই, ভাবাই যায় না, আপনি— আপনি মাল খাচ্ছেন?

ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল শান্তনু, কেননা বাস্তবিক, বিষ্ণুপদ তার সামনে। সে লুকোবারও সুযোগ পায়নি। কার এসব ফাঁদপাতা যে একে একে সবাই এই কেবিনে এসে হাজির হচ্ছিল? এরপর কি গৌরী আসবে?

—কার খোঁজ করতে এসে কাকে দেখলাম। এত উচ্ছন্নে গেছেন আপনি? আপনি না গুরুমশাই, টিচার? যা হোক এখন আমার মোটে সময় নেই। এখানে কেউ কি এসেছিল? কাউকে দেখেছেন? আমাদের মতো কেউ?

স্বপ্নের মতো আবছা যাকে সে দেখেছিল ভোজালি হাতে, তার কথা সেদিন বলতে পারল না শান্তনু, কেননা কান টানলে মাথা আসার মতো গৌরীও এসে পড়ত, কেননা সে তো মেয়েমানুষ সেজে গৌরীর কাছে গিয়েছিল এবং তাকে পেয়ে গৌরী যা করার করেছিল, কবে কে জানে! গৌরী ধরা পড়লে সেও কি নিস্তার পাবে?

—এটা কি তাহলে মিটিং-প্লেস। সেও ঢুকল আর আপনিও এখানে বসে! আগেই সন্দেহ করেছিলাম, আপনি ওদের দালাল। দাঁড়ান, আপনার ব্যবস্থা পরে হবে, আগে তো তাকে ধরি।

বলেই ঝড়ের মতো যেমন এসেছিল বিষ্ণুপদ তেমনিভাবে চলেও গিয়েছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর শান্তনু আবার গিয়েছিল বিনয়বাবুর কাছে। না গিয়ে উপায় ছিল না। একজন তার পিঠের চামড়া তুলতে চায়, আরেকজন তাকে দেখে নিতে চায়। সে একা কী করবে। আর এই সমস্যা কে মেটাবে। না পারে বিষ্ণুপদ না পারবে গৌরী। তার কথা একমাত্র ভাবে বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তার কাছেই সে তাই গিয়েছিল। যখন কোনো বড় সমস্যা ছোট ছোট সমস্যায় টুকরো টুকরো হয়ে এক একজনকে গ্রাস করে, তখন যদি সে বড় সমস্যার মূলোচ্ছেদ না করতে পারে, তখন যদি তার সংগঠন না থাকে বা কোনো সংগঠনেই যদি তার ঠাঁই না হয়, তখন কে আর আসবে সমাধান করতে। তাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বেশ তো তাই হোক। গোমেদ ধারণ করে তার স্পর্শে সে বাঁচুক, তাতে কার কী। সে যদি মদ খেতে পারে, তাহলে গোমেদের কাঁধে হাত দিয়ে সে নিজেকে বাঁচাবার উপায়ও খুঁজে নিতে পারে। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব

মঙ্গলালোক— তবে তাই হোক। তাই হোক।

বিনয়কৃষ্ণ চেম্বারে একা ছিলেন। তাকে দেখে তিনি কিছুক্ষণ অবাক হ'লেও তারপর বরাভয়ের একপ্রকার হাসিও রেখেছিলেন মুখে।
—কী হ'ল আবার।
যা হল তা খুব দ্রুত হ'ল। বিনয়কৃষ্ণর কাছে একটি রুপোর আংটির মধ্যে সিলোনিজ গোমেদ বসানো ছিল, কার জন্য বানানো কে জানে। হয়তো বা তারই ভবিতব্য। সেই আংটি সমেত নিজের বাড়িতে শান্তনুকে নিয়ে গিয়ে তিনি হাতমুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটা ধোয়া ধুতি পরে খালি গায়ে ঠাকুর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে ১৫ মিনিট প্রায় কাটিয়েছিলেন আংটি নিয়ে এক অনধিক ৩ ফুট লম্বা কালীমূর্তির পদতলে। ততক্ষণে তাঁর নির্দেশ মতো শান্তনু হাত মুখ ধুয়ে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে তাঁরই এক নতুন জোড়া ধুতি পরে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর ঘরের সামনে। এক সময় তাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে বলে প্রায় আদেশের সুরে বলেছিলেন, 'দুই হস্ত অঞ্জলিবন্ধ করুন।' পরে স্বয়ং দাঁড়িয়ে আরও বলেছিলেন, 'নৈঋত কোণে মুখ করে দাঁড়ান।' এ কথায় আদেশ ছিল না। কেননা তিনি জানতেন যে শান্তনু নৈঋত কোণ কোনদিকে জানে না। সেভাবে দাঁড় করিয়ে পুনরায় আদেশের সুরে বলেছিলেন, 'দক্ষিণ অনামিকা প্রসারিত করুন।' শান্তনু তাই করেছিল, এটা সে জানত। তিনি সেই সচন্দন আংটি তার আঙুলে পরিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, শান্তনুকেও বলতে বলেছিলেন, 'ওঁ ঐঁ হ্রীং রাহবে নমঃ।' ওই মন্ত্র অসংখ্যবার তিনি প্রম্পট্ করেছিলেন, যা না শুনেও বলা যায় ১০৮ বার।

তার ডানহাতের রিং-ফিংগারে গোমেদ প্রথমেই তেমন জ্বলজ্বল করেনি। চন্দন উঠে গেলে চকচকে হ'ল। ইলেকট্রিক লাইটের নিচে আশ্চর্য দ্যুতি খেলেছিল এক সময়। এই গোমেদ বা টোপাজ হ'ল পুষ্পরাগমণি, এক ধরনের পাথর, পোখরাজ, বিনয়কৃষ্ণ বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন প্রথম গ্রিস এর মূল্য বুঝে রত্ন হিসেবে অলংকারে ব্যবহার করত। রোমানরা এর নাম দেয়। ব্রাজিল, রাশিয়া, মেক্সিকো ও সিলোনে এই পাথর ক্রমে রাজরাজড়াদের মুকুটে, বালায়, কণ্ঠে দুলতে থাকে। চীন প্রায় আধুনিককালে সেই আফিং যুদ্ধের সময় এই রত্নের ব্যবহার শুরু করে। তার হাতের এই গোমেদ আদিতে ছিল হলুদ, ব্রাজিলের টোপাজ প্রচণ্ড তাপ দিয়ে প্রথমে গোলাপি, পরে সিলোনে আরও তাপ দিয়ে রক্তিম করা হয়। এর রক্তিমতা অনেকটা সর্ষের তেলের মতো। একদা এই রত্ন প্রায় হীরের কাছাকাছি একপ্রকার পাথর ছিল। প্রথম তুষার যুগের আগে পৃথিবীর গাছপালা ছিল এখনকার থেকে অনেক বড় বড়, অতিকায়। তখনকার ঘাস ছিল এখনকার হোগলা বনের মতো। ঘাসের আরেক সহোদর বাঁশগুলি

ছিল অস্বাভাবিক মোটা, বড় বড় পাইন গাছের গুঁড়ির মতো। বট-অশ্বথ গাছ তখন ছিল না কিন্তু তাদেরই প্রপিতামহরা ছিল অসম্ভব বিশাল। তারপর ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। ভূকম্পনে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, ৪০ দিন ৪০ রাত্রির অবিরাম বৃষ্টিপাতে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে গ্লেসিয়ার নেমে আসায় যখন সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তখন মাটির অনেক নিচে পড়ে গিয়েছিল এই সব মৃত গাছগাছালি। কম বেশি দু'হাজার বছর ও-রকম পড়ে থেকে, তারা মাটির তলায় সকলেই কিন্তু কয়লা হয়ে যায়নি, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুত্তাপে কিছু কিছু হীরেও হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই এক সহোদর এই হলুদ গোমেদ। পুনরায় তাপ পেয়ে তার হাতে রক্তিম হয়ে জ্বলছিল সে-সময়। আঃ ভোলা যাবে না তার বরাভয় ঔজ্জ্বল্য!

এর পরে যা ঘটল, ঘটনা হিসেবে তা বহুল হলেও শান্তনু ২/৪ কথায় তা বলে দিতে পারে। কেননা শান্তনু স্বভাব-দুঃখী। সে দুঃখের কথায় বড়। সে যদি পদ্য লিখত, তাহলে তার নাম এতদিনে 'কবিকঙ্কন' হয়ে যেত, অন্তত 'পেসিমিস্ট' তো হতই। কিন্তু গোমেদ ধারণ করার পর, যে কোনো কারণেই হোক, তার দুঃসময় কেটে গেল। তখন ১৯৭২ সাল। তার সুখের সময় শুরু হয়েছে। এই সুখের কথায় শান্তনু প্রায় মূক। যখন বিষ্ণুপদরা ও গৌরীরা মুখোমুখি গোলাগুলি চালাচ্ছিল ও চালাতে চালাতে উভয়েই প্রায় শেষ যখন, তখন আর শান্তনুকে পায় কে! তার আগে বলা বাহুল্য ওরা উভয়েই তাকে কম হেনস্তা করার চেষ্টা করেনি। কিন্তু তখন তার হাতে গোমেদ। বিনয়কৃষ্ণ তখন তার সহায়। তিনিই উপায় বের করেছিলেন। সি. পি. আই.-এর গণ-ফ্রন্টে নিয়মিত বক্তৃতা দেওয়া এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যবস্থা করলেন। কসবার সেই হোলটাইমার এখন যিনি সি. পি. আই., তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল। বিনয়কৃষ্ণ দিয়েছিলেন একটি টেলিফোন নাম্বার : 21581। প্রয়োজন হলে এই নাম্বারগুলি ডায়াল করলে কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না। ওই নাম্বার-গুলি যে অফিসের সেখানেও গিয়েছিল শান্তনু। না সংকোচ হয়নি ডি. আই. বি. অফিসে যেতে। কেন সংকোচ হবে? সবাই তো যায়। কে যায় না? আর এ সবের মধ্য দিয়েই একদিকে সংগঠন হিসাবে সি. পি. আই. অন্যদিকে রাষ্ট্র হিসেবে ডি.আই.বি. শান্তনুর হাতে গোমেদ থাকাতেই বোধকরি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্রমে।

এসবই অবশ্য বিনয়কৃষ্ণের তৎপরতা। তিনি বিনয়ী, বলেছিলেন, গোমেদের ছত্রছায়ায়। হয়তো তাই। সেজন্য শান্তনু অচিরাৎ আসানসোল ছাড়বার ঝোঁকে চাকরি পেয়েছিল কোলকাতায়, নামী পাবলিক স্কুলে। এক লাফে তার মাইনেও হয়ে গিয়েছিল ৫৯৯ টাকা ৮০ পয়সা।

আবার শান্তনুরা চলে গিয়েছিল কোলকাতায়, যেখান থেকে একদা এসেছিল

আসানসোলে। তখন ১৯৭২ সাল।
কালবৈশাখী ঝড়ে যেমন ক্যালেন্ডার উড়ে যায় তেমনি করে শান্তনুর চোখের সামনে উড়ে গেল ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫ সাল।
ঘটনা বদলাতে থাকল।
মুখোমুখি লড়ল সি. পি. এম.—নকশাল। এশিয়ার নব সূর্য জন্ম নিল ভারতবর্ষে। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল। নব-কংগ্রেস জন্মাল। চারু মজুমদার মারা গেলেন। জেলে নিহত হ'ল নকশাল। সি. পি. এম. কিছু মরল নকশালদের হাতে, কিছু নব কংগ্রেসের প্রহারে, কিছু জেলে, কিছু বসে গেল। বাকি সব জ্যোতির্ময়রা বিধান ও লোকসভার কাঁধে হাত রেখে এখানে সেখানে গেলেন পরে আরেকবার জেগে উঠতে!

শান্তনুর দিন খুলে গেল। ১৯৭৫-এর ২৭শে জুন জরুরী-অবস্থা জারী হবার ৭২ ঘণ্টা পর শান্তনুর হাতের রত্ন এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। তার সেই অতীতের গুরু, হোলটাইমার, যিনি কসবায় থাকতেন, তিনি তো সি. পি. আই.-ই ছিলেন, একদিন হঠাৎ দেখা গড়িয়াহাটার মোড়ে। ভাবাই যায়নি শান্তনুকে চিনতে পারবেন তিনি। শুধু চেনা নয়, প্রায় বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'উঃ কতদিন খুঁজেছি তোমাকে। সেই চারু মজুমদার মারা যাবার আগে তোমার খবর পেয়েছিলাম, শুনেছি তোমার ক্রাইসিস কেটেছে কিন্তু ডিটেল কিছু খবর পাইনি। ব্যাপার কী?…'
কে জানত তখন এই হোলটাইমার তাকে এনে দেবে অনির্বচনীয় হ্যান্ডি ; কে জানত তিনিই শান্তনুর জন্য খুঁজে দেবেন তেল-সোনা-কাগজের খনি ; আহা, কে জানত এরই দৌলতে, সে শান্তনু আলো, অন্ন, আকাশ ও নারীকে কিছুটা সুস্থির ভাবে পেয়ে যাবে।
কাকতালীয়, কিংবা হোলটাইমার নতুন ওই গোমেদ শান্তনুকে ১৯৭৭ সালেই দিয়েছিল কলেজের চাকরি।
অবিশ্বাস্য হলেও এটা ঘটনা, অধ্যাপনার চাকরি সে পেয়েছিল আসানসোলে। স্কুল থেকে ছ'মাসের লিয়েন নিয়ে সে অ্যাকসেপ্ট করেছিল লেকচারারের পিওরলি টেমপোরারি পোস্ট। ছ'মাস করে লিয়েন নিয়ে সে ভেবেছিল অধ্যাপনা করে যাবে। তারপর কী হয় কে বলবে? এসবের মধ্যেও গৌরীর একটা ব্যাপার বরাবরই ছিল, যা শান্তনুর সহ্য করার কথা নয়, তবু সে সহ্য করছিল। কিন্তু কী করে যে করছিল, সে নিজেই জানতে পারছিল না। এও গোমেদের বরাভয় কি না কে জানে।
ব্যাপার এই, গৌরী কিছুতেই ওই গোমেদ সহ্য করতে পারছিল না। প্রথম দিন শান্তনু অবশ্য কিছুই বলেনি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে গৌরী যখন নিজে নজর করেছিল, তখন পুরনো দিনের মতোই খুব উৎসাহ নিয়ে সে সব কথা বলেছিল। রাহুর পুরাকাহিনীও সে বলেছিল। অনেক কিছু নিজে যোগও করেছিল। যেমন রাহুর আট আটটি কালো

ঘোড়ার উপর গোমেদের দ্যুতি, শান্তনু বলেছিল, টোপাজের ব্রাইটনেস, যখন কাজ শুরু করে, তখন ঘোড়াগুলি মেরুন রঙ পায়, প্রতি সূর্যোদয়ে তারা ক্রমে যুবনাশ্ব হতে থাকে। তখন আর রথের রঙ ধূসর থাকে না, রূপময় হয়। গৌরী কিছু শোনেনি। মাঝে মাঝে মেয়েরা যেমন পাষাণ হয় তেমন নয় বরং ইডিপাস-কমপ্লেকসে ভোগা শাশুড়ির মতো, পুত্রবধূর রূপে যে মোটে মুগ্ধ হয় না, ঠিক তেমনি। হীরে-চুনীর সগোত্র প্রায় উজ্জ্বল গোমেদের দিকে সে তাকিয়েও দেখেনি। স্বভাবতই গোমেদের দৌলতে কোলকাতায় চাকরি হলে গৌরী খুশি হওয়া দূরের কথা, প্রচ্ছন্ন ঠাট্টাই করেছিল। ভাবাই যায় না, সেই গৌরীই বলেছিল, 'যাক গোমেদ তাহলে দেখছি মেকলে সাহেবের ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা! তোমাকে ঠিকই সাচ্চা শহর বা কোলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। যে কোলকাতা কিনা সাম্রাজ্যবাদীদের মৃগয়াক্ষেত্র! অবশ্য নিশ্চয় এখন তুমি আর এ-সব কথা কোলকাতা নিয়ে বলবে না, কেননা এখন কোলকাতা নিশ্চয় তোমার কাছে নকশালদের আঁতুর ঘর।'

ভাবা যার, এই গৌরীই একদিন কোলকাতা থেকে আসানসোলে এসে মুখ ভার করে ছিল। ভাবা যায়, এই গৌরীই একদা পত্রিকা দেখত শান্তনুর জন্য। কোলকাতার কর্মখালিগুলি টুকে রাখত দুপুরে না ঘুমিয়ে। শান্তনু স্কুল থেকে ফিরলে অতি উৎসাহে দেখাত। এসব ভাবা যায় না।

কিন্তু আবার আসানসোলে ফিরে আসা এবং ১৯ বছর স্কুল করে দিল্লীর মতোই দূরের নাগালের বাইরের, অধ্যাপনার পদ পাওয়া, এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই ওই গোমেদ ছাড়া! গৌরী অব্দ সাত বছর পর না খুশি হয়ে পারল না।

আর তাই এই জায়গায় বহুকাল পরে গৌরীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সে কিছু করেছিল। গৌরীকে কোলকাতায় রেখে সে একা গিয়েছিল আসানসোলে। না গিয়ে উপায়ও ছিল না। আবার ছিলও। কেননা দুনিয়ার সবচেয়ে ওঁছা বাসাবাড়ির শহর, আসানসোলে এমনিতেই ভাড়া বাড়ি পাওয়া পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, তবু লেখালেখি করে গৌরী তার আসানসোলের একমাত্র বন্ধু নমিতাদের ফ্ল্যাটে সাময়িক থাকার একখানা ঘরের ব্যবস্থা ভালোই করেছিল।

কিন্তু শান্তনু 'আগে ভাব বুঝে আসা যাক', এই লজিকে একাই যেতে পেরেছিল বিনা বাধায়। বলা বাহুল্য, ভাব বুঝে আসা কথার কথা ছিল। শান্তনু ঠিকই করেছিল অন্তত তিনবছর গৌরীকে সে আসানসোলে নেবে না। কেননা তার পোস্টটা ছিল এক ধরনের ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি যা তিন বছরের, পরে পার্মানেন্ট হ'লেও হ'তে পারে। ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস কমিশনের প্রদত্ত ভারতবর্ষের তাবৎ কলেজের লেকচারারদের ৭০০-১৬০০ স্কেলের সহযোগী আরেকপ্রকার স্কিমের অন্তর্গত এই ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি। ঘটনা এই, ৭০০-১৬০০ টাকার স্কেলের সুযোগ দিয়ে ওই কমিশন চেয়েছিল অধ্যাপকদের আরও শিক্ষিত করতে। সেই সুবাদে রিসার্চের স্কোপ দিয়ে কমিশন কিছু অধ্যাপকদের হায়ার-স্টাডির জন্য তিন বছরের রিসার্চ কোর্সের ব্যবস্থা করেছিল। এরকম

একজন অধ্যাপকের তিন বছরের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া কাজে লাগিয়েছিল ওই গোমেদ। সেই খালি পদে তিন বছরের জন্য অধ্যাপনার চান্স পেয়েছিল শান্তনু। স্কুলে প্রায়, এরকমকে শান্তনুরা ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি বলে।
গোমেদ সবই দিয়েছিল কিন্তু ওই ৭০০-১৬০০ দিতে পারেনি। বদলে দিয়েছিল যা তা, গৌরীকেও প্রথমে রিপোর্ট করতে তার লজ্জা লেগেছিল, সেটা ছিল প্রথম কিছুকাল পুরনো ৩০০-৮০০ স্কেলের ৩০০ টাকা সঙ্গে কলেজীয় মাগগী ভাতা ১৭.৫০ পয়সা, মিলে ৩১৭ টাকা ৫০ পয়সা। ভাবা যায় না। কিছুতেই ভাবা যায় না যে এর নাম অধ্যাপনা। কিন্তু অধ্যাপনা তো সেই সুযোগ যা পাবার জন্য প্রাইমারি টিচার ইস্তক সকল শিক্ষকই দিবারাত্র স্বপ্ন দেখে। কেননা অধ্যাপনা হল সেই সেরেস্তা, আপাদমস্তক যেখানে ২৪ ঘণ্টার ব্যস্ততা রেখে বস্তুত বছরে, বলা যায়, সর্বোচ্চ মাত্র ৩৬৫ ঘণ্টা কাজ করে ৩৬৫ দিনের মাইনে পাওয়া যায়। কিন্তু ৭০০-১৬০০র যুগে যদি মাত্র ৩১৭ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া যায়, যা রেভেন্যু স্ট্যাম্পের দৌলতে সে সময় ২০ পয়সা কাটা যেত তাকে অন্তত অধ্যাপনা না বলে, অবৈতনিক বয়স্ক শিক্ষার সাম্মানিক শিক্ষক বলা ভালো। তবু ভবিষ্যতের আশায়, যাকে বাণিজ্যে স্পেকুলেশন বলে, শান্তনু মেনে নিয়েছিল সেই অধ্যাপনা। বলা যায় কোলকাতার পাবলিক স্কুলের ৬০০ টাকার হক ছেড়ে মাত্র ৩১৭ টাকার অধ্যাপনা মেনে নেয়া শান্তনুর সেই ধৈর্য বা মোটা চামড়া, যার তুলনা একমাত্র গণ্ডারের সঙ্গেই চলে।
ঘটনা যাই হোক সেই ৩১৭ টাকা ৩০ পয়সায় সে যে কীভাবে ১০ মাস ১০ দিন চালিয়েছিল, আজও ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু সে পেরেছিল। এর চেয়ে ৩০০ টাকা বেশি পেয়েও কোলকাতায় তাকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। সে পেরেছিল শেষমেষ টিউশনির জোরে, যা তার জুটে গিয়েছিল ওই গোমেদীয় অধ্যাপনার দৌলতে, কিছুকাল পরে যা গৌরীও জানে না, কিন্তু তা কোনো মাসেই ৭০০ টাকার কম না। অর্থাৎ শান্তনু আসানসোলে এক সময় রোজগার করছিল ছলে-বলে-কৌশলে প্রায় ১০০০ টাকা, যাকে তারা ফোর ফিগার বলে।
এতেই গৌরী, কোলকাতায় একা, ক্রমে বদলে যেতে থাকল। কেননা প্রত্যেক মাসেই স্বামী যদি শাড়ি অথবা প্রেসার কুকার, স্টেনলেস স্টিলের থালা অথবা বেডকভার, বর্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ অথবা নাইটি ব্রা এনে দেয় তাতে দুনিয়ার কোন বৌ না খুশি হয়! আর গৌরী বৌ ছাড়া তো হাতি-ঘোড়া আর কিছু না, ওই সেই মেয়েমানুষ, যার সোনার হাতে সোনার কাঁকন দেখে পুরুষের মতিভ্রম হয়: কে কার অলঙ্কার! কিন্তু ১৮ মাস পর অধ্যাপক সমিতির ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোডের অফিসে জুতোর ক্রেপসোল ক্ষয় করে শান্তনুরা যখন ৯০০ টাকা মাস মাস পেতে আরম্ভ করেছিল, তখন মেজাজে টিউশনি ছেড়ে শান্তনু হাত-পা ধুয়ে একবার কোলকাতা গিয়েছিল গৌরীর জন্য নিজের টাকায় কেনা বেনারসী শাড়ি কিনে। সম্ভবত সেই প্রথম বাঙালী মধ্যবিত্ত, অন্তত

শিক্ষক, যে বিবাহের বেনারসী ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ হতে দিয়েও স্মৃতি নয়, নিয়মিত ব্যবহারের জন্য কিনেছিল কাতান বেনারসী। যার মধ্যে বৈবাহিক তত্ত্বের গন্ধ ছিল না। রাধা অন্তত একবার জ্যোৎস্নাভিসারে এরকম বেনারসী পরে কুঞ্জে গিয়েছিল বলে অনুমান করলে অন্যায় হবে না, বরং ভারতীয় কৃষ্টি করা হবে।

সেই বেনারসী শাড়ি যার দাম ৩৭৫ টাকা ছিল, শান্তনু জীবনে কখনো কিনতে পারবে বলে স্বপ্নও দেখেনি, তা হাতে পেয়ে গৌরীর সেই ব্রাইট মুখ, একমাত্র গোমেদই পারে যার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে, যে মুখের দিকে তাকিয়ে মারাঠী বা পার্শী অ্যাডভারটাইজার বলে উঠেছিল 'দারুণ সব কাপড় দারুণ সব জায়গায় আপনারই প্রতীক্ষায়'…গৌরীর সে মুখ ভুলবার নয়। তার কাঁচের চুড়ির মতো শব্দ করে হাসা, এরপর যত দুঃসময়ই আসুক শান্তনুর, সে ভুলবে না সেই হাসি, Even a cloudburst can't dampen her enthusiasm অর্থাৎ সেই হাসি। না, এরকম হাসিতেই যে কেবল গৌরী বদলে যেতে থাকল কোলকাতায়, একা,—তা বললে কিছু ভুল বলা হয়ে হয়ে যাবে। গৌরী নিতান্ত মেয়েমানুষ হলেও, সে যেমন মেয়ে, তেমনি তো মানুষ। মানুষের হাসি মেয়ের ঠোঁটে এলেই বা কী, তার বদলে যাওয়া যে কোনো ঋতুর বদলে যাওয়ার মতই সমগ্র সৌর-জগতের ব্যাপার। আসলে সে বদলাল তখনই যখন তার সূর্যই তাকে ঠেলে দিল বাইরে কিংবা সে নিজে যখন তার সূর্যের দিকে হেলে থাকা পালটে নিল। কেটেকুটে এও তো সৌরজগতেরই ঘটনা।

হ'ল কী একদিন, আসানসোল থেকে ফিরে, কোলকাতায় এসে, শান্তনু দেখল গৌরীর সূর্যকে, যেন ডাইং সান। দেখে অবাক হয়েছিল। দুলালকে ওভাবে আবার কখনো দেখবে ভাবেনি শান্তনু। ভেবেছিল, শনিবারের বদলে শুক্রবারে এসে, সে নিজে গৌরীকে কিছু অবাক করে দেবে, কেননা সাধারণত সে শনিবার ফেরে, সোমবার তার অফ, কিন্তু কলেজে স্ল্যাক সিজন বলে কথা, যখন মাত্র একটি ইয়ারকে পড়াতে হয় বলে সপ্তাহে ক্লাস থাকে বড় জোর ৪, ফলে মাত্র ২ দিন ক্লাস নিলেই সপ্তাহে যথেষ্ট, যার দৌলতে তার শনি, সোম ও মঙ্গলের ঊষা বুধে পা অফ-ডে হচ্ছে—এত অফে ভরা অধ্যাপনার অত্যুজ্জ্বল সময়ে, সে কিন্তু পারেনি গৌরীকে অবাক করে দিতে। বদলে, আগেই বলা হয়েছে, সে নিজে অবাক হয়েছিল দুলালকে দেখে। রীতিমত জেন্টলম্যান তখন দুলাল। ছিমছাম সূক্ষ্ম গোঁফের রেখার উপর সেই পরিচ্ছন্ন নাক, যা তখন উন্নাসিক হতে পারত কিন্তু না হয়ে হেসেছিল অদ্ভুত। সেই হাসিতে স্মৃতি ছিল না, একটা অন্যরকম রিলেশনের এনটিটি ছিল। এমন কি পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছিল। সে প্রণাম না নতজানু, শান্তনু কোনোদিন তার ব্যাখ্যা পাবে না। কেননা জীবনে প্রথম সে পেয়েছিল সেই প্রণাম, যা বাঁ হাতের করতলে টেনে নিয়েছিল তার ডান পদতল এবং বলাই বাহুল্য, ডান করতলে সে, দুলাল, টেনেছিল তার বাম পদতল। সেই টানার মধ্যে কোনো ফর্মালিটি না, বিলক্ষণ বিনয় ছিল, বুঝি বা প্রায়শ্চিত্তও। নতুবা বলত কি, 'আমার সৌভাগ্য যে,

আপনার দেখা পেলাম, এসেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সব শুনে, কিন্তু কালকে না এসে, আজকে এলেন, আমারই সৌভাগ্য ! আমি তো লেকচারারশিপ পাওয়ার কথা জানতাম না !···আসলে আপনারা যে এখানে আছেন এখন, এই জেনেছি ৩/৪ দিন হল —আজকে ছাড়া আমার আর আসা হত না, আর হবে কিনা তাও জানি না। কালই আমাকে দিল্লী যেতে হবে। কবে ফিরব জানি না, সেখান থেকে হয়ত বাইরেও যেতে হতে পারে।'

—কেন, এখন কী করছ ?

—সি. এম. ডি. এ.-তে আছি।

—বাঃ !

—ও তোমার নাম করে পিপিঙ থেকে দেখ না কত কী এনেছে !

কান না দিলেও, নারী কণ্ঠে না আসত যদি, তবু চোখ না তুলে বলা যেত যে কথাটা গৌরীর।

—আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন।

এটা দুলালের। এ বলার মধ্যে আগের কোনো ব্যাপারই নেই কিন্তু এ যেন ও পার থেকে বলা, মাঝখানে কত জল যেন বয়ে যাচ্ছে।

—তোমার জন্য আরও কত কী এনেছে, এসেই দেখ না।

সেই গৌরীই বলল। কোথায় যেন বদলে যাচ্ছে তার ভয়েসও। কী যেন হয়েছে তার ! কী ? শান্তনু দেখল, হাত-মুখ ধুয়ে এসে, ওল্ড্ মোনার্কের আফটার শেভ্ লোশন, শেভিংক্রিম ! রোমানিয়ার গ্যাস লাইটার, ইউ. কে.-র পার্কার পেন, গ্রুনডিগ্ টেপরেকর্ডার।

গৌরীর হাসি, দুলালের বহু দূর থেকে কানে কানে কথা বলার এফার্টলেস গলা, শান্তনু ভুলে যাচ্ছিল স্মৃতি, সে দুলাল সম্পর্কিত সত্তরের কৌতূহলগুলিকে অনায়াসে পারছিল নেভাতে, যেন এক ধরনের গেট্টুগেদার হচ্ছে, যেন সবাই মোটাসোটা গোলগাল ; যেন সবারই চুলে পাক ধরেছে ; যেন সবারই গালগুলি ভারি ; যেন সবারই পায়ের তলায় মাটির বদলে লিনোলিয়াম ফ্লোর, যাকে সুখী গৃহকোণ. শোভে গ্রামোফোন বলে। না, তাই বলে দুলাল কিছু গ্রামোফোন আনেনি। এনেছিল পিপিঙ থেকে স্মোকড্ মাটন্ ফ্রায়েড রাইস, বয়েলড্ প্রন ইন্ মাস্টারড্, প্রন চাউ, স্মোকড্ সসেজ, চিকেন রোস্ট। বলার নেই যে গোমেদের অমোঘ ক্রিয়ায় গৌরীর সূর্য বদলে যাচ্ছে।

রাত ঠিক ৯টায় বেরিয়েছিল সেই মূল্যবান সিঙ্গাপুরী কাচের বাসন, শেষ কবে বেরিয়েছিল মনে পড়ে না। আঃ তার ঠুনঠান আওয়াজ মুহূর্তে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে ফাইভস্টারে। যে জন্য ওই বাসনের পিছু পিছু টেবিলের উপর এল ইজিপশিয়ন কটনের দামি চাদর, যা একদা তারা বিছানায় পেতেছে, বিয়ের জল যতদিন শুকিয়ে যায়নি গা থেকে ততদিন। সেই ধবধবে সাদা সাহেবী চাদরের উপর ড্রেস করা খাবার, সবচেয়ে

তাক লাগানো ড্রেস ছিল স্যালাডের ; গৌরী করেছিল ডিম, পেঁয়াজ ও মাত্র শশার কুচি দিয়ে। না, পুরনো কোনো কথা হয়নি। এক্ষেত্রে পুরনো কোনো কথা হয় না।
শোবার বিছানা পাতা হ'ল আরও অদ্ভুত। তাদের ২ ঘর বিশিষ্ট বাসার বাইরের ঘরে দুলালের বিছানা হল মেঝেতে। গৌরী নিজে শোবার ঘরে বিছানা পাতল তাদের দুজনের, একান্তে। প্রতিবাদ করেছিল শান্তনু। ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে চেয়েছিল, তারাই দুজনে মেঝেতে শোবে আর দুলাল যাবে শোবার ঘরে। হয়নি। দুলাল দেয়নি হ'তে।
কিন্তু শান্তনুও সহজে শুতে যায়নি গৌরীর কাছে, দুলালের কাছে বসেছিল কতক্ষণ কে জানে। একে একে আলো নিভেছিল। গৌরীও 'দেরি কোরো না শুতে' বলে শুতে চলে গিয়েছিল, তার ঘরেরও আলো নিভে গিয়েছিল। শুধু জ্বলছিল আলো এই বাইরের ঘরে। যেখানে সে ও দুলাল এতক্ষণ প্রায় কথা বলছিলই না বলা যায়। কিন্তু চতুর্দিক নির্জন হ'য়ে গেলে, পাখার শব্দে মাত্র সময় বয়ে যেতে থাকলে, কথা শুরু করেছিল দুলাল।
—লাইটারটার ইউজ দেখিয়ে দি!
সে লাইটার খুঁজছিল, যা তখন শোবার ঘরে। নিয়ে এসেছিল শান্তনু। একটা বাক্স। খুলে দুলাল বার করেছিল একটা ছোট্ট পিস্তল। সঙ্গে একটি পলিথিনের টিউব। গায়ে লেখা 'ইকন', লেখা Butelie, আরও লেখা Atenji Inflamabili, তলায় Made in Romania, টিউব দেখিয়ে বলেছিল দুলাল, এই টিউবে যে লিকুইড আছে, সেটা, হাইলি ইনফ্লেমেবল, এই দেখুন টিউবের মাথায় সিরিঞ্জ, লাইটারের গায়ে······বলে সে পিস্তলটি নিয়ে তার হাতলের একটি ঢাকনা চাপ দিয়ে খুলল, দেখা গেল গায়ে ছোট্ট একটি পিনহোল, সেখানে টিউবের সিরিঞ্জ লাগিয়ে সে চাপ দিল, একটা প্রেসারের আশ্চর্য শব্দ হল, দুলাল বলল, 'এভাবে এই লাইটারে এই লিকুইড ইনজেক্ট করতে হবে। তারপর দেখুন'···বলে সে টিউব রেখে পিস্তলের হাতলের ঢাকনা বন্ধ করল। তারপর পিস্তলের ট্রিগারে হাত দিল—ছোট্ট পিস্তল, কোনো ব্যাপারই না, তবু দেখে শান্তনুর বুক ফাঁকা হয়ে গেল। ট্রিগার টিপল দুলাল। গ্যাস জ্বলে উঠল। আবার ট্রিগার টিপল, গ্যাস নিভে গেল। দম ছেড়ে শান্তনু বলল, 'বুঝেছি'। তখন দুলালের চোখ দুটি মৃত ইলিশের চোখের মতো অপলক, খোলা, চকচকে। সে সেই চোখ ঘুরিয়ে পাশে রাখা ভি. আই. পি. সুটকেস খুলল। বের করল একটি হলুদ রঙের সিগারেটের প্যাকেট। গায়ে লেখা 'State Express 555 International'— 'নিন খান', বলে দুলাল প্যাকেট খুলে একটি সিগারেটের মাথা বার করে শান্তনুর দিকে এগিয়ে দিল।
—সে কী! আমি তো চার্মিনার খাই।
—হ্যাঁ এবার থেকে আপনি এই সিগারেট খাবেন। দশ প্যাকেট এনেছি। রোজ দশটার বেশি খাবেন না। এতে দিন কুড়ি চলে যাবে। আমি আবার পাঠাব।

সিগারেট ঠোঁটে নিল শান্তনু। পিস্তলে ট্রিগার টিপল দুলাল। গ্যাস জ্বলল। এবার আর ভয় করল না। সিগারেট ধরাল শান্তনু। আবার ট্রিগার টিপল দুলাল। গ্যাস নিভে গেল।

—আপনি কি এখনো কার্নাট্রি লিকার খান ?

—না, না তো।

—আর খাবেন না। এখন থেকে আপনি খাবেন এই জিনিস। বলে দুলাল তার সুটকেস থেকে বার করল একটি পেটমোটা কালো বোতল। যার গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা ওল্ড হেরিটেজ, তার নিচে লেখা : স্পাইসড স্কচ হুইস্কি···সেঞ্চুরি ওল্ড···'ব্ল্যাক হর্স'। বোতলের ছিপি খুলে টেবিলে রাখা কাচের গ্লাসে ঢালল, অনেকটা জল মেশালো পাশের জগ থেকে। বলল, 'খান'।

—ব্যাপার কী?

—আপনার জন্য এনেছি, আপনি ব্যবহার করলে শান্তি পাব।

—তুমি একটা সিগারেট নাও।

—না, সিগারেট আমি আর খাই না।

—বেশ, তাহলে এই ড্রিংকসই নাও।

—না, আমি ড্রিংকস নিতে পারি না, আমার অ্যালার্জি আছে। আপনি খান। আমি দেখব।

শান্তনু চুমুক দিল। অদ্ভুত স্বাদ। ঝাঁঝালো, মিষ্টি।

—সিপ করুন, একসঙ্গে খাবেন না, কিক হবে। শান্তনু আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে এক সময় গ্লাস ফাঁকা করল। কোনো কথা আর হল না। শান্তনুর কাজ শুরু হল প্রথমে মাথায়, তারপর সর্বত্র। শান্তনু শুয়ে পড়ল দুলালের বিছানায়। দুলাল তার পায়ের কাছে বসল।

—আপনাকে আরেকটা জিনিস দেব।

শান্তনু বড় করে চোখ খোলার চেষ্টা করল। পারল না। তবু দেখল, আবার দুলাল তার সুটকেস থেকে কী যেন বার করছে। দেখল, একটি ডাইরির মতো পকেট বুক।

—একটা ফোল্ডার, হাতে নিন।

শান্তনু হাতে নিল।

—এখন খুলবেন না। কাল ভোরে খুলবেন।···এখন আপনি এটা হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। বলে আবার দুলাল তার পায়ের কাছে বসল। শান্তনু ধরে রইল সেই ফোল্ডার, যা সে ডাইরি মনে করেছিল। কী আছে এই ফোল্ডারে তা জানবার কৌতূহল পর্যন্ত ভালো কাজ করছে না। শুনল দুলাল বলছে :···'আপনি গোমেদ নিয়েছেন, ভালো, আমরা আসলে নষ্ট হয়ে গেছি। আমাদের হাড়ে ঘুন ধরেছে। আপনি ভোরে যখন

ফোল্ডার খুলবেন, সব বুঝবেন। আসলে আপনাকে খতম করার দীক্ষা যার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তিনিই এখন এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁকেই একমাত্র বাবা বলে ডাকেন। সেই বাবার কোথাও ছিটেফোঁটা আর লাল নেই।…তিনি লাল রঙকে অধর্ম মনে করেন। আর আপনি যাঁর কাছে যাবেন ভেবেছিলেন বাঁচার জন্য, তিনি এখন এম. এল. এ. তাঁর অসুখ হলে আসানসোলের তাবৎ বড় ডাক্তাররা বিনা কলে দেখতে আসে। এখন কোথাও কোনো সূর্য নেই, দিনের কান্তিময় আলো বা বাতাস কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। আপনাকে তাই রাহু গ্রাস করার সুযোগ পায়। কিন্তু ভাবুন, আমি তো কোনোকালেই রাজনীতিতে ছিলাম না, অথচ একেবারে রক্তাক্ত রণাঙ্গনে গিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সকলের পেরেন্ট বডি সি.পি আই., একা হয়ে নষ্ট হতে থাকল। তারপর একা হল সি.পি.এম.। এখন কী ভয়ংকর একা সি. পি. আই.(এম.এল.)। বাবা যদি ঘুষখোর হয় আর ছেলে যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে ঘুষের বদলে উৎকোচ ছেলেকেও এক সময় গ্রাস করে। ব্যাপার যা থাকার, তাই থাকে। আপনি একা থাকবেন না কখনো। একা হলে ওই ফোল্ডারটি দেখবেন। আমি আর আসব না। এই শেষ।…'

তারপরেও কোনো কথা দুলাল বলেছিল কিনা, জানার উপায় নেই আর, কেননা বেলা করে পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সে প্রথম মুখ দেখেছিল গৌরীর। তার স্নান হয়ে গেছে। চোখ স্বচ্ছ। মুখে হাসি। সহজেই বলল, ও চলে গেল, তোমাকে ডাকতেই দিল না। তোমার চা আনি?

শান্তনুর সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল ফোল্ডারের কথা। এখন কি ভোর? তবু সে খুলল ফোল্ডার। যা তার আর হাতের মুঠোয় নেই। বিছানায় পড়ে আছে। খুলে দেখল, তিনটি রঙিন ফটো। মাঝখানে রামকৃষ্ণ, বাঁদিকে বিবেকানন্দ, ডানদিকে সারদাদেবী। রামকৃষ্ণের পরনে লাল কাপড়, বিবেকানন্দের পরনে গেরুয়া, আর সারদাদেবী লালপেড়ে কাপড় পরে আছেন। তাঁর কোলে হলুদ ফুল, সূর্যমুখী।

চা নিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়াল গৌরী। গৌরীর পরনে সাদা শাড়ি। চুল ভেজা। শান্তনু তার আঙুলের গোমেদের দিকে তাকাল। আদর করল। গোমেদ অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। যে জন্য দুদণ্ডও পার হল না, গৌরী গোমেদের রেফারেন্স বিনা বলেছিল, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ আমারও ডেট অব বার্থ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সাল।

শান্তনু মুহূর্ত দেরি করেনি, বলেছিল, 'ভুলব কেন, জানি, মনে আছে।'

—তাহলে আমাকেও একটা গোমেদ দাও।

না, গৌরীকে বেনারসী শাড়ি দেওয়া যায়, এমনকি মুক্তোর মালাও দেওয়া যায়। কিন্তু গোমেদ দেওয়া যায় না। কেননা তখন ১৯৭৯, ১৯৮০ সাল বা শান্তনুর মোস্ট ইমপরট্যান্ট

টাইম হতে আর মাত্র এক বছর বাকি। এসময় অন্তত গৌরীকে গোমেদ দেওয়া যায় না। একই ডেট অব বার্থে জন্মানো আরেকজনকে, অন্তত সে যদি স্ত্রী হয়, তাকে কোনো মতেই গোমেদ দেওয়া যায় না। কেননা এই তো সবে গোমেদের জোরে গৌরীকে গ্রিপে পাওয়া। এরকম সুসময়ে গৌরীকে গোমেদ দিয়ে সে কেন নিজের পায়ের তলার মাটি ছাড়বে?

সে মুখে বলল, নিশ্চয় দেব, কিছু অপেক্ষা কর। তোমার তো আমারই মতো ৫-৬ রতি গোমেদ দরকার, অন্তত ৬০০ টাকার ব্যাপার। দু-চার মাস লাগবে।

তখন জানুয়ারি ১৯৭৯। মেয়েমানুষেরা তারিখের হিসেব রাখে ভালো। সুতরাং গৌরীর বলতে দেরি হল না, সেভেনটি এইটেও তুমি প্লাস টু-র খাতা দেখে পেয়েছ সাড়ে পাঁচশ, সেভেনটি নাইনে পাবে না?

সহসাই— মনে পড়ে গেল শান্তনুর, তার পাবলিক স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের এগারো-বারো ক্লাস পড়াবার দৌলতে সে হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের ফাইন্যালের খাতা দেখেছিল ১৯৭৮ সালেই। এই ১৯৭৯ সালের মতো জানুয়ারিতে বোধ করি ফর্ম ফিল-আপ করেছিল। সাড়ে পাঁচশ'র কিছু বেশি টাকা পেয়েছিল।

— কী পাবে না?

—পাব।

—তবে?

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসুক।

—তদ্বির কর, সহজে আসবে কি? কিছু কি হয় সহজে, আজকাল, তদ্বির ছাড়া?

—কেন আসবে না? গতবারই তো দেখেছি। গতবারই তো অ্যাপ্লাই করে নাম রেজিস্ট্রি করেছি।

— তুমি তো এখন প্রোফেসর।

—আমি তো এখনো ইলেভেন-টুয়েলভ পড়াই।

—সে কী?

—কেন, জানো না, ইলেভেন-টুয়েলভ কলেজেও আছে।

—সে কী?

—স্কুলেও আছে, কলেজেও আছে।

—তবুও তুমি খোঁজ নাও। স্কুলে যাও।

—গতবারে যখন ছিল, এবারেও থাকবে, ভেব না।

—কিন্তু এবারে যা পাবে, সব আমার, মনে থাকে যেন!

—ঠিক আছে। এবারের খাতা দেখার টাকায় তোমার গোমেদ সিওর।

কিন্তু ওই গোমেদের কল্যাণেই কিনা জানা যাবে না কোনোদিন, তবু সেদিনই বিকেলে

তার প্রাক্তন স্কুলের অশোক মিত্রের সঙ্গে দেখা, যে আবার কলকাতা ডি সি.-র এ.বি.টি.এ.-র একজিকিউটিভ। কথায় কথায় তার সঙ্গে খাতা দেখার প্রসঙ্গ। ভাগ্যিস দেখা হল, নতুবা সে জানতেই পারত না, পরের দিন লাস্ট ডেট, হায়ার সেকেন্ডারির খাতা দেখার জন্য আবেদন করবার। প্রত্যেকবারই আবেদন করতে হবে। সেভেনটি এইটের মতোই ছাপানো ফর্মে। যা প্লাস টু (হায়ার সেকেন্ডারি) স্কুলগুলিতে এক মাস আগেই এসে গেছে। যদি এক-আধটা থেকে যায় তো একমাত্র দিতে পারবে হেডক্লার্ক।

ছুটে গিয়েছিল শান্তনু তার প্রাক্তন স্কুলে। তখন সন্ধ্যে ৬টা। জানুয়ারিতে রীতিমতো রাত। তবু হেডক্লার্ক থেকে যায় যদি এই ভেবে সে এবং সে-ই ছুটে গিয়েছিল বললে একান্ত নেমকহারামি হবে, ছুটে গিয়েছিল গোমেদ। নতুবা হেডক্লার্ককে পাওয়ার কথা না। কী একটা কাজে ফেঁসে গিয়ে সে ছিল, তার থাকার কথা না। আর ফর্মও থাকার কথা না. তবু একটা অফিস-কপি ছিল, যদি এমার্জেন্সিতে লাগে।

একেই বলে ছত্রছায়া কিংবা কৃপা কিংবা কী বলবে, ভেবে পেল না শান্তনু, সে শুধু গোমেদের উপর হাত রেখেছিল। তারপর ফর্ম নিয়ে ট্যাকসি করে হো-চি-মিন সরণিতে গিয়েছিল। হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের অফিসে। সেখানে ওই গোমেদ ধরিয়ে দিয়েছিল রিসিভিং সেকশনের ডিলিং ক্লার্ককে। না, সেদিনই গোমেদ পুরো কাজটা করতে পারেনি, কেননা ডিলিং ক্লার্ক বলেছিল, আজ রিসিভ করার উপায় নেই। কাল করবে, তা ছাড়া অথরিটির সই লাগবে। অথরিটি বলতে সেই ইনস্টিটিউট যেখানে সে ইলেভেন-টুয়েলভকে সার্ভ করে।

এখানেই আটকে গিয়েছিল শান্তনু। কেননা সেদিন আসানসোলে গিয়েও প্রিন্সিপালের সই নিয়ে পরের দিন ফেরা অসম্ভব। তবু সে একবার ভাবল, কী করা যায়! বাড়ি ফিরে গৌরীর সঙ্গে পরামর্শও করল, ঠিক আগের দিনগুলির মতো। এবং গৌরীও সেভাবেই মাথা ঘামাল সেই আগের দিনগুলির মতো। এমন কি গৌরী প্রায় ভুলে যাওয়া এক গাল হেসে বলেও ছিল,

—ভাবছ কেন? তোমার গোমেদ দেখো ঠিকই কোনো উপায় করে দেবে। না, এ কথায় কোনো ঝাঁজ ছিল না।

—এক কাজ করলে হয় না? আজ রাত্রে দিল্লী এক্সপ্রেসে যাও। খুব ভোরে প্রিন্সিপালের বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ধরে চলে এস।

এরকম যে ভাবেনি শান্তনু তা নয় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রিন্সিপাল তো ঠিক আসানসোল প্রপারে থাকেন না, তাঁর কলেজে আসতে আসতে বেলা এগারোটা বাজবে অর্থাৎ শান্তনুর বারোটা বাজতে আর বাকি থাকবে না, ঘড়িতে তখনো এক ঘণ্টা বাকি থাকলেও। অবশ্য একথা সে গৌরীকে বলল না, বলেওনি কোনোদিন। বললে বিপদ আছে। কেননা গৌরী প্রায়ই বলে, রাখ তোমার কলেজ—কলেজ যে আজকাল কত পাংচুয়াল হয় আমার জানা আছে। তখন তো শান্তনু পাংচুয়াল প্রিন্সিপালেরই দোহাই পাড়ে। এখন সব সত্যি

কথা বলে, এখুনি বাকি সব কিছুর বারোটা বাজানোর কোনো মানে হয় না।
মুখে বলেছিল, স্ট্যাম্প পাব কোথায় শুধু সই করালে তো চলবে না, নিচে রবার স্ট্যাম্প তো প্রিন্সিপালের ঘরে থাকে না, থাকে হেডক্লার্কের ঘরে। যাকে বারোটার আগে পেতে গেলে ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে সাধনার দরকার তার চেয়েও অনেক সাধনার দরকার হবে। তা শান্তনুর পক্ষে আপাতত সম্ভব না। এই হেডক্লার্কের কথা সবিস্তারেই বলে শান্তনু। প্রায়ই বলে, কেননা এতে মাইনে-পত্র নিয়ে মাঝে মাঝে রাখাঢাকা যায় ওই ইরেগুলার হেডক্লার্কের দোহাই পেড়ে।
—আরেক কাজ করলে হয় না? তুমি তো আসলে এই স্কুলেরই টিচার, লিয়েন নিয়েছ, এই যা; ওতো ছুটি নেওয়াই হ'ল, এই স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে সই নিলে হয় না?
বাঃ, শান্তনু মুখে না বলে পারল না। কে গোমেদ, গৌরী না শান্তনু? কার হাতে এখন গোমেদ, গৌরীর না তার? তবে কি এই টাকায় গোমেদ হবে বলে গৌরীর গ্রহরত্ন এখন থেকেই কাজ শুরু করে দিল। শান্তনু আবার বলল, বাঃ!
এই বলার পর, যদিও রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা, শান্তনু ছুটল হেডক্লার্কের বাড়িতে। আসলে প্রিন্সিপালের কাছে যাবার সাহস নেই শান্তনুর। কেননা তাঁর একটা প্রিন্সিপল্ আছে। সাবেক কালের অক্সফোর্ডের বি. এ.। এখানে সোজা আঙুলে ঘি তোলা শান্তনুর কম্ম নয়। বরং সে বাঁকা আঙুলে ঘি তুলুক।
তাই তুলল। হেডক্লার্ককে দিয়ে রবারস্ট্যাম্প, ওপরে হেডক্লার্কের ইল্লিজিবল সই। প্রায় প্রিন্সিপালের মতো। এটা হেডক্লার্কের দু-নম্বর কাজ। এরজন্য মেহনত করতে হয় না মোটে, শুধু হাতে কিছু গুজে দিলেই হল। যা দিতে গিয়ে, হয়ত বা গোমেদই, হেড-ক্লার্ক জিভ কেটে, সে-কী, আপনার কাছ থেকে নেব? ধম্ম হবে না···বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল।
বাড়ি ফিরে আর্কিমিডিসের মতোই ইউরেকা বলে সইসাবুদের ফর্ম গৌরীর চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। তখন যদিও ঘড়িতে ১০টা, তবু গৌরী চাইবার আগেই তাকে চা দিয়েছিল, এক কাপ।
—নাও, চা খেয়ে ফর্ম ফিল-আপ করে নাও। খেয়ে দেয়ে উঠে তো আবার তুমি মোটে কিছু করতে পার না।
করেছিল তাই! তার ডেট অব বার্থ সমেত ডিটেল বায়ো-ডাটা, আরো ডিটেলে কোয়ালি-ফিকেশনের যাবতীয় এ টু জেড লিখে শান্তি-নীরবতা পালন করেছিল দুজনে দুমিনিটেরও অনেক বেশি।
সে রাত্রি ভুলবার না। বলা উচিত, ওই গোমেদ ভুলবার না। খেয়ে দেয়ে শান্তনু শুয়ে পড়েছিল বিনা প্ল্যানে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গিয়েছিল! গৌরী এসেছিল সব কাজ মিটিয়ে অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েই টেনে নিয়েছিল শান্তনুর

মাথা। পান খেয়েছিল গৌরী। বিলক্ষণ জর্দা ছিল। বুকের মধ্যে শান্তনুর মুখ এনে নিজের থুতনি রেখেছিল শান্তনুর কপালে। জিভ দিয়ে এ-গাল থেকে সে-গালে পান নিয়ে গিয়ে সে ঢোক গিলেছিল কৃতজ্ঞতায়। আঃ গোমেদ, ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ, ১০৮ বার জপ করার আগেই আনন্দ পেয়েছিল শান্তনু প্রায় ৯ বছর পর।

পরের দিন সকাল ১০টায় ঠিক যে সময় আসানসোলে তার থার্ড ইয়ার অনার্সের ক্লাস, সেই সময় সে খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। হো-চি-মিন সরণিতে পেঁছিতে পেঁছিতে তার ইলেভেন আর্টসের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল আসানসোল গ্যালারিতে।

কাউন্সিল অফিসের সামনে এসে আত্মপ্রত্যয়ে ছিমছাম শান্তনু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে পাওয়া বিনয়ে মুখ নিচু করেই ঢুকছিল। কিন্তু ঢুকতে পারল না। তার মতো অনেকেই গেটের সামনে বসে। কে একজন দূর থেকে বলল, 'আরে ওই তো শান্তনু, বলেছিলাম না, ঠিকই আসবে!' তাকিয়ে দেখেছিল পোস্টার, ব্যানার, লাল শালুর ফেস্টুন এবং অনেকের মধ্যে অধীর দাসকে, তার একদা সহকর্মী। এগিয়ে এল।

—কবে পেয়েছিস চিঠি? তাহলে আসানসোলে ১ দিনেই চিঠি যায়? সমীরের সন্দেহ ছিল, চিত্তদারও ছিল আর রবিবাবুতো বলেই বসলেন, 'অসম্ভব!'

শুধু হাসি ছাড়া সহসা কিছু বলতে পারল না শান্তনু। বলতে দিলও না ওরা।—'যাক, আমাদের ভোলেননি তাহলে!…ভুলবে কেন, এতো ওরও ব্যাপার! আর তো মাত্র এক-বছর, তারপর ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে আসবে…আসলে তোর বক্তৃতা দরকার, মানে কথা বলা আর কী ওই চিমসে ডি. এস্. জি.-কে, তোর তো জানা আছে ভালো এই সব প্লাস টু-র ব্যাপার-স্যাপার।…'

বুঝতে সময় নিয়েছিল শান্তনু। যথাসম্ভব চোখ উজ্জ্বল রেখেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে একে-ওকে গ্রিট করে সে বুঝেছিল, এটা অবরোধ। হায়ার সেকেন্ডারির নানা ঝুটঝামেলার মীমাংসা। ইলেভেন-টুয়েলভ ক্লাস আলাদা স্ট্যাটাসে ইনডিপেনডেন্ট হবে কিনা? অর্থাৎ হওয়া উচিত। স্কুলে থাকবে না কলেজে থাকবে? অর্থাৎ স্কুলেও থাকবে না। একেবারে আলাদা থাকবে। কেননা কিছু প্লাস টু স্কুলে থেকে আবার কিছু প্লাস টু কলেজে গিয়ে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্ট্যাটাস এক থাকছে না। স্কুলে ইলেভেন-টুয়েলভ পড়ালে ৩০০-৭০০ স্কেল, আবার কলেজে ওই ইলেভেন-টুয়েলভ পড়ালে ৭০০-১৬০০ স্কেল—এ কী ছেলের হাতের মোয়া? তাছাড়া স্কুলে এই প্লাস টু-র ক্লাস নিলে কেউ দেয় ৫০, কেউ কানাকড়িও দেয় না। স্কুল আলাদা কোনো ঘর, অফিস, লাইব্রেরি অথবা ল্যাবোরেটারি দেয় না। কোর্স হেভি। সিলেবাসের মাথা-মুন্ডু নেই। সেই সাবেককালের আই. এ., আই. এসসি., আই. কম. এর মতোই অথচ প্রিএম্বল্-এ মস্ত মস্ত কথা। ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু না। কোর্স শেষ করতেই পারা যায় না আবার ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট! শেষ পর্যন্ত ফর্মের উপর আন্দাজে নম্বর বসিয়ে যাওয়া। কে আর নেয় ইন্টারনাল

অ্যাসেসমেন্টের জন্য টেস্ট ? শেষ পর্যন্ত ক্লারিক্যাল জব করতে হয়। দিস্তা দিস্তা ফর্ম প্রতি পেপারে, ১০ নম্বরের মধ্যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, অর্থাৎ চোখ বুজে ৩/৪ মেরে যাওয়া, ২ / ১টি ভালো ছেলেকে ৫ / ৬—এর কোনো মানে হয় ? হায়ার সেকেন্ডারির সব দায়টা যেন টিচারদের, ক্লার্করা কেউ কাজ করবে না। কেননা হায়ার সেকেন্ডারি তো না ঘরকা, না ঘাটকা। সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মিলেই আমাদের অ্যাকাডেমিক লাইন। এর মধ্যে সবার ঘর-বাড়ি, টিচার, পে-স্কেল আছে—নেই মাত্র হায়ার সেকেন্ডারির। এর বিহিত দরকার। হয় উঠে যাক, নয়তো আলাদা হয়ে বাঁচুক। ওই ডি.এস. গাঙ্গুলির কত প্রতিশ্রুতি ছিল : আলাদা বাড়ি হবে, আলাদা স্কেল হবে, আলাদা টিচার্স পুল হবে। কাগজে ঘটা করে বিজ্ঞাপন হল। তারপর কোথায় কী। ডি. এস. গাঙ্গুলি এখন মুখ কালো করে থাকে। অথচ নিজের আলাদা চেম্বার, আলাদা অফিস, আলাদা স্টাফ, নিজের আলাদা স্ট্যাটাস, আলাদা পে-স্কেল আর মরতে মরণ বাঁশিওয়ালির মতো টিচারদের মুড়ি-মুড়কির এক দর। না এ হতে পারে না। এ সবেরই সুষ্ঠু রূপ দিতে এই অবরোধ। ডি. এস. গাঙ্গুলি এলে তাঁকে ঘেরাও। তাঁর কাছ থেকে লিখিত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে আটকে রাখা।

শান্তনুর বুঝতে বেলা গেল ! তার চোখের সামনে অবরোধ। চতুর্দিকে তারই সহকর্মীরা। এদিকে ওদিকে পোস্টার। ব্যানার। ফেস্টুন। আর তার দক্ষিণ অনামিকায় গোমেদ। পকেটে হায়ার সেকেন্ডারির এগজামিনার হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। আজই জমা দেবার লাস্ট ডেট। আর আজই যত ঝুট-ঝামেলা। শান্তনু কপাল না কুঁচকে পারল না। তাতে অধীর উৎসাহী হয়ে বলল, 'এ জন্যেই তোকে লেখা। তুই এর এ টু জেড জানিস ! ডি. এস. জি.-র সঙ্গে আমরাই কথা বলব, তুই শুধু ঠেকা দিবি, যদি ওই কালোমানিক কোনো পয়েন্টে আমাদের চেপে ধরে, তুই সামলাবি।'

—আমি, আমি···

শান্তনু বলতে গিয়েছিল, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।·· মনে মনে বলছিল, আমি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে এসেছি, জমা দিয়ে চলে যাব। হ'ল না, কোনো কথাই বলা হ'ল না। অধীর দাস মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়ল, কসবার পার্টি অফিস থেকে তোর ঠিকানা সংগ্রহ করেছি, তোর সেই গুরু ঠিকানা দিলেন ! তিনিই তো আমাদের কত কিছু সাপ্লাই করলেন। তাঁর স্লোগান হল, শুধু অবরোধ নয়, কাউন্সিল অফিস বন্ধ করে দাও। মনে পড়ল, অধীর এখন সি. পি. আই. করে। বামফ্রন্ট সরকার এখন। ওরা ফ্রন্টে নেই। ওদের এরকম বাম হওয়া তাই সাজে। এবং শান্তনুর সাজে না, সে যাই হোক, এখন আর ফর্ম জমা দেয়া, অন্তত এখুনি, সাজে না।

—অশোকদা, অশোক মিত্রকে দেখছি না যে !

—ওদের সমর্থন আছে। শুধু ডি. এস. জি.-কে অবরোধ করার ব্যাপারে এ. বি. টি.

এ-র সমর্থন নেই। ওরা মন্ত্রিমহল মারফত যা করার করবে, ওরা বামফ্রন্টে কথা তুলবে, ওরা প্রমোদ দাশগুপ্তকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, ওরা চায় ডি. এস. জি.-র অপসারণ। ওরা অফিসিয়ালি আসতে চায় না। কিন্তু…ওই দ্যাখ অরবিন্দ এসেছে।

অরবিন্দকে এতক্ষণে দেখল। নিজেই এগিয়ে গেল। বহুকাল পর দেখা। অরবিন্দর সেই হাসি এখনো ঠোঁটে লেগে আছে। চুল পেকেছে এই যা। চুটিয়ে সি. পি. এম. করে। অশোকদা বলেছিল কাল।

— কেমন আছ ?

—কেমন আছ, শালা, প্রোফেসর হয়েছে না পেঁপে চোর হয়েছে, শালা ভুলে গেলি।

মনে পড়ে গেল অরবিন্দের সঙ্গে তার তুই-তুকারির সম্পর্ক। শান্তনু হেসে অরবিন্দর দুহাত নিয়ে কিছু ঘনিষ্ঠতা করল, নীরবে।

—তোর খোঁজ কতদিন পাই না। প্রায় ১০ বছর হল তুই আর তো কনফারেন্সে আসিস না। আসানসোলের সুধীরবাবুর সঙ্গে কথা হয়। তুই নাকি এ. বি. টি. এ. প্রায় ছেড়ে দিয়েছিস, চাঁদা দিস মাত্র।

—আমি তো এখন কলেজে আছি। অধ্যাপক সমিতি করি।

—জানি, জানি, দুদিনের যোগী, ভাতকে বলে অন্ন।

শান্তনু আবার হেসে অরবিন্দর দুহাত নিয়ে ঘনিষ্ঠতা করল খুব। বলতে গিয়েছিল, আমি যেখানেই যাই, হায়ার সেকেন্ডারি ছাড়িনি, আজ তো হায়ার সেকেন্ডারির এগজামিনার হবার জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতেই এসেছি। বলা হল না, তার আগেই অরবিন্দ বলল, তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে, আবার আমাদের মধ্যে এলি। বসে যাস না। বসে গেলে ফ্রাসট্রেশন আসে।

শুনে শান্তনু গোমেদ লুকাতে ডান হাত পাঞ্জাবীর পকেটে রাখল। সেখানেই তার গোমেদের হাত স্পর্শ করল দুলালের দেয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণাদির ফোল্ডার, যা পকেটেই ছিল, সেখানে চুপচাপ অ্যাপ্লিকেশন ফর্মও। তার হাত ঘামছিল। না, আপাতত এই হাত ও ওই ফর্ম সর্বসমক্ষে বের করা চলে না। সমাজ বলে কথা।

—আচ্ছা, আছিস তো এখন, পরে কথা হবে।

বলেই অরবিন্দ কী করতে যেন দোতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। ওই সিঁড়ি ধরেই কাউন্সিলের অফিস। আহা, শান্তনু তো কথা বলতে বলতে অরবিন্দর পিছু পিছু যেতে পারত, কোনো এক ফাঁকে সেই ক্লার্কের হাতে গুঁজে দিতে পারত এই ফর্ম —তারপর শুধু অবরোধ কেন, বিপ্লব করারও অসুবিধে থাকত না শান্তনুর। কিন্তু কিছুই হল না। এই সুযোগে নিজেকে কিছু ফাঁকা জায়গায় একা পেয়ে সে পকেট থেকে ডান হাত বের করল। গোমেদের দিকে তাকাল, কী পারবে না ফর্ম জমা দিতে ? গোমেদ হেসে বলল, অপেক্ষা কর, সব পারব।

সহসা তার সামনে সে 'চিনি যেন' এমন একজনকে দেখল।

—চিনতে পারছেন ?

চিনতে পারল শান্তনু। রবিবাবু। তার প্রাক্তন স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারির বায়ো-সায়েন্সের পার্টটাইমার। একদা কোনো কলেজে ছিলেন, রিটায়ার্ড। যিনি শান্তনুর এখানে আসা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, অসম্ভব।

—নিন সিগারেট খান।

তাঁর হাতের উদ্যত প্যাকেটে ততোধিক উদ্যত সিগারেট নিতে শান্তনুর সংকোচ হল। বয়স্ক মানুষ। উপরন্তু জানা গেছে, তিনি এম. এস. সি. পাশ করেছেন ১৯৩৫ সালে। তার জন্মসালে। ভাবা যায় না। তাঁর এখানে আসাও যেমন ভাবা যায় না। কেননা তিনি হায়ার সেকেন্ডারির বোধকরি একমাত্র সেই পার্টটাইমার, স্কুল যাঁকে মাস মাস ২০০ টাকা না দিয়ে পারে না। তার প্রাক্তন স্কুলে বায়ো-সায়েন্সের কেউ নেই। এখন বায়ো-সায়েন্সের খুব ডিমান্ড। সেকেন্ডারি স্কুলে লাইফ-সায়েন্সের কল্যাণে ওদের দর বেড়ে গেছে। কার যে কখন পৌষ মাস আসে, কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু রবিবাবুর সঙ্গে বেশি কথা বলে না সে। বলতে পারলও না। ততক্ষণে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য গোপালবাবু দাঁড়িয়েছেন। ইকনমিকসের টিচার, তাদের স্কুলে। একদা ডাকসাইটে সি. পি. এম. ছিলেন। এখন শোনা যায় বসে আছেন ও কোটনিস মেমোরিয়াল-এ কিছু একটা করেন। সর্বদা নিজের সম্বন্ধে কম কথা বলেন। অরবিন্দর বন্ধু।

—আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

রবিবাবু সরে গেলেন।

শান্তনু তারও দু হাত নিয়ে ঘনিষ্ঠতা করল। মুখে বলল, ভালো আছেন তো ? আজ সবার সাথেই দেখা হচ্ছে। রি-ইউনিয়নের মতো লাগছে।

—আপনি তো আবার আসানসোলে। স্কুলে তো আসেন মাঝে মাঝে, শুনি—দেখা হয় না।

শান্তনু লজ্জিত হবার হাসি রাখল মুখে, কিছু বলল না।

—আসানসোলের খবর কী ?

—ভালোই।

হঠাৎ নিচু স্বরে বললেন, মহাদেব মুখার্জি তো এখন আসানসোলে, দেখা হয় ?

—একদিন হয়েছিল।

—কেমন আছেন ?

—ভালোই। তবে তার হাত দুটোর দিকে তাকানো যায় না। পুড়িয়ে শেষ করেছে।

—ওরা তো পোড়াবেই।

—তাই বলে অমন করে পোড়াবে ?

—ওরা কী আর রেখে ঢেকে পোড়ায়! ওরা দেখা মাত্র সরোজ দত্তকে গুলি করে। বাগে পেলে সি.পি.এম.-কে মারে আর হাতে পেয়ে মহাদেব মুখার্জিকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবে ভাবেন? যাই হোক, কিছু কি করছেন তিনি?

—জানি না।

—আপনার উপরে আর ঝামেলা হয় না তো?

—কোন ঝামেলা?

—ওই ৭০-৭১-এর? ঘাঁটিগলিতে যখন ছিলেন?

—আপনি জানেন?

—···। উত্তর না পেয়ে শান্তনু সতর্ক হল। গোমেদ সমেত ডান হাত আবার পকেটে রাখল। মুখে বলল,

—না, হয় না।

—আচ্ছা, পরে কথা হবে। ওখানে কোটনিস মেমোরিয়াল সোসাইটি আছে তো?

—জানি না।

—সে কী! আচ্ছা ঠিক আছে, পরে কথা হবে। এ সব কথা কিন্তু অরবিন্দর সঙ্গে না। কেমন?

—আচ্ছা।

শান্তনুর ঘাম দিল। কোথায় এসে পড়েছে আজ? গোপালবাবু চলে গেলে সেই সুযোগে আবার নিজেকে কিছু ফাঁকা জায়গায় একা পেয়ে সে পকেট থেকে ডান হাত বের করল, গোমেদের দিকে তাকাল: কী পারবে না ফর্ম জমা দিতে? গোমেদ হেসে বলল, অপেক্ষা কর, সব পারবে।

শান্তনু অপেক্ষা করল। বেশিক্ষণ না। সহসা অবরোধ নড়ে উঠল। গুঞ্জন শোনা গেল: এসে গেছে, এসে গেছে।

অবরোধ ঘন হল। কাউন্সিল অফিস বাড়ির সদর ও দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মুখে অবরোধ বিস্তৃত হল।

গাড়ি থেকে নেমে কে একজন লম্বা মুখ কালো মানুষ এগিয়ে আসছিল। চোখে বেমানান চশমা, অথচ কোথায় যেন ডোন্ট কেয়ার ভাব, মুখে কাষ্ঠ হাসি, কাগজে একবার ছবি বেরিয়েছিল, শান্তনু চিনতে পারল ক্রমে, ডি. এস. গাঙ্গুলি।

উনি অবরোধের ফ্রন্টে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে, আশে পাশে একজন পিওন ছাড়া ২ / ৪ জন ভদ্রলোক, তারা খুব বিচলিত। উনি অবিচলিত থেকে মুহূর্ত দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দুটি লেন্সের ভিতরে চঞ্চল হচ্ছিল। মুখে, লো-ভয়েসে বললেন, 'এসব কী? সরে যান।'

—না, আমরা সরব না। আমাদের কথা আছে। এখানেই বলব। আপনাকে জবাব দিতে হবে, এখানেই দেবেন। তারপর যেখানে খুশি যাবেন।

—এটা জবাব দেবার জায়গা না। আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন আসুন আমার অফিসে। কিছু পরে আসুন। আমিই ডেকে নেব।...

বলতে বলতে তিনি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সকলকে ঠেলে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মুখে অবরোধ শুয়ে পড়েছে। তিনি কোনো কিছু দিকপাত না করে এগিয়ে গেলেন। শান্তনু স্পষ্টই দেখল, তিনি শুয়ে পড়া টিচারদের ভ্রূক্ষেপ না করে একজনের ঝুঁঝরা বুকের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে, তেমন করে বোঝা না গেলেও মনে হল একজনের হাত মাড়িয়ে হন হন করে ওপরে উঠে গেলেন। যার হাত মাড়ানো হল, সে আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। প্রায় সবাই চীৎকার করে স্লোগান দিতে দিতে ওপরে উঠে গেল। শান্তনু প্রায় একা দাঁড়িয়ে রইল। তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। সে আর পকেট থেকে ডান হাত বের করতে পারল না। তার হয়ে গেল। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেয়া দূরের কথা, মনে হল বিপদ আসন্ন। তার কেটে পড়াই ভালো। পরে আবার এসে অবস্থা বোঝা যাবে। তখন ওপরে তুমুল হট্টগোল। চেয়ার-টেবিল সরানোর মুহুর্মুহু আওয়াজ। শান্তনুর আর পালানো হ'ল না। কোথা থেকে যেন ১৯৫১-র ট্রাম মুভমেন্টের সাউন্ড পেল সে। তার রক্ত চঞ্চল হল। সে এই প্রথম গোমেদের উপর নির্ভরতা হারাল। বোঝা যাচ্ছে, গোমেদ একা কাজ করে ভালো। সমাবেশে বা কোনো গ্যাদারিং-এ গোমেদ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কোথা থেকে যেন ক্রোধ আসছিল। যেন মনে হচ্ছিল, তার এই ডান হাতই মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ওই ডি. এস. গাঙ্গুলি। হাত টনটন করছে। হাত নিশপিশ করছে। হঠাৎ ইচ্ছা হল সে গোমেদ খুলে তার খালি আঙুলগুলো একবার দেখবে, যা তার নিজস্ব। সে ডান হাত পকেট থেকে বার করল। গোমেদ কেমন মাটি মাটি রঙের হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে লুকোতে চাইছে যেন। যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। আর সেই বরাভয় নেই। সেই ব্রাইটনেসও নেই। গেল কোথায়? লোক দেখে ভয় পেল নাকি? আসলে রাহুর তো গলা কাটা। ক্রোধ আছে ষোলো আনা, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে যা কিছু গেলে কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। গ্রহণ হয়, গ্রহণ ছাড়ে। ধরে রাখতে জানে না রাহু। গলা কাটা যার, তাকে আবার ভয় কী?

সহসা ছুটতে ছুটতে অরবিন্দ এল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু ডান হাত পকেটে ঢোকাল।

—এ কী তুই এখানে দাঁড়িয়ে? ওপরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে। শুনছি, পুলিশ আসবে। তাই নিচে নেমে এলাম। তুই সঙ্গে থাক।

ততক্ষণে ওপর থেকে আরও কয়েকজন এসে গেল।

সবাই মিলে রাস্তায় দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ভ্যান এসে গেল।

অরবিন্দ ছুটে গেল ভ্যানের কাছে। কী সব যেন বলল, নিচু স্বরে। মন্ত্রের মতো কাজ হল। নেহাত ভালো মানুষের মতো একজন পুলিশ অফিসার ভ্যান থেকে নামলেন।

অনুগত হয়ে অরবিন্দর পিছু পিছু ওপরে উঠতে লাগলেন। অরবিন্দ একবার শুধু শান্তনুকে বলল, 'আয় আমার সঙ্গে।' শান্তনুও ওপরে উঠে গেল। মনে পড়ল, অরবিন্দ সি. পি. এম. করে। এ রাজ্যে অন্তত রাজার জাত। ওর সঙ্গে যাওয়াই নিরাপদ। এখন ও-ই রক্ষা করতে পারবে। গোমেদ এখন ইনঅ্যাকটিভ। অরবিন্দই অ্যাকটিভ এখন। তার সঙ্গ নেয়া ছাড়া আপাতত শান্তনুর উদ্ধার নেই।

ওপরে উঠে ভীড়ের মধ্যে পুলিশ অফিসারকে নিয়ে অরবিন্দ যে কোথায় গেল টের পেল না। নিরাপত্তার অভাব হচ্ছে বুঝে সে অরবিন্দকে খুঁজতে এদিক-ওদিক গেল।

এক সময় সে হঠাৎ এক প্রায় ফাঁকা ঘরে নীরবে চেয়ারে বসে থাকা দুজন ভদ্রলোককে দেখল। তার মধ্যে একজনকে চিনল। গতকালের রিসিভিং সেকশনের ডিলিং ক্লার্ক। তাকে দেখে তার সম্বিত হ'ল। সে চলে যাচ্ছিল, বলা যায় প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু যেহেতু সে একা, যে জন্য গোমেদ আবার সক্রিয় হল, সেই ক্লার্ক তাকে ডেকে বললেন, 'আরে আপনি? দেখছেন তো কী ঝামেলা। ও বেলা আসুন, আছি, আপনার ফর্ম রিসিভ্ করব। গোলমাল মিটে যাবে মনে হয়। পুলিশ এসে গেছে। জ্যোতিবাবুর কাছেও খবর গেছে।' শান্তনু কোনো কথা না বলে পালিয়েই গেল বলা যায়। তারপর থেকে অসম্ভব সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক অরবিন্দকে খুঁজতে বারবার ওই ক্লার্কের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং যখনই তারা দুজনে কোনো ফাঁকা বারান্দায় বা করিডোরে, তখনই সেই কথা। 'ভাববেন না, আমি আপনার ফর্ম রিসিভ্ করব।' এরমধ্যে অন্তত ১০৯ বার গোপালবাবু অধীরের সঙ্গেও দেখা হল। কিন্তু অরবিন্দর সঙ্গে তখন পর্যন্ত একবারও না। অথচ যত বার গোপালবাবু বা অধীরের সঙ্গে দেখা, ততবারই শান্তনু ডান হাত পকেটে লুকোচ্ছিল। আর তারপর যতবার সুযোগ মতো ডান হাত বের করে ফাঁকে দেখছিল গোমেদ, ততবারই সে, ওই গোমেদ আরও ব্রাইটনেস হারাচ্ছিল। আবার যতবার সেই ক্লার্কের সঙ্গে দেখা, ততবার ডান হাত সে প্রকাশ্যে রাখছিল। দেখছিল অবাক হয়ে, গোমেদের ব্রাইটনেস ফিরে আসছে। এ যেন ইঁদুর-বেড়াল খেলা। যেন গোমেদ বলছে, তফাৎ যাও, একা অপেক্ষা কর। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। দেখা হয়ে যাচ্ছে গোপালবাবু বা অধীরের সঙ্গে। এ সময় সে কয়েকবারই ভেবেছিল, দুলালের দেওয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণাদির ফোল্ডারটি বের করে একবার প্রত্যক্ষ করবে কি না, পারেনি, কেননা যাকে একা হওয়া বলে বাস্তবিক সে সে-রকম একা হতে পারছে না।

প্রায় যখন সবকিছু শান্ত, প্রায় সবাই যখন আবার নিচে, শান্তনু তখনো ওপরে গোপালবাবু ও অধীরের পাশে। আর তাদের কাছ ছাড়া হয়নি শান্তনু। পারেও নি কাছ ছাড়া হতে। তারা তাকে আগলে ছিল বলা যায়।

এক সময় অরবিন্দর দেখা মিলল। সোল্লাসে তাকে, অধীরকে, গোপালবাবুকে আশ-পাশের সকলকেই সে বলল, খুব জব্দ হয়েছে ডি. এস. জি.! আজ অফিস স্ট্রাইক। ওরা আমাদের সমর্থন করছে। চলুন আমরা সব নিচে যাই। এই অফিসের সবাই কাজ

বন্ধ করে নিচে আসবে। নিচে নামতে নামতে শান্তনু তার পকেটে লুকোনো ডানহাতের আঙুলের গোমেদ অন্যান্য আঙুলের দ্বারা বুঝতে চাইল। বুঝতে পারল না। এমন পজিশন ছিল পকেটে যে অন্যান্য আঙুলগুলি খুঁজেই পেল না গোমেদের আঙুল। তখনি শুরু হল স্লোগান, আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে···ডি. এস. জি.-র হিটলারি কালো হাত ভেঙে ফেল, পুড়িয়ে ফেল···হায়ার সেকেন্ডারির আলাদা স্ট্যাটাস দিতে হবে। দিতে হবে···হায়ার সেকেন্ডারির আলাদা পে-স্কেল এখুনি ঘোষণা করতে হবে··· কলেজ ও স্কুলের দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলব না···চলব না।'

স্লোগান যেমন হয় তেমনি তালে তালে ট্রেড-ইউনিয়ন বা ছাত্র-ইউনিয়নের মতো জঙ্গী ও যুবা হয়ে হো-চি-মিন সরণি ও অফিস বাড়ি কাঁপিয়ে দিল। স্লোগান খুব সংক্রামক। অরবিন্দ লীড করছিল, অধীর প্রথমে গলা মেলায়নি। কিছু পরেই গলা মেলাতে বাধ্য হল, কেননা তার পাশেপাশে কেউ বাদ ছিল না। গোপালবাবু দূরে ছিলেন কিছু। অধীর ডেকে আনল। অরবিন্দ এগিয়ে গোপালবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে স্লোগান তুললে— গোপালবাবুর উপায় রইল না আর। তিনিও গলা মেলালেন। শান্তনুর চোখের সামনে ঘটে গেল এই ঘটনা। ১৯৬২-র পর সব কমিউনিস্ট একই স্লোগানে গলা মেলাচ্ছে, একই মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ভাবা যায় না, যেন সমুদ্র ফেটে পড়বে, যেন এখুনি শান্তনুর চোখ দিয়ে প্রথম জল বেরুবে, যে জলের ধারা যেন অবিরাম হবে ও ধুয়ে মুছে যাবে সব ভুলগুলি। উৎসাহ ও আনন্দে অস্থির শান্তনু কিছু উচ্চ স্বরেই গলা মেলাল। তার ডান হাত তখন পকেটে! বের করার উপায় নেই তখন। কিন্তু পকেটের ভেতর সেই হাত ঘেমে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। নষ্ট হতে দিল সে। কিন্তু ডান হাত জমে যাচ্ছে পকেটে থাকতে থাকতে। সে বার করতে চাইল। কিন্তু এখানে গোমেদ বার করা যায় না। প্রকাশ্যে এই জনসমক্ষে সে, গোমেদ, লজ্জা পাচ্ছে। সে তাই পকেটে দুলালের সেই রামকৃষ্ণাদির ফোল্ডারের সঙ্গে মাটির মতো মিশে আছে। অন্ধকারে। নিশ্চয় সে দুঃখ পাচ্ছে। কেননা আর তার কোনো অ্যাকশন নেই এখন, ফর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। সে পকেটের ভিতর অন্যান্য আঙুলের সাহায্যে খুলে ফেলল গোমেদ।

তারপর স্মার্টলি বার করল তার মুক্ত ডান হাত। □

□

With Best Compliments From :

Mackinnon Mackenzie & Co. Ltd.

Mackinnons Building
16, STRAND ROAD, CALCUTTA-700 001
Sub-Office at : Calcutta Docks □ Calcutta Airport
Phones : 20-1661 / 1666 Telex : 7217
20-0035, 20-9155, 20-1679
Cable : Mackinnons Calcutta

Range of Services :
Travel & Tourism □ Clearing & Forwarding
Ship Agency □ Air Cargo □ Property
Development & Consultancy
Call on us for your Problems
We blend Expertise with Enterprise

□

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

ANANDA CONSTRUCTION

ENGINEERS □ CONTRACTOR
& CIVIL ENGINEERING WORKS
33A, JAWAHARLAL NEHRU ROAD
CALCUTTA

□

□

বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখা যায়।
বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলিও দৃশ্যমান।
কিন্তু বিদ্যুৎ তরঙ্গ দেখা যায় না।
চেনা যায় সেই বিদ্যুৎ দিয়ে যার ফলে বাতি জ্বলছে,
পাখা চলছে, কলকারখানায় উৎপাদন হচ্ছে,
জলসেচ করছে চাষীভাই।

বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সঙ্গে না-দেখা যে বিদ্যুৎ শক্তি
প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত উন্নয়নের শপথ নিয়ে
তার আর এক নাম প্রগতি।

প্রগতির প্রতীক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

□

With best compliments :

Arvind Khaitan Pvt. Ltd.

23A Netaji Subhas Road 6th Floor
CALCUTTA-700 001

□

□

With Best Compliments from :

Krypton Industries Ltd.

Office : 410 Vardaan Building
25A Camac Street
Calcutta-700 016
Phone : 47-1943, 47-8604, 47-1695
Fax : (033) 47-8604
Telex : 21-5202 TIMP IN
Factory : Plot No. 31 & 32, Sector—1
Falta Export Processing Zone
Falta, 24-Parganas (S)
Phone : 2227, 2229

□

With best compliments from :

Reliable Traders & Engineers

Refrigeration, Airconditioning &
Electrical Engineers
127E, HAZRA ROAD
CALCUTTA-700 026
Phone : Office : 48-5241 / 4091
Telex : 21-5158

□

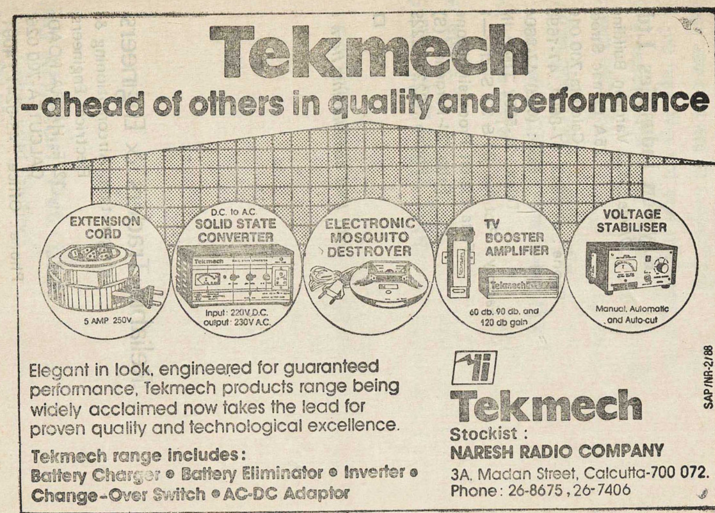
Tekmech
-ahead of others in quality and performance
EXTENSION CORD
5 AMP 250V
D.C. to A.C.
SOLID STATE CONVERTER
Input: 220V D.C.
output: 230V A.C.
ELECTRONIC MOSQUITO DESTROYER
TV BOOSTER AMPLIFIER
60 db, 90 db, and 120 db gain
VOLTAGE STABILISER
Manual, Automatic and Auto-cut
Elegant in look, engineered for guaranteed performance, Tekmech products range being widely acclaimed now takes the lead for proven quality and technological excellence.
Tekmech range includes:
Battery Charger • Battery Eliminator • Inverter • Change-Over Switch • AC-DC Adaptor
Tekmech
Stockist :
NARESH RADIO COMPANY
3A, Madan Street, Calcutta-700 072.
Phone : 26-8675, 26-7406
SAP/NR-2/88

□

WITH BEST COMPLIMENTS FROM:

PLAZA TOWER COMPLEX

8 No. NAYAPALLY ROAD (DUM-DUM)
CALCUTTA 700 055

HEAD OFFICE:

4A COUNCIL HOUSE STREET
CALCUTTA 700 001
Phone No. 28 8348

□

Declaration No. : 25 / 92 □ April-June 1992 □ Rs. 12

Space Donated By :

M/s. BENGAL CHAMBERS

Guest House
60 Queens Mansion
12 Park Street
Calcutta

কুন্তল রায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত
এবং টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।